শিবলু

একটি রেমাশ নিবেদন

লিমন

জুল ভার্ন-এর

# আ সায়েন্টিস্ট কিডন্যাপড

রুপান্তর: শামসুদ্দীন নওয়াব

তিনটি বই একত্রে

জিম করবেট-এর

# বনের গল্প

রুপান্তর: অনীশ দাস অপু

এরিখ কেস্টনার-এর

# লোটি ও লিসা

রুপান্তর: এ. টি. এম. শামসুদ্দীন

## রেমাশ

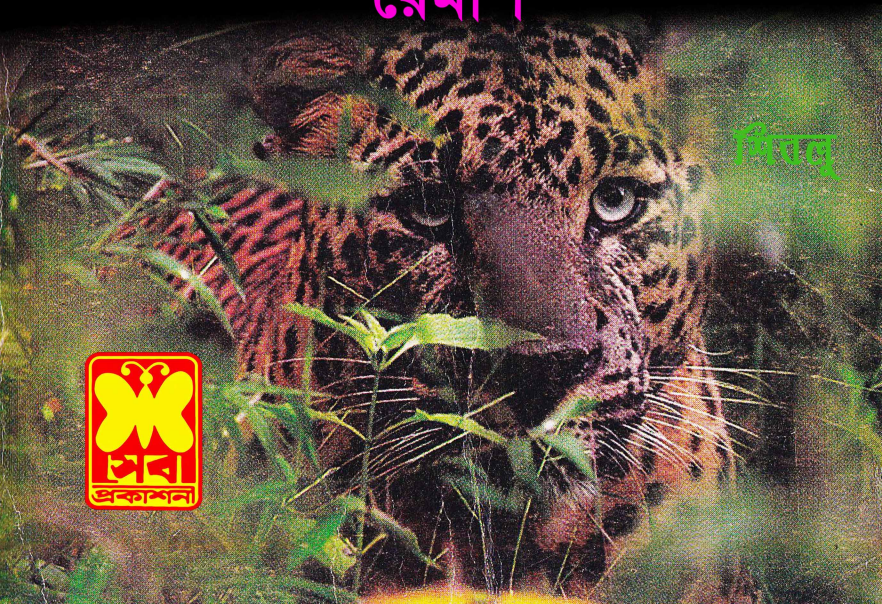


সবা প্রকাশনী

একটি রেমাশ নিবেদন

বাংলাপিডিএফ

বইঘর

বইলাভার্স

কাজিরহাট

Scan & Edit

Md. Shahidul Kaysar Limon

মোঃ শহীদুল কায়সার লিমন

https://www.facebook.com/limon1999

অনুবাদ

জুল ভার্ন

## আ সায়েন্টিস্ট কিডন্যাপড

রূপান্তর ■ শামসুদ্দীন নওয়াব

জিম করবেট

## বনের গল্প

রূপান্তর ■ অনীশ দাস অপু

এরিখ কেস্টনার

## লোটি ও লিসা

রূপান্তর ■ এ.টি.এম. শামসুদ্দীন

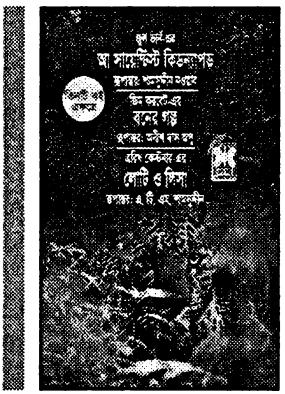

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-3227-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকত্রয়ের

প্রথম প্রকাশ: ২০১০

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেগুনবাগান প্রেস**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
**প্রজাপতি প্রকাশন**
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

একষট্টি টাকা

A SCIENTIST KIDNAPPED
By: Jules Verne
Trans. by: Shamsuddin Nawab

BONER GALPO
By: Jim Corbett
Re-told by: Anish Das Apu

LOTTIE AND LISA
By: Erich Kaestner
Trans. by: A.T.M.Shamsuddin

আ সায়েন্টিস্ট কিডন্যাপড/জুল ভার্ন ৫–৯৮
বনের গল্প/জিম করবেট ৯৯–১৮৫
লোটি ও লিসা/এরিখ কেস্টনার ১৮৬–২৫৬



## সেবা প্রকাশনীর
### ক'টি কিশোর ক্লাসিক/অনুবাদ

**মারিয়ো পুজো**
রূপান্তর : শেখ আবদুল হাকিম
গডফাদার-১, ২ (একত্রে) ৫৬/-
গডফাদার-৩, ৪ (একত্রে) ৬১/-
**হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড**
রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ
শী ৪২/-
রিটার্ন অভ শী ৫০/-
মর্নিং স্টার
রূপান্তর : খসরু চৌধুরী
নেশা
অ্যালান কোয়াটারমেইন
রূপান্তর : কাজী মায়মুর হোসেন
চাইল্ড অভ স্টর্ম
এলিসা ৪৬/-
অ্যালান অ্যান্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার
রূপান্তর : সায়েম সোলায়মান
ক্লিওপেট্রা
জেস
বেনিটা
রানি শেবার আংটি ৯৭/-
রূপান্তর :কাজী আনোয়ার হোসেন
মন্টেজুমার মেয়ে
**রাফায়েল সাবাতিনি**
রূপান্তর :কাজী আনোয়ার হোসেন
ব্ল্যাক সোয়ান+লাভ অ্যাট আর্মস ৬৩/-
**পল ওয়েলম্যান**
রূপান্তর : তাহের শামসুদ্দীন
দি আয়রন মিস্ট্রেস-১,২,৩ (একত্রে)
**এরিক মারিয়া রেমার্ক**
রূপান্তর : মাসুদ মাহমুদ
থ্রী কমরেডস (১,২ একত্রে)
রূপান্তর : জাহিদ হাসান
অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট

**অ্যানি ফ্র্যাঙ্ক/ডি.এইচ. লরেন্স**
রূপান্তর :সুরাইয়া আক্তার জাহান/
কাজী শাহনূর হোসেন
অ্যানি ফ্র্যাঙ্কের ডাইরি+সান্স অ্যান্ড লাভার্স ৫০/-
**আগাথা ক্রিস্টি/আর্নেস্টহেমিংওয়ে/
জুল ভার্ন**
রূপান্তর :রকিব হাসান/নিয়াজ
মোরশেদ/শামসুদ্দীন নওয়াব
ফাঁদ+আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস+পারচেজ অভ
দ্য নর্থ পোল ৬৬/-
**হেনরি শ্যারিয়ার**
রূপান্তর : রেজোয়ান সিদ্দিকী
প্যাপিলন (তিনখণ্ড একত্রে)
**এইচ.জি.ওয়েলস/পিয়েরে বুলে/
হারমান মেলভিল**
রূপান্তর : খসরু চৌধুরী
টাইম মেশিন+দ্য ব্রিজ অন দ্য রিভার
কওয়াই+মবিডিক ৫৮/-
**নেভিল শ্যুট/জন স্টেইনবেক/
টমাস হার্ডি**
রূপান্তর : কাজী শাহনূর হোসেন
স্বপ্নের পৃথিবী+দ্য গ্রেপস অভ র‍্যাথ+
জুড দ্য অবসকিওর ৪৩/-
**ভিক্টোরিয়া হল্ট/এরিক মারিয়া রেমার্ক/
জেরাল্ড ডুরেল**
রূপান্তর : রোকসানা নাজনীন/
মাসুদ মাহমুদ/রকিব হাসান
স্বপ্নসখা+দ্য রোড ব্যাক+মাতাল অরণ্য
**জন স্টেইনবেক/জেরাল্ড ডুরেল/
জি.জি. রাশবি**
রূপান্তর : কাজী শাহনূর হোসেন/
অনীশ দাস অপু/ইশতিয়াক হাসান ফারুক
অভ মাইস অ্যান্ড মেন+মানবজন্তু+
জমবির ভয়ঙ্কর ৫২/-

স্যার আর্থার কোনান ডয়েল/
স্টুয়ার্ট ক্লোয়েট/এরিক মারিয়া রেমার্ক
রূপান্তর : কাজি মাহবুব হোসেন/
খসরু চৌধুরী/জাহিদ হাসান
হারানো পৃথিবী+অভিশাপ+স্বপ্ন মৃত্যু ভালবাসা

সার আর্থার কোনান ডয়েল/হ্যারিয়েট
বীচার স্টো/জুল ভার্ন
রূপান্তর : আসাদুজ্জামান/
অনীশ দাস অপু/সায়েম সোলায়মান
বাস্কারভিলের হাউণ্ড+আঙ্কল টম্‌স্ কেবিন+
কুমেরু রহস্য ৭৪/-

কর্নেল জে.এ. প্যাটারসন/পি. জি.
ওডহাউস/হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
রূপান্তর : সেলিম আনোয়ার/এ.টি.এম.
শামসুদ্দীন/কাজী মায়মুর হোসেন
সাভোর মানুষখোকো+ক্যারি অন জীভ্‌স্+
আ টেল অভ থ্রি লায়ন্স

এইচ.জি.ওয়েলস/আর্নস্ট হেমিংওয়ে/
কেনেথ এন্ডারসন
রূপান্তর : আসাদুজ্জামান/শেখ আপালা
হাকিম/ইশতিয়াক হাসান ফারুক
অদৃশ্য মানব+দ্য ফিফথ কলাম+
জঙ্গলে অমঙ্গল

এইচ.জি.ওয়েলস/পি. জি. ওডহাউস
রূপান্তর : দ্বিজেন বর্মণ/
খোন্দকার আলী আশরাফ
মঙ্গল থেকে অমঙ্গল+থ্যাংক ইউ, জীভ্‌স্

ফ্রেড জিপসন
রূপান্তর : রকিব হাসান
শিকারী পুরুষ+ওল্ড ইয়েলার ৫০/-

অ্যানড্রু গীয়ার
রূপান্তর : ইফতেখার আমিন
মৃত্যুঞ্জয়+তিমির রাত্রি ৭৮/-

জন হাণ্টার
রূপান্তর : খসরু চৌধুরী
হাণ্টার+অনুসরণ ৬৮/-

চার্লস নর্ডহফ ও জেমস নরম্যান হল/
এরিক মারিয়া রেমার্ক/জেরাল্ড কার্শ
রূপান্তর: নিয়াজ মোরশেদ/
শেখ আবদুল হাকিম/ খসরু চৌধুরী
পিটকেয়ার্নস আইল্যাণ্ড+দ্য ব্ল্যাক অবিলিস্ক+
কমরেড ডেথ ৬৬/-

রাফায়েল সাবাতিনি/
সার আর্থার কোনান ডয়েল/
কেনেথ এণ্ডারসন
রূপান্তর: কাজী আনোয়ার হোসেন/
ইসমাইল আরমান/ইশতিয়াক হাসান ফারুক
রূপসী বন্দিনী+আ স্টাডি ইন স্কারলেট+
অতীন্দ্রিয় উপাখ্যান ৭৪/-

জেরোম কে. জেরোম/ জর্জ অরওয়েল
রূপান্তর: এ.টি.এম.শামসুদ্দীন/
সুরাইয়া আখতার জাহান
ত্রিরত্নের নৌবিহার+অ্যানিমেল ফার্ম ৫২/-

ড্যাফনে দ্যু মরিয়ে/পি. জি. ওডহাউস
রূপান্তর: নিয়াজ মোরশেদ/
কাজী মায়মুর হোসেন
রেবেকা+লর্ড এম্‌স্‌ওয়ার্থ ৬০/-

চার্লস ডিকেন্স/হেনরি ফিল্ডিং/
এডগার ওয়ালেস ও মারিয়ান সি. কুপার
রূপান্তর: নিয়াজ মোরশেদ/
কাজী শাহনুর হোসেন/অনীশ দাস অপু
আ টেল অভ টু সিটিজ+টম জোনস+
কিংকং ৭০/-

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড/
আলবেয়ার কামু/মার্থা মেকেনা
রূপান্তর: খসরু চৌধুরী/বাবুল আলম/
জাহিদ হাসান
এরিক ব্রাইটিজ+দ্য প্লেগ+আমি শুণ্ডচর ৮৪/-

জিম করবেট/জুল ভার্ন
রূপান্তর: কাজী আনোয়ার হোসেন/
ইসতিয়াক হাসান ফারুক/
শামসুদীন নওয়াব
ছয় রোমাঞ্চ+জঙ্গলের আইন+
আ ড্রামা ইন লিভোনিয়া ৬০/-

# আ সায়েন্টিস্ট কিডন্যাপড

মূল: জুল ভার্ন
রূপান্তর: শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

## এক

আঠারোশো নব্বুই সাল, জুন মাসের পনেরো তারিখ। স্যানাটরিয়াম বা আরোগ্যনিকেতন 'হেলথফুল হাউস'-এর অধ্যক্ষ একটা ভিজিটিং কার্ড পেলেন, তাতে পদবির উল্লেখ ছাড়াই শুধু একটা নাম লেখা—লা কোঁত দার্তিগাস। নামের নিচে পেন্সিল দিয়ে লেখা হয়েছে—স্কুনার 'এব্বা' থেকে। এব্বা পামলিকো সাউন্ডের নিউ-বার্নে নোঙর ফেলেছে।

নিউবার্ন উত্তর ক্যারলিনায় অবস্থিত, নয়জে নদীর একটা শাখার একেবারে শেষ প্রান্তে। ওই শাখা নদী লেক পামলিকো সাউন্ডে এসে মিলিত হয়েছে। লেকে বেশ কয়েকটা ছোট আকৃতির দ্বীপ দেখা যায়।

ভিজিটিং কার্ডের সঙ্গে ছোট্ট একটা চিরকুটও পাঠিয়েছেন কোঁত দার্তিগাস, তাতে লিখেছেন—স্যানাটরিয়াম হেলথফুল হাউস পরিদর্শনের জন্যে অতীব আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন কাউন্ট। এখন দয়া করে অধ্যক্ষ যদি অনুমতি দেন তাহলে আজই এব্বার ক্যাপটেন স্পেডকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসতে পারেন তিনি।

হেলথফুল হাউস অত্যন্ত নামকরা স্যানাটরিয়াম, বিশিষ্ট অনেক বিদেশীই এর আগে দেখতে এসেছেন, কাজেই কাউন্টের আসতে চাওয়ার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। হেলথফুল হাউসে থাকার খরচ এত বেশি, ধনকুবের মার্কিনিরা ছাড়া আর কারও পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয়। ধনী লোকদের আরোগ্য নিকেতন বলেই হেলথফুল হাউসকে নিয়ে মানুষের মনে এত বেশি কৌতূহল। কাউন্টের চিরকুট পড়ে অধ্যক্ষ লিখলেন—তাঁর মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আগমন ঘটলে তিনি গর্বিত ও কৃতার্থ বোধ করবেন।

নিজের পেশায় দক্ষ ও সেরা, এরকম লোকজনই শুধু চাকরি করে হেলথফুল হাউসে। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরাই এখানে চিকিৎসা করার সুযোগ পান। সরকারি কোন নিয়ন্ত্রণ বা বিধি-নিষেধের বালাই নেই, কারণ এটা একটা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান। এখানকার সমস্ত আয়োজনের পিছনে একটা উদ্দেশ্যই কাজ করে—ধনী মানুষগুলোকে আরামে রাখা।

এরচেয়ে আদর্শ জায়গাও আর হতে পারত না। মূল ভবনটিকে আড়াল করে রেখেছে উঁচু একটা টিলা, ভবনের চারপাশে দুশো একর জায়গা জুড়ে ছবির মত সুন্দর বন-বীথিকা—দেশী-বিদেশী নানারকম বৃক্ষসারি দিয়ে সাজানো। বাগিচার একটা অংশ ঢাল বেয়ে নেমে গেছে নয়জে নদীর বিশাল শাখার দিকে। সমুদ্র তত দূরে নয়, তাজা বাতাসের কোন অভাব নেই। আর লেক পামলিকো সাউন্ডের হাওয়া এত ঠাণ্ডা, গা জুড়িয়ে যায়, ঘুম চলে আসে চোখে।

হেলথফুল হাউসে আধুনিক পদ্ধতিতে ধনী রোগীদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চলে। অন্য যে-কোন সাধারণ স্বাস্থ্য-নিবাসের চেয়ে রোগীদের আরোগ্য লাভের হার এখানে অনেক বেশি। এই স্যানাটরিয়াম আসলে দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তবে মানসিক রোগীদেরও ভর্তি করা যায়। বিশেষ করে যে-সব রোগী ভাল হবেন না বলে মনে করা হয়, কর্তৃপক্ষ তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করেন।

এ গল্পটা এমন এক সময়ের, যখন খুব নামকরা এক ভদ্রলোককে হেলথফুল হাউসে বিশেষ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে গত প্রায় দেড় বছর ধরে। এমনও হতে পারে যে কাউন্ট দার্তিগাস হয়তো তাঁকে দেখার জন্যেই স্যানাটরিয়ামে আসতে চাইছেন।

সেই খুব নামকরা ভদ্রলোকটি একজন ফরাসী বিজ্ঞানী। তাঁর নাম টমাস রস, বয়স চল্লিশ। তিনি যে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এখনও কোন চিকিৎসক তাঁকে পুরোপুরি পাগল বলে ঘোষণা করেননি। অদ্ভুত বৈপরীত্য হলো, বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সহজ-সরল যে-সব দৈনন্দিন কাজ একজন মানুষকে করতে হয়, সেগুলোর প্রায় কোনটাই তিনি করতে পারেন না; কিন্তু নিজ পেশা ও প্রতিভার ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি ও বোধ এখনও আশ্চর্য রকম তীক্ষ্ণ ও স্বচ্ছ, এ-ব্যাপারে তাঁর সচেতনতার এতটুকু অভাব লক্ষ করা যায় না। অথচ প্রতিভাকে কাজে লাগাতে বলা হলে প্রলাপ বকতে শুরু করেন তিনি, এমন এলোমেলো কথা বলেন, মনে হয় হেঁয়ালি করছেন। তখন তাঁর আচরণেও যুক্তির বালাই থাকে না, এমনকি আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিও তিনি যেন হারিয়ে বসেন। সে-সময় একটা অবোধ শিশুর সঙ্গে তাঁর কোন পার্থক্য থাকে না, কাজেই কখন কি অঘটন ঘটিয়ে বসেন এই ভয়ে দেখেশুনে রাখতে হয়। তাঁকে স্যানাটরিয়ামের সতেরো নম্বর ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। একজন শুশ্রূষাকারী দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা বলা যায় পাহারাই দিচ্ছে।

সাধারণ পাগলামি অনেক সময় হিতাহিত বিষয়ক উপদেশের মাধ্যমে সারিয়ে তোলা যায়। এক্ষেত্রে ওষুধ-পত্রের তেমন কোন ভূমিকা থাকে না। তবে টমাস রসের বেলায় কোমল ব্যবহার ও নৈতিক উপদেশ কোন কাজে আসবে

বলে মনে হয় না। তাঁর রোগের লক্ষণগুলো হলো—প্রচণ্ড অস্থিরতা, ঘনঘন মত পরিবর্তন, একটুতেই বিরক্তি বোধ করা, অদ্ভুত সব বাতিক আর উদ্ভট কিছু ঝোঁক, বিষণ্নতা, সব বিষয়ে উদাসীনতা, আনন্দ-ফুর্তিতে অনীহা ইত্যাদি। এই রোগের আসলে কোন চিকিৎসা নেই।

মনের ওপর প্রচণ্ড চাপেই মানুষ পাগল হয়। সে যখন নিজের অন্তর্জীবন নিয়ে অতিমাত্রায় মগ্ন হয়ে পড়ে তখনই নিজের চারপাশ থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। মন ছাড়াও যে আরও অনেক জগৎ আছে, টমাস রস যেন তা পুরোপুরি ভুলে গেছেন। সারাক্ষণ মাত্র একটি বিষয় নিয়ে ডুবে থাকাই এর কারণ। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা হয়তো আবার তাঁকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনতে পারে, তবে সে সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

টমাস রস নামেমাত্র একজন বিজ্ঞানী নন, তিনি বিরল প্রতিভার অধিকারী, একজন আবিষ্কারক ও উদ্ভাবক। একের পর এক অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার দুনিয়াজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছিল তাঁকে। অনেক সমস্যার ব্যবহারিক সমাধান করে দিয়ে বিজ্ঞানীদের শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করেন তিনি। কিন্তু আমাদের সমাজের এমনই এক দুঃখজনক প্রবণতা যে কেউ কোন ভাল কাজ করলেও তার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগা চাই। টমাস রসের খ্যাতি যত বেড়েছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। কত লোক কতভাবেই না অপমান করেছে তাঁকে। দৈনিক পত্রিকাগুলোয় তার বিরুদ্ধে সত্যি-মিথ্যে কত কিছুই না লেখা হয়েছে। কে জানে, হয়তো এ-সবের প্রতিক্রিয়াতেই আজ তাঁর এই করুণ অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

টমাস রসের সর্বশেষ আবিষ্কার 'রস ফুলগুরেটর,' ভয়ানক এক ক্ষেপণাস্ত্র। তাঁর জোরাল দাবি, এই ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র যে দেশের হাতে থাকবে সেই দেশই হবে দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে শক্তিশালী, জলে ও স্থলে প্রতিষ্ঠিত হবে তার শ্রেষ্ঠত্ব।

কে জানে কোন অভিশাপ আছে কিনা, প্রায় সব আবিষ্কারককেই কঠিন সব শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়। তাদের দাবি প্রথমে কেউ সত্যি বলে মানতেই চায় না। আবিষ্কারকরা আশা করেন অন্তত সরকারি কর্মকর্তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন, কিন্তু আমলারা তাদের কথা শুনতে পর্যন্ত রাজি হন না। তবে টমাস রসের বেলায় আমলাদেরকে তেমন দোষ দেয়া যায় না। তাঁরা তার কথা শুনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শুরুতেই তিনি 'রস ফুলগুরেটর'-এর জন্যে এমন অবিশ্বাস্য একটা দাম হেঁকে বসলেন যে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। অবশ্য রসকেও এজন্যে দায়ী করা যায় না। কারণ এর আগের আবিষ্কারগুলো থেকে প্রায় কোন টাকাই পাননি তিনি, একেবারেই পানির দামে

সব বেচতে বাধ্য হয়েছিলেন। অথচ সুযোগসন্ধানীরা নানা ছুতোয় সরকারের টাকা খসিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছিল। রসের মন তিক্ততায় ভরে উঠেছিল, মনে জন্ম নিয়েছিল অবিশ্বাস। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আর তিনি ঠকবেন না। এবার বিক্রির চুক্তি যদি করতে হয়, তাঁর শর্ত অনুসারে করতে হবে। তিনি জেদ ধরে বললেন, তাঁর আবিষ্কার প্রকাশ্যে পরীক্ষা করার আগেই দরদাম ঠিক করতে হবে, টাকাও পরিশোধ করতে হবে।

নিজে তিনি ফরাসী, কাজেই ফ্রান্স সরকারকেই তিনি প্রথমে ফুলগুরেটর বিক্রির প্রস্তাব দিলেন। ফুলগুরেটর শুধুই একটা ক্ষেপণাস্ত্র নয়, জিনিসটা স্বয়ংক্রিয় একটা বিস্ফোরকও বটে। তাঁর আবিস্কৃত এই ক্ষেপণাস্ত্র চাকতির মত দেখতে। ক্ষেপণাস্ত্র ও বিস্ফোরক, দুটোই তাঁর নতুন আবিষ্কার। তাঁর দাবি, বহু দূরের লক্ষ্যবস্তুতেও নির্ভুলভাবে আঘাত হানতে সক্ষম ফুলগুরেটর, সময় লাগবে মাত্র কয়েক সেকেন্ড, ওই একটা আঘাতেই লক্ষ্যবস্তু নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। লক্ষ্যবস্তু দুর্গ হোক, যুদ্ধজাহাজ বা সেনা ব্যারাক হোক, এই ক্ষেপণাস্ত্র ঠিকই তা ধ্বংস করে দেবে। তিনি বললেন, এই অস্ত্র পেলে ফরাসী সরকার কখনোই আর কোন যুদ্ধে হারবে না। প্রতিরক্ষা ও আক্রমণ, দুই ক্ষেত্রেই ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু রসের দাবি কেউ বিশ্বাস করতে চাইল না। সবাই বলল, আগে পরীক্ষা করে দেখান, তবেই না বিশ্বাস করব। উত্তরে রস বললেন, টাকা পাবার আগে কোন পরীক্ষা নয়। ফেলো কড়ি মাখো তেল। আগে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দাও আমাকে।

তাঁর পাগলামি আসলে তখন থেকেই শুরু। যুক্তি মানতে রাজি হচ্ছেন না। তাঁকে বোঝানোই গেল না যে পরীক্ষা করার আগে টাকা চেয়ে তিনি লোক হাসাচ্ছেন। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি শুরু করল মানুষ। কেউ কেউ তাঁকে পাগল বলে রায় দিল। অনেকেই বলল, পাগল হয়তো এখনও হননি, তবে লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে হতে বেশি সময়ও লাগবে না। ফরাসী মন্ত্রীসভা এতই বিরক্ত বোধ করল যে তাঁরা আর রসের সঙ্গে যোগাযোগই করলেন না। দৈনিকগুলো তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুরু করল। লেখা হলো, হাফ ম্যাড টমাস রসের উদ্ভট প্রস্তাবে ফরাসী সরকার কেন, দুনিয়ার কোন সরকারই রাজি হবে না।

তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ না করায় যতটা খেপলেন রস, তারচেয়ে অনেক বেশি খেপলেন কাগজগুলোর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে। প্রচণ্ড রাগে দেশ ত্যাগ করলেন তিনি, এবার জার্মান সরকারকে প্রস্তাব দিলেন তাঁর ফুলগুরেটর কেনার। জার্মান বিজ্ঞানীরা সে সময় গোলন্দাজি গবেষণায় খুব ব্যস্ত, তাই তাঁরা রসের

আবিষ্কারটিকে খুব একটা গুরুত্বের সঙ্গে নিলেন না। তার ওপর রসের উদ্ভট শর্ত। স্বভাবতই জার্মান সরকার জানিয়ে দিল, তারা ফুলগুরেটর কিনতে আগ্রহী নন।

দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রচণ্ড অপমান বোধ করলেন রস, ঘৃণা ও আক্রোশে তাঁর ভেতরটা ভরে গেল। তাঁর ধারণা হলো, তাঁকে ঠকাবার জন্যে জোট বেঁধে ষড়যন্ত্র করছে সবাই। এরপর ব্রিটিশ সরকারও যখন বলে দিল যে তাঁর শর্তে ফুলগুরেটর কিনতে উৎসাহী নয় তারা, রস যেন পুরোপুরি অন্ধ ও বধির হয়ে গেলেন। কেউ বুদ্ধি বা পরামর্শ দিতে এলে মারমুখো হয়ে তেড়ে আসেন। বিশ্রাম, খাওয়াদাওয়া, গোসল, ব্যায়াম—প্রায় সবই বাদ দিয়েছেন। তবে এখনও জেদ, তাঁর শর্তেই ফুলগুরেটর বিক্রি করবেন। শেষ চেষ্টা হিসেবে আমেরিকায় চলে এলেন। দেখা যাক মার্কিন সরকার রাজি হয় কি না।

মার্কিনিদের সম্পর্কে যত কিছুই বলা হোক, এ-কথা কেউ বলবে না যে তাদের কাণ্ডজ্ঞান বা ব্যবসা-বুদ্ধির অভাব আছে। তারা ফুলগুরেটরের দাম নিয়ে কোন তর্কের মধ্যে গেল না। ক্ষেপণাস্ত্রের অবিশ্বাস্য ক্ষমতা সম্পর্কেও তারা কোন প্রশ্ন তুলল না। রস যখন দাবি করছেন, তারা ধরে নিল জিনিসটা নিশ্চয়ই খুব কাজের হবে, বিস্ফোরকটাও হবে অত্যন্ত শক্তিশালী। রস যে বিরল প্রতিভার অধিকারী, এটাও তারা মেনে নিল। তবে উপলব্ধি করল, ভদ্রলোক মানসিক অস্থিরতায় ভুগছেন। নিজেদের মধ্যে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিল, আগে তিনি শান্ত হন, অস্থিরতা কাটিয়ে উঠুন, তারপর ফুলগুরেটর কেনার প্রস্তাব বিবেচনা করা যাবে। শুধু তাই নয়, রসের মানসিক অবস্থা ঠিক কি পর্যায়ে আছে জানার জন্যে ডাক্তারও দেখাল তারা। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বললেন, রসের মানসিক বিপর্যয় দুঃখজনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তবে তাঁকে পুরোপুরি পাগল বলতে রাজি হলেন না। কাজেই পাগলাগারদে পাঠাবার প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়ে তারা তাঁকে এই স্যানাটরিয়াম হেলথফুল হাউসে পাঠানোর জন্যে সুপারিশ করলেন।

তিনি পাগল নন, তাঁকে পাগলাগারদেও পাঠানো হয়নি; কিন্তু এই ব্যাপারটাও নিজের মত করে বুঝলেন রস, অর্থাৎ ভুল বুঝলেন। তাঁর ধারণা, হেলথফুল হাউস অবশ্যই একটা পাগলাগারদ, এবং জোর করে পাগল সাজিয়ে এখানে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে। ফলে আরও খেপলেন তিনি, মানসিকভাবে আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর বিরুদ্ধে সবাই মিলে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে, এই চিন্তাটা সারাক্ষণ কুরে কুরে খাচ্ছে তাঁকে। ডাক্তার ও নার্সদের আন্তরিক সেবা-যত্নে কোন কাজ হলো না। অবস্থা দিনে দিনে আরও অবনতির দিকেই যাচ্ছে। শুধু ফুলগুরেটর বা নিজের কোন আবিষ্কার সম্পর্কে যখন কথা ওঠে, বোঝা যায়

এখনও তাঁর মধ্যে যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞান আছে, এখনও তিনি গুছিয়ে কথা বলতে সক্ষম; তা না হলে, বাকি সময় সারাক্ষণই প্রচণ্ড খেপে থাকেন। কথায় কথায় প্রচণ্ড রাগ, সবার প্রতি অবিশ্বাস ও ঘৃণা। অথচ কেউ একবার তাঁর আবিষ্কৃত বিস্ফোরক প্রসঙ্গে কিছু বলুক, সমস্ত দূষিত আবেগ নিমেষে তাঁকে ত্যাগ করে। তখন দেখে কে বলবে না পুরোপুরি সুস্থ মানুষ নন তিনি? তাই বলে আবিষ্কারের সূত্র জিজ্ঞেস করলে বলে দেবেন, এমনটা ভাবলে ঠকতে হবে। এদিক থেকে সাংঘাতিক সেয়ানা, ফর্মুলাটা পুরো চেপে রাখেন। দু'একবার অবশ্য নিজ আবিষ্কার সম্পর্কে এত বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন, মনে হচ্ছিল এই বুঝি ফর্মুলাটা বলে দেবেন। লোকজন ডেকে সব লিখে নেয়ার প্রস্তুতিও নেয়া হয়েছিল। কিন্তু বৃথাই। হড়বড় করে অনেক কথা বলে গেলেন, কিন্তু ফুলগুরেটরের ফর্মুলা সম্পর্কে একটা শব্দও উচ্চারণ করলেন না। টমাস রস অবোধ শিশুর মত নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার কলা-কৌশল কিছুই বোঝেন না, কিন্তু আবিষ্কার সম্পর্কে মূল্যবান সূত্রগুলো ঠিকই সযত্নে চেপে রাখতে পারেন।

স্যানাটরিয়ামের সতেরো নম্বর ওয়ার্ডের চারপাশে লতা-ঝোপ দিয়ে ঘেরা সুন্দর একটা বাগান আছে, সেবাদানকারীর নজরবন্দী হয়ে ও সাহায্য নিয়ে রোজই সেখানে রসের হাঁটাহাঁটি করার কথা। শরীর ঠিক রাখার জন্যে এটা খুবই দরকার। তাঁর জন্যে আলাদা নার্স আছে, সতেরো নম্বর ওয়ার্ডেই থাকে সে, রসের সঙ্গে একই ঘরে ঘুমায়। এই পুরুষ নার্সটিও অদ্ভুত এক মানুষ। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা রসের ওপর তার তীক্ষ্ণ নজর। রসকে ছেড়ে এক-দেড় ঘণ্টার জন্যে কোথাও গেছে সে, এমনটি কখনও ঘটেনি। অস্থিরতার বিস্ফোরণ ঘটার সময়, পাগলামির কোন চূড়ান্ত মুহূর্তে রস যখন অনর্গল প্রলাপ বকতে শুরু করেন, সে তখন তাঁর প্রতিটি শব্দ যেন গোগ্রাসে গিলতে থাকে। এমন কি রস যখন ঘুমের মধ্যে কথা বলেন, তাঁর প্রতিটি কথা ঠোঁটের কাছে কান পেতে শোনে সে।

এই পুরুষ নার্স বা শুশ্রূষাকারীর নাম গেডন। রসকে স্যানাটরিয়ামে ভর্তি করার পরপরই যখন কথা উঠল যে তাঁর দেখাশোনা করার জন্যে ফরাসী ভাষা জানা একজন লোক দরকার, তখনই চাকরিটা চেয়ে দরখাস্ত করে সে, সঙ্গে সঙ্গে পেয়েও যায়। গেডন কিন্তু পেশায় আসলে একজন ফরাসী এঞ্জিনিয়ার। তাঁর নামও গেডন নয়, সিমোন আর্‌ৎ। নিউ জার্সির একটা রাসায়নিক কোম্পানিতে কাজ করছিলেন ভদ্রলোক। তাঁর বয়স চল্লিশ। চেহারায় সারল্য লক্ষ করার মত। কপাল একটু চওড়া। দৃষ্টি খুব প্রখর। সিমোন আরৎ-এর স্বাস্থ্য খুব ভাল, প্রয়োজনে একাই কয়েকজনকে সামলাতে পারবেন। চেহারার সারল্য থাকলেও, চোখে মুখে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ভাবটাও স্পষ্ট।

সিমোন আর্‌ৎ নিজেও কিন্তু একজন গবেষক। তাঁর গবেষণার বিষয়

ছিল—আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র, সমস্যা ও সম্ভাবনা। আধুনিক গোলন্দাজি বিদ্যায় নতুন যা কিছু আবিষ্কার হয়েছে সব তাঁর মুখস্থ। টমাস রসের মেজাজ-মর্জি উপলব্ধি করার যোগ্যতা যদি কারও থাকে তো একমাত্র তাঁরই আছে। ফুলগুরেটর-এর ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি কোনরকম সংশয় বা অবিশ্বাস পোষণ করেন না। তাঁর ধারণা, এই নতুন আবিষ্কারটি আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় নতুন মাত্রা যোগ করবে।

সিমোন আর্‌ৎ উপলব্ধি করেছেন, উন্মাদ রোগটিও টমাস রসকে খানিকটা রেহাই না দিয়ে পারে না। সেজন্যেই তিনি পুরো নন, আংশিক উন্মাদ। টমাস রসের ভেতর তীব্র একটা আগুন জ্বলছে, প্রতিভাই সেই আগুনের উৎস। সিমোন আর্‌ৎ ভয় পান, নিজের অজান্তে হঠাৎ যদি টমাস রস ফুলগুরেটর আবিষ্কারের গোপন সূত্রটি কাউকে বলে ফেলেন তাহলে সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না। টমাস রস একজন ফরাসী, আর্‌ৎ চান তাঁর আবিষ্কারের দ্বারা ফ্রান্স সরকার ও ফ্রান্সের জনগণ উপকৃত হোক, ফুলগুরেটর কোনভাবেই যেন বিদেশী কোন রাষ্ট্রের হাতে চলে না যায়। সেজন্যেই তিনি পেশায় এঞ্জিনিয়ার ও গবেষক হওয়া সত্ত্বেও পরিচয় গোপন রেখে অতি সাধারণ পুরুষ নার্সের চাকরি চেয়ে হেলথফুল হাউসে দরখাস্ত করেছিলেন। ভাগ্য তাঁকে সহায়তা করেছে, গত পনেরো মাস ধরে রসের পাশে থাকার সুযোগ পাচ্ছেন।

## দুই

এই কাউন্ট দার্তিগাস ভদ্রলোকটি কে? তিনি কি স্প্যানিয়ার্ড, স্পেন থেকে এসেছেন? স্পেন, যে-দেশে ষাঁড়ের লড়াই হয়? নামটা স্প্যানিশ, তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু তাঁর জাহাজের গায়ে সোনালি অক্ষরে লেখা রয়েছে—'এব্বা'। এব্বা শব্দটায় স্পেনের কোন গন্ধই নেই, এই নাম শুধু নরওয়ের লোকজন ব্যবহার করে। জাহাজের ক্যাপটেনকে বলা হচ্ছে স্পেড। সারেঙের নাম এফরনদাঁত। বাবুর্চিদের প্রধানকে ডাকা হয় সেলিম বলে। তারমানে এরা বিভিন্ন দেশের লোকজন।

কাউন্টের চেহারা ও আচরণও কিছু ফাঁস করে না। গায়ের ফর্সা রঙ, কালো চুল, হাঁটাচলার মধ্যে সাবলীল সপ্রতিভ ভাব দেখে স্প্যানিয়ার্ড বলেই মনে হয় তাঁকে; অথচ তাঁর মধ্যে এমন অনেক ভঙ্গি আর বৈশিষ্ট্যও আছে যা স্প্যানিয়ার্ডসুলভ নয়। উচ্চতা স্বাভাবিক, শক্ত মজবুত কাঠামো, বয়স চল্লিশের ধারেকাছে। চেহারায় শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে মিশে আছে উদ্ধত একটা ভাব, যেন

তাঁর শরীরে ভারতীয় রাজ রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। আবার কিছু কিছু ভঙ্গি আর কথা বলার ধরন দেখে সন্দেহ হয় তিনি মালয়-এর লোক। তাঁর জাহাজের মাঝি-মাল্লারা অবশ্য ভারত মহাসাগরের কোন এক দ্বীপের ভাষাতেই কথা বলে। কিন্তু জাহাজ যখন আমেরিকা বা ইউরোপের কোন বন্দরে নোঙর ফেলে, কাউন্টের মুখে ইংরেজির খই ফোটে। তবে তাঁর বাচনভঙ্গি বলে দেয় যে, ইংরেজি তাঁর মাতৃভাষা নয়।

সন্দেহ নেই, কাউন্ট দার্তিগাস একটি রহস্যময় চরিত্র। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এই রহস্যময় ব্যক্তিটির অতীত ইতিহাস কি? কাউন্ট খেতাবটি তিনি কোত্থেকে পেলেন, কে তাঁকে দিল? বিলাসবহুল জীবনযাপন দেখে বোঝা যায় বিপুল বিত্তের অধিকারী তিনি। এই বিত্ত কিভাবে তিনি অর্জন করলেন? কোথায় তাঁর জন্ম? স্কুনারটাই বা কোন দেশের? আশ্চর্য, এত সব প্রশ্নের একটিরও কোন উত্তর জানা নেই কারও। নিজের প্রতিটি বিষয়ে কাউন্ট দার্তিগাস নিষ্ঠার সঙ্গে বোবা সেজে থাকেন। গম্ভীর এমন একটা ভাব ধরেন, কারও সাহসই হয় না যে জিজ্ঞেস করবে। মার্কিন সাংবাদিকরা তাঁকে চেপে ধরলেও কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না।

এব্বা এবারই প্রথম নিউ-বার্ন বন্দরে নোঙর ফেলেছে। কেউ জানে না হঠাৎ এখানেই কেন এসেছেন কাউন্ট। এর আগেও বেশ কয়েকবার আমেরিকায় এসেছেন তিনি, তবে প্রতিবারই জাহাজ ভিড়িয়েছেন পুব উপকূলে। বন্দরে ভিড়েই দীর্ঘ যাত্রার উপযোগী প্রচুর রসদ কেনেন কাউন্ট। ভাল জিনিস বেশি দামে কেনেন—দাম মেটান ডলার, গিনি, ফ্রাঙ্ক অথবা অন্য কোন মুদ্রায়। এভাবে আসা-যাওয়া করায় তাঁর অতীত বা ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু জানা না গেলেও, ফ্লোরিডা থেকে ধরে নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত প্রতিটি বন্দরে বেশ পরিচিতি লাভ করেছেন ভদ্রলোক। তিনি যে একজন বিত্তবান মানুষ, এ-কথা হেলথফুল হাউসের অধ্যক্ষও শুনেছেন। কাউন্ট আসতে চান শুনে তাঁর খুশি হবার সেটাই ছিল কারণ।

কে জানে, কাউন্ট হয়তো টমাস রসের সঙ্গে দেখা করতে চান। রসের খ্যাতি কুখ্যাতি যা-ই বলা হোক, গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁকে দেখতে চাওয়ার কৌতূহল জাগাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

বিকেলবেলা ঠিক যখন আসার কথা, ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক সেই সময়টিতেই এব্বার ক্যাপটেন স্পেডকে সঙ্গে নিয়ে স্যানাটরিয়াম হেলথফুল হাউসে পায়ের ধুলো ফেললেন কাউন্ট দার্তিগাস। কালবিলম্ব না করে তখুনি তাঁকে অধ্যক্ষের খাস কামরায় নিয়ে আসা হলো। শ্রদ্ধাভরে, বিনয়ে বিগলিত হয়ে কাউন্টকে অভ্যর্থনা জানালেন অধ্যক্ষ, আপ্যায়নেও কোন রকম ত্রুটি

রাখলেন না। তারপর ব্যাকুল আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলেন, মহানুভব মেহমানের জন্যে কি করতে পারেন তিনি। বললেন, কাউন্ট তাঁর সম্মানীয় মেহমান, তাঁকে নিজে তিনি হেলথফুল হাউস ঘুরিয়ে দেখাবেন। কাউন্ট বললেন, অধ্যক্ষের আন্তরিক আতিথেয়তায় তিনি মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ। তারপর, যেন অধ্যক্ষের ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানাতেই, হেলথফুল হাউস ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। অধ্যক্ষ তাঁকে একটা করে জায়গায় নিয়ে আসছেন, এটা-সেটা দেখিয়ে গুণকীর্তন করছেন, বলছেন হেলথফুল হাউসের চিকিৎসা পদ্ধতি দুনিয়ার যে-কোন স্যানাটরিয়ামের চেয়ে উন্নতমানের। কাউন্টের মুখে কোন কথা নেই, নিঃশব্দে সব শুনে যাচ্ছেন তিনি। এখানে আসার পিছনে নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে তাঁর, সম্ভবত সেটা চেপে রাখার জন্যেই বাধা না দিয়ে অধ্যক্ষের বকবকানি শুনে যাচ্ছেন। এভাবে প্রায় একঘণ্টা পার হয়ে গেল। এতক্ষণে কাউন্ট একটা প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, এ-কথা কি সত্যি যে আপনাদের হেলথফুল হাউসে খুব নাম করা এক ব্যক্তি রোগী হিসেবে ভর্তি হয়েছেন? ওই ভদ্রলোকের কারণে হেলথফুল হাউসের সুনাম আরও নাকি ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে?'

অধ্যক্ষকে গর্বিত দেখাল। 'মঁশিয়ে লা কোঁত্ বোধহয় বিজ্ঞানী টমাস রসের কথা বলতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ, ওই ফরাসী ভদ্রলোকের কথাই বলছি। আসলে ব্যাপারটা কি বলুন তো? উনি কি সত্যি পাগল হয়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ, পাগল যে হয়েছেন তাতে আর সন্দেহ কি। তবে একদিক থেকে ওনার পাগল হওয়াটা ভালই হয়েছে। ধ্বংস করার যন্ত্র তো এমনিতেই অনেক আছে, নতুন আরেকটার দরকার কি! ওনার আবিষ্কার মানবজাতির কোন উপকারে লাগবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

'আপনার কথায় যুক্তি আছে,' সায় দিয়ে বললেন কাউন্ট। 'আপনার সঙ্গে আমি একমত। সত্যিকার কল্যাণ ধ্বংসের মাধ্যমে সম্ভব নয়। ধ্বংসাত্মক যে-কোন কাজই আসলে নিন্দনীয়। কিন্তু, আমার জানতে ইচ্ছে করে, উনি কি সত্যি একেবারে পাগল হয়ে গেছেন?'

'না, তা হননি। দৈনন্দিন কাজকর্ম কিছু করতে না পারলেও, তাঁর উদ্ভাবনী ক্ষমতা কমেছে বলে মনে হয় না। তাঁকে দেখলে ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারতেন। এই ওয়ার্ডেই টমাস রসকে রাখা হয়েছে। কখন কি করে বসেন, তাই সারাক্ষণ পাহারা দিতে হয়। বিশেষ করে বাইরের লোকজন যাতে তাঁকে বিরক্ত না করে সেদিকে আমাদের কড়া নজর রাখতে হয়।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কাউন্টের দিকে তাকালেন অধ্যক্ষ। কাউন্টের ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি ফুটল।

'তারমানে কি আপনি বলতে চাইছেন,' জিজ্ঞেস করলেন কাউন্ট, 'মঁশিয়ে

রস একা হবার কোন সুযোগই পান না?'

'না, মঁশিয়ে লা কোঁত্, একা তাঁকে কখনোই থাকতে দেয়া হয় না। শুধু তাঁর জন্যে আলাদাভাবে এক লোককে চাকরি দেয়া হয়েছে, সে-ই তাঁর শুশ্রূষা করে, পাহারাও দেয়—রাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা। টমাস রস যদি কখনও ঘুমের মধ্যে বা প্রলাপ বকার সময় তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে কোন তথ্য প্রকাশ করেন, সঙ্গে সঙ্গে তা লিখে নেবে সে, এমনকি তা দুর্বোধ্য হলেও।'

কাউন্ট দার্তিগাস দ্রুত একবার ক্যাপটেন স্পেডের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন। ক্যাপটেন যেভাবে মাথা দোলাল তার একটাই অর্থ হতে পারে—সবই সে বুঝতে পারছে।

স্পেডের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে সতেরো নম্বর ওয়ার্ড। ওয়ার্ডের কোথায় কি আছে সব সে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে। তার চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনা, মনে মনে কি যেন একটা মতলব ভাঁজছে।

সতেরো নম্বর ওয়ার্ডের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচিল, এই পাঁচিল টিলা ও নদীর ঢাল পর্যন্ত লম্বা। ছোট একতলা একটা আলাদা বাড়িকে সতেরো নম্বর ওয়ার্ড বানানো হয়েছে। বাড়িটায় বারান্দা আছে, দুটো ঘর আছে, আর আছে বড় একটা হলঘর। বাড়ির প্রতিটি জানালায় লোহার গরাদ লাগানো। চারপাশে প্রকাণ্ড সব গাছ।

অধ্যক্ষ ওঁদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন। বাড়িটার সামনে পৌঁছে ওঁরা দেখলেন দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছেন গেডন।

কাউন্ট অপলক দৃষ্টিতে লক্ষ করলেন গেডনকে।

সতেরো নম্বর ওয়ার্ডে বাইরের লোকজন এর আগেও এসেছে, কাজেই কাউন্ট আর তাঁর সঙ্গীকে দেখে গেডনের অবাক হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু তবু তিনি অবাক হলেন। কাউন্ট দার্তিগাসের নাম আগেই শুনেছেন তিনি, জানেন চরিত্রটি রহস্যময়।

'গেডন,' অধ্যক্ষ জিজ্ঞেস করলেন, 'টমাস রসকে দেখছি না যে?'

'ওদিকে,' হাত তুলে দেখিয়ে বললেন গেডন। ওয়ার্ডের বাইরে গাছপালার নিচে পায়চারি করছেন টমাস রস।

অধ্যক্ষ বললেন, 'ইনি কাউন্ট লা কোঁত্ দার্তিগাস, আমাদের স্যানাটরিয়াম দেখতে এসেছেন। ওনার খুব কৌতূহল টমাস রসকে একবার কাছ থেকে দেখবেন।'

কথা না বলে গেডন শুধু চোখ ঘুরিয়ে কাউন্টকে একবার দেখলেন। তিনি পা বাড়াতে বাকি সবাই তাঁর পিছু নিল।

সরাসরি টমাস রসের সামনে এসে দাঁড়ালেন কাউন্ট দার্তিগাস।

মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত মানুষটি কিন্তু নিজের খেয়ালে আছেন, ওঁদেরকে দেখেও দেখতে পাচ্ছেন না।

ক্যাপটেন স্পেড এখনও সতেরো নম্বর ওয়ার্ড খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে। সবাই যখন টমাস রসের দিকে পা বাড়াল, সবার অলক্ষ্যে পিছিয়ে পড়ল সে, ঢালু পথ দিয়ে দ্রুত নামতে শুরু করতেই পাঁচিলের ওপর উঁচু হয়ে থাকা জিনিসটা দেখতে পেল। ওটা একটা মাস্তুলের ডগা। ওই মাস্তুল যে এব্বার, সেটা আর তাকে বলে দেয়ার প্রয়োজন নেই, দেখেই চিনতে পেরেছে। অর্থাৎ, সতেরো নম্বর ওয়ার্ডের ঠিক গা ঘেঁষেই নোঙর ফেলেছে এব্বা।

এদিকে কাউন্ট দার্তিগাস কথা না বলে অপলক চোখে টমাস রসের হাবভাব লক্ষ করছেন। দেড় বছর এক রকম বন্দী জীবন কাটাচ্ছেন এখানে অথচ টমাস রসের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েনি, রীতিমত সুস্থ-সতেজ আছেন। তবে চোখ-মুখের অস্থির ভাব, হাত ঝাঁকানোর ভঙ্গি, ছন্দহীন ও এলোমেলো পদক্ষেপ দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি মানসিক ভারসাম্যহীনতার শিকার।

একটা পাথুরে বেঞ্চে বসে পড়লেন টমাস রস। হাতে একটা ছড়ি রয়েছে, সেটা দিয়ে মাটিতে একটা দুর্গের ছবি আঁকছেন। একটু পর বেঞ্চ ছেড়ে মাটিতে হাঁটু গাড়লেন, ধুলোবালি জড়ো করে ছোট ছোট ঢিবি তৈরি করছেন। তারপর তাড়াহুড়ো করে গাছের কিছু পাতা ছিঁড়ে এনে ঢিবিগুলোর ওপর বসিয়ে দিলেন। নিজের কাজে এতই মগ্ন যে এখনও ওদের উপস্থিতি সম্পর্কে এতটুকু সচেতন নন। তাঁর এই কাজকে ছেলেমানুষি খেলা ছাড়া আর কি-ই বা বলা যায়। কিন্তু তাঁর মত এরকম গাম্ভীর্য নিয়ে কোন ছেলে এই খেলা খেলবে না।

'এ তো দেখছি বদ্ধ উন্মাদ!' কাউন্টের বলার সুরে চরম হতাশাই প্রকাশ পেল।

'দুঃখিত, মঁশিয়ে লা কোঁত,' বললেন অধ্যক্ষ। 'আপনাকে তো আগেই আভাস দিয়েছি, তাঁর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু তাই বলে উনি একবার আমাদের দিকে ফিরেও তাকাবেন না?'

'বলা মুশকিল।' অধ্যক্ষ গেডনের দিকে তাকালেন। 'গেডন, চেষ্টা করে দেখো তো। তোমার ডাকে তো উনি সাড়া দেন।'

'তা দেন,' বলে রসের কাঁধে একটা হাত রাখলেন গেডন, তারপর নরম সুরে ডাকলেন, 'মঁশিয়ে রস?'

ডাক শুনে মুখ তুললেন রস, তবে গেডন ছাড়া আর কাউকে খেয়াল করছেন বলে মনে হলো না।

'মঁশিয়ে রস,' ইংরেজিতে কথা বলছেন গেডন, 'ওঁরা আপনাকে দেখতে এসেছেন। আপনার কাজ সম্পর্কে ওঁদের খুব আগ্রহ।'

'আগ্রহ? আমার কাজ সম্পর্কে?' হঠাৎ ঝুঁকে মাটি থেকে একটা ঢিল কুড়ালেন রস, তারপর ঢিবিগুলো লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন সেটা। সবগুলো ঢিবি গুঁড়িয়ে গেল। 'খতম! খতম! দুর্গ খতম! একটা বিস্ফোরণেই সব উড়িয়ে দিয়েছি!' পরম উল্লাসে লাফাচ্ছেন তিনি, হাততালি দিচ্ছেন।

'দেখলেন তো?' কাউন্ট দার্তিগাসকে বললেন অধ্যক্ষ। 'নিজের আবিষ্কারের কথা ঠিকই তাঁর মনে থাকে। গেডন, চেষ্টা করে দেখো তো ফুলগুরেটর সম্পর্কে কিছু বলাতে পারো কিনা।'

গেডন জবাব দিলেন, 'আপনি যখন বলছেন, চেষ্টা করছি। কিন্তু এতে ঝুঁকি আছে। পাগলামির মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে।'

'যদি দেখো বাড়ছে, তাহলে আর ঘাঁটিয়ো না,' পরামর্শ দিলেন অধ্যক্ষ। 'বলো এঁরা ওঁর ফুলগুরেটর কিনতে চান।'

'ফুলগুরেটর সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উনি সব সূত্র বলে ফেলবেন না তো?' আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলেন কাউন্ট।

ভুরু কুঁচকে তাকালেন গেডন। কাউন্টের আগ্রহ তাঁর মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলল। 'সে আশা করলে ঠকতে হবে আমাদের,' বললেন তিনি। 'ইনি অত্যন্ত সেয়ানা পাগল। পুরো টাকা না পেলে একটা তথ্যও ফাঁস করবেন না।'

নীরস, ঠাণ্ডা সুরে কাউন্ট বলল, 'আমি টাকা নিয়ে আসিনি।'

আবার রসের কাঁধে একটা হাত রাখলেন গেডন। 'মঁশিয়ে রস, এঁরা আপনার আবিষ্কারটা কিনতে চান।'

ঝট করে সিধে হলেন টমাস রস। 'আমার আবিষ্কার? ফুলগুরেটর? বিস্ফোরক?' এভাবে অকস্মাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠার মানে হলো গেডনের আশঙ্কাই বোধহয় সত্যি হতে যাচ্ছে—রোগের প্রকোপ বেড়ে যাবে। 'দাম দেবেন কত? কত দাম দেবেন?'

যে-কোন একটা দাম বলতে অসুবিধে কি। গেডন বললেন, 'এই ধরুন এক কোটি ডলার।'

'মাত্র! মাত্র এক কোটি!' রস চিৎকার করছেন। 'দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা বিস্ফোরকের জন্যে মাত্র এক কোটি ডলার? দূর, দূর! দশ হাজার গজ দূরের টার্গেট যে ক্ষেপণাস্ত্র চোখের পলকে ধ্বংস করে দিতে পারে তার জন্যে এত কম দাম? আমি তো বলি ওটার দাম হওয়া উচিত দশ হাজার কোটি ডলার—লক্ষ কোটি ডলার!'

সন্দেহ নেই, রসের সঙ্গে দরদাম নিয়ে আলোচনা করা বৃথা। তিনি মাত্রা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। এই মুহূর্তে গেডন যদি লক্ষ কোটি ডলারেও রাজি হয়ে যান, রস হয়তো নিজের সিদ্ধান্ত বদলে দ্বিগুণ দাম হেঁকে বসবেন।

কাউন্ট দার্তিগাস খুঁটিয়ে লক্ষ করছেন রসের আচরণ।

হঠাৎ আবার চিৎকার করে উঠলেন রস। 'লক্ষ কোটি ডলার! লক্ষ কোটি ডলার!' চিৎকার করতে করতে দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন তিনি। তাঁর পিছু নিয়ে গেডনও ছুটলেন। রসের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে কোন রকমে শান্ত করলেন তাঁকে, তারপর বাড়ির ভেতর এনে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন।

অধ্যক্ষ কাউন্টকে বললেন, 'মঁশিয়ে রসের কি অবস্থা নিজের চোখেই তো দেখলেন। এ রোগ সারবে বলে তো মনে হয় না। আর সুস্থই যদি না হন, অত টাকা নিয়ে করবেনই বা কি!'

'শুনেছি ফুলগুরেটরের ক্ষমতা নাকি সীমাহীন, কাজেই অসম্ভব একটা দাম তিনি চাইতেই পারেন।'

'কিন্তু রোগের প্রকোপ যেভাবে বাড়ছে, ফুলগুরেটরের কথা তাঁর মাথা থেকে যদি মুছে যায়?'

'কে জানে, ঘৃণা ও বিদ্বেষ হয়তো কোনদিনই মুছবে না,' নিচু গলায় বললেন কাউন্ট দার্তিগাস। হাঁটতে হাঁটতে মেইন গেটের কাছে চলে এলেন ওঁরা। এই সময় হঠাৎ ক্যাপটেন স্পেডও ফিরে এল।

# তিন

অধ্যক্ষের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফেরার পথে স্পেডকে প্রশ্ন করলেন কাউন্ট দার্তিগাস, 'চারদিকটা ভাল করে দেখেছ তো? গুরুত্বপূর্ণ কোন জিনিস তোমার চোখ এড়ায়নি?'

'না, মঁশিয়ে লা কোঁত,' সবিনয়ে জবাব দিল স্পেড। 'যা যা দেখার সব আমি দেখে নিয়েছি। পিছনে পাঁচিল থাকায় সতেরো নম্বর ওয়ার্ডে পৌঁছানো পানির মত সহজ। কিন্তু টমাস রসের অবস্থা দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে? এখনও কি আপনি কাজটা করতে চান?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'তাঁর এই মানসিক অসুস্থতা দেখেও?'

'হ্যাঁ, সব দেখেও। এখন শুধু যদি একবার তাঁকে বের করে…'

'সে দায়িত্ব আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। পাঁচিল টপকে ওয়ার্ডে ঢোকা কোন সমস্যাই নয়। রসকে নিয়ে অবশ্য দরজা দিয়েই বেরুতে হবে।' নদীর দিকে মুখ করা একটা দরজা দেখাল স্পেড, স্যানাটরিয়ামের কর্মচারীরা নদীতে

ওই পথেই আসা-যাওয়া করে। 'ওই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারলে রশির সিঁড়িও লাগবে না।'

'কিন্তু বন্ধ দরজা তুমি খুলবে কিভাবে?'

'বাগানে ঘুরঘুর করার সময় খুলে রেখে এসেছি। তাছাড়া, এই দেখুন চাবি।' পকেট থেকে চাবির একটা গোছা বের করে দেখাল স্পেড।

স্পেডের পিঠ চাপড়ে দিলেন কাউন্ট দার্তিগাস। 'বাহ্, দারুণ! তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, রসকে কিডন্যাপ করা খুব কঠিন হবে না। সঙ্গে ক'জনকে নেবে তুমি?'

'পাঁচজন হলেই চলবে। গেডন বাধা দিলে উচিত শাস্তি দেয়া হবে তাকে।'

'উচিত শাস্তি? না-না। রসের সঙ্গে ওকেও বন্দী করে নিয়ে আসবে তোমরা এব্বায়। রস এরইমধ্যে তার কাছে সব গুমর ফাঁস করে দিয়েছে কি না কে জানে।'

'ঠিক আছে।'

'গেডনকে এমনিতেও দরকার হবে। সে-ই তো রসের দেখাশোনা করে।'

নদীর পাড়ে এব্বার একটা নৌকা অপেক্ষা করছে। তীর থেকে বেশ খানিকটা দূরে পানিতে দোল খাচ্ছে স্কুনার এব্বা। সবগুলো পাল গুটানো। বড় মাস্তুলের মাথায় একটা রক্তলাল পতাকা উড়ছে পতপত করে। নৌকায় চড়ে স্কুনারে ফিরে এলেন কাউন্ট দার্তিগাস। নৌকা থেকে রশির সিঁড়ি বেয়ে তাঁর পিছু পিছু স্পেডও উঠল। জাহাজটার পাশে জোয়ারের ফুলে ওঠা পানিতে একটা ছোট বয়া ভাসছে।

রাত আটটার পর স্কুনার থেকে স্পেড ও সেরকো রওনা হলো, সঙ্গে আরও চারজন লোক রয়েছে। কাউন্ট দার্তিগাস বলে দিয়েছেন, টমাস রসকে একা নয়, তাঁর সঙ্গে গেডনকেও অপহরণ করে আনতে হবে। তবে কাজটা করতে হবে গোপনে, চুপি-সাড়ে। কাকপক্ষীও যেন টের না পায়। সেরকো অবশ্য হেসে উঠে বলেছে, 'টের পেলেই বা কি! গরু খোঁজা করলেও তো কেউ ওদেরকে খুঁজে পাবে না।'

সতেরো নম্বর ওয়ার্ডের বাইরে নিস্তব্ধতা জমাট বেঁধে আছে। বাতাস নেই, গাছের একটা পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। নদীর দিকে মুখ করা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল দলটা। তালায় চাবি ঢোকাল স্পেড। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই। ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। তারপর আস্তে করে ঠেলতেই খুলে গেল দরজা।

উঁকি দিয়ে ভেতরটা একবার ভাল করে দেখে নিল স্পেড। কাউকে দেখা

যাচ্ছে না। নিঃশব্দ পায়ে ঢুকে পড়ল সে। বাকি সবাই পিছু নিয়েছে। দরজায় তালা লাগাবার দরকার নেই, শুধু কবাট জোড়া লাগালেই হবে। তালা লাগালে পালাবার সময় সমস্যা হতে পারে।

শুধু একটা জানালায় আলো দেখা গেল। ওটাই হয়তো টমাস রসের শোবার ঘর। গেডনও তো একই ঘরে থাকেন। ওরা শুনেছে, রোগীকে ছেড়ে কোথাও সে যায় না।

এফরনাট ওদের সঙ্গে স্যানাটরিয়াম পর্যন্ত আসেনি, নৌকায় অপেক্ষা করছে। চারজন সঙ্গীকে নিয়ে টমাস রসের কামরার সামনে এসে সমস্যায় পড়ল স্পেড। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, খুলবে কিভাবে! জানালার কাঁচ ভেঙে ভেতরে কাউকে ঢোকানো যায়, দরজাটা সে-ই খুলে দেবে। কিন্তু কাঁচ ভাঙতে গেলে শব্দ হবে, আর সেই শব্দে গেডন জেগে উঠতে পারেন। এখন তাহলে উপায়?

ইশারায় সবাইকে চুপচাপ অপেক্ষা করার নির্দেশ দিল ক্যাপটেন স্পেড, তারপর পায়ের পাতায় ভর দিয়ে জানালার ভেতর তাকাল। দেখল, টমাস রস বিছানায় শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছেন, জুতো ও প্যান্ট-শার্ট সব যেমন বিকেলে পরেছিলেন এখনও তেমনি পরে আছেন। আর গেডন এক লোকের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছেন। লোকটা আসলে ডাক্তার, হাতে ব্যাগ। বিকেলে রস খেপে উঠেছিলেন, সে তো নিজের চোখেই দেখেছে স্পেড। পরে তার খেপামি আরও বেড়ে যাওয়ায় ডাক্তার ডাকতে বাধ্য হয়েছেন গেডন। ডাক্তার এসে কড়া ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন রসকে। এখন তিনি বিদায় নেবেন।

দরজা খুলে গেল। ডাক্তারকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন গেডন। ইতিমধ্যে স্পেড আর তার দল জানালার কাছ থেকে সরে গিয়ে আড়াল নিয়েছে। ডাক্তারকে নিয়ে রাস্তার দিকে এগোলেন গেডন। ডাক্তার বললেন, 'রোগের প্রকোপ এভাবে বাড়তে থাকলে এক সময় কিন্তু ওঁকে সামলানো কঠিন হয়ে উঠবে, তখন আর ঘুমের ওষুধেও কাজ হবে না। আপনাদের লক্ষ রাখতে হবে উনি যেন কোনভাবেই উত্তেজিত না হন।'

'অধ্যক্ষ যে কেন বাইরের লোকজনকে ভেতরে ঢুকতে দেন!' গেডন হতাশ ও বিরক্ত। 'কোথাকার কে এক কাউন্ট এসেছিলেন, তাঁর কারণেই রস খেপে উঠলেন।'

গেডন ডাক্তারকে এগিয়ে দিচ্ছেন, এই সুযোগে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে স্পেড আর তার দল ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। তবে সবাই নয়, দু'জন গেডনের ফিরে আসার অপেক্ষায় গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকল।

একটু পরই দেখা গেল গেডনকে, একা ফিরে আসছেন। বাড়ির ধাপের

কাছে আসতেই পিছন থেকে তাঁর মাথায় লাঠির ঘা পড়ল। গেডন চিৎকার করার কোন সুযোগ পেলেন না, তার আগেই কে যেন মুখের ভেতর কাপড় গুঁজে দিল। ঝটপট পট্টিও বাঁধা হলো চোখে। সবশেষে হাত দুটোও পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলা হলো।

জাহাজের রেইলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে নিচে তাকিয়ে আছেন কাউন্ট দার্তিগাস। 'কি খবর?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলেন তিনি। বৈঠা চালাবার স্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন।

'অপারেশন সাকসেসফুল!'

'দু'জনকেই আনা হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ, দু'জনকেই।'

'ওদের কেউ কিছু টের পায়নি?'

'না।'

গেডন ও রসকে ওরা কিন্তু এব্বায় তুলল না। ইতিমধ্যে গেডনের জ্ঞান ফিরে এসেছে। তিনি শুনতে পেলেন স্কুনারের পাশে অদ্ভুত ধরনের খসখসে একটা শব্দ হচ্ছে। অনুভব করলেন কয়েক জোড়া হাত ধরাধরি করে কোথাও বয়ে আনল তাঁকে, তারপর ধপ করে নামাল।

রাত গভীর থেকে গভীরতর হলো। এব্বা কিন্তু পালাচ্ছে না। জাহাজটা যেখানে ছিল সেখানেই থাকল। ব্যাপারটা বিস্ময়কর। একজোড়া মানুষকে অপহরণ করার পরও এদের মনে কি ধরা পড়ার ভয় নেই?

## চার

পরদিন সকালে অস্বাভাবিক কোন ব্যস্ততা ছাড়াই যাত্রা শুরু করার প্রস্তুতি নিল এব্বা। আটটা বাজে, কিন্তু ডেকে এখনও বেরোননি কাউন্ট। এঞ্জিনিয়ার সেরকোকেও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। শুধু ক্যাপটেন স্পেডের হাঁক-ডাক শুনে বোঝা যাচ্ছে স্কুনার একটু পরই রওনা হবে।

এব্বা আসলে একটা ইয়ট। সরু, ছিপছিপে গড়ন। প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাসের মধ্যেও ঘণ্টায় বারো নট স্পীডে ছুটতে পারে। এব্বার কলকব্জা সবই খুব ভাল, তবে সমস্যা হলো পালতোলা জাহাজ হওয়ায় বাতাসের অপেক্ষায় থাকতে হয়। তবে আজ সকালে পশ্চিম দিক থেকে ভালই বাতাস বইছে; নয়জে থেকে

বেরিয়ে পামলিকো সাউন্ডে পৌঁছাতে, আর তারপর খোলা সাগরে গিয়ে পড়তে কোন অসুবিধে হবে না এবার।

অকস্মাৎ কামান গর্জে উঠল। নদীর তীর ঘেঁষা দুর্গের সামনে সারি সারি কামান দেখা যাচ্ছে, ওদিকেই বিস্ফোরিত হলো কালো ধোঁয়া। আশপাশের দ্বীপেও অনেক কামান আছে, এক এক করে সেগুলো গর্জন করছে।

এতক্ষণে ডেকে বেরিয়ে এলেন কাউন্ট দার্তিগাস। এঞ্জিনিয়ার সেরকোকেও এবার দেখা গেল। ওদের সামনে এসে দাঁড়াল ক্যাপটেন স্পেড। 'ওরা কামান দাগছে।'

'হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল সেরকো, কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের সুর।

'এর মানে হলো, সবাই এখন জানে হেলথফুল হাউসে কাল রাতে কি ঘটেছে।'

'আর তাই কামান দেগে প্রণালী থেকে বেরুবার পথ বন্ধ করে দিচ্ছে ওরা।'

'এর সঙ্গে আমাদের কি কোন সম্পর্ক আছে?' ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করলেন কাউন্ট দার্তিগাস, যেন কিছুই তিনি জানেন না।

এঞ্জিনিয়ারও নিরীহ একটা ভাব নিয়ে জবাব দিল, 'নাহ্, আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।'

এবার দেখা যাক টমাস রস আর গেডন নিখোঁজ হবার পর স্যানাটরিয়াম হেলথফুল হাউসে কি ঘটছে। রোজ সকালে সতেরো নম্বর ওয়ার্ডে রসকে একবার দেখতে আসেন ডাক্তার; আজও এসেছেন। এসে দেখেন ঘরে কেউ নেই। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেয়া হলো অধ্যক্ষকে। ওয়ার্ডের চারপাশটা ভাল করে খুঁজে দেখতে বললেন তিনি। এই খোঁজাখুঁজি করতে গিয়েই ধরা পড়ল ব্যাপারটা—টিলার নিচে, পাঁচিল ঘেঁষে যে দরজাটা আছে তাতে তালা ঝুলছে ঠিকই, কিন্তু তালার ফুটো থেকে চাবিটা উধাও হয়ে গেছে, এবং ভেতর দিকের ছিটকিনিটা খোলা। কারও আর সন্দেহ থাকল না যে এই দরজা দিয়েই টমাস রস আর তাঁর শুশ্রূষাকারী গায়েব হয়ে গেছেন। প্রশ্ন হলো, তাঁরা কি স্বেচ্ছায় কোথাও চলে গেছেন, নাকি তাঁদেরকে অপহরণ করা হয়েছে?

নিউবার্ন আর ব্যালে, দুই জায়গায় দুঃসংবাদটা জানিয়ে তার পাঠানো হলো। পাল্টা তারবার্তায় উত্তর-ক্যারলিনার গভর্নর হুকুম জারি করলেন—সার্চ না করার আগে কোন জাহাজকে যেন পামলিকো সাউন্ড থেকে বেরুতে দেয়া না হয়। ক্রুজার 'ফ্যালকন'-এ বিশেষ একটা তার পৌঁছাল—এই ক্রুজারই প্রতিটি জাহাজে তল্লাশি চালাবে। আরও নির্দেশ দেয়া হলো, গোটা এলাকা সীল করে দিতে হবে, ফাঁকি দিয়ে একটা মাছিও যাতে পালাতে না পারে।

এবার মাইল দুই পুবে রয়েছে ফ্যালকন। ডেকে দাঁড়িয়ে কাউন্ট দার্তিগাস

দেখতে পেলেন ক্রুজারটা জাহাজগুলোর তল্লাশি চালাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এখন যদি এব্বা চায় তাহলে অনায়াসে পালাতে পারে, কারণ স্কুনারের ছোটার গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জিততে পারবে না ক্রুজার।

'বস্, কি বলেন?' কাউন্টকে জিজ্ঞেস করল ক্যাপটেন। 'নোঙর তুলব নাকি?'

'তুলতে পারো, হাওয়া যখন অনুকূলেই পাচ্ছ,' বললেন কাউন্ট। 'তবে ব্যস্ততা দেখিয়ো না, যা করার ধীরেসুস্থে।'

সেরকো বলল, 'সাউন্ডের সবগুলো খাঁড়িতেই এখন পাহারা বসবে। ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'তবু পাল তোলো। ফ্যালকনের অফিসাররা সার্চ করে কিছুই যখন পাবে না, তখন তো ছাড়পত্র দিতে বাধ্য।' কাউন্ট মুচকি মুচকি হাসছেন।

'ছাড়পত্র তো দেবেই, ঝামেলা করার জন্যে দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমাপ্রার্থনাও করবে।' হেসে উঠল এঞ্জিনিয়ার।

ওদিকে শহর জুড়ে শুরু হয়েছে মহা হৈ-চৈ। কর্তৃপক্ষ হতবিহ্বল। তাঁরা বুঝতেই পারছেন না টমাস রস স্বেচ্ছায় পালিয়েছেন, নাকি তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে। সবাই জানে, গেডন সাহায্য না করলে রস পালাতে পারেন না। কিন্তু সবাই এ-ও জানে যে গেডন তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না। তাহলে ধরে নিতে হয় রস ও গেডন দু'জনকেই গুম করা হয়েছে। শুধু গুম, নাকি গুম খুন?

উত্তর-ক্যারলিনের সর্বত্র কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হলো। নৌবাহিনী ও সেনাবাহিনী একসঙ্গে উইলমিংটন থেকে নরফোক পর্যন্ত যত বন্দর পড়বে সবগুলোয় পাহারা দেবে। শুধু পাহারা দেবে না, বন্দরের প্রতিটি জাহাজ তন্নতন্ন করে সার্চও করবে। নির্দেশ দেয়া হলো, সন্দেহ হলেই যে-কোন জাহাজকে যতক্ষণ খুশি আটকে রাখা যাবে। তল্লাশীর কাজে ফ্যালকনকে সাহায্য করার জন্যে আরও কয়েকটা বাষ্পচালিত জাহাজকে তৈরি রাখা হলো।

তল্লাশি চালাবার এত সব আয়োজন দেখেও কাউন্ট দার্তিগাস কিন্তু মোটেও উদ্বিগ্ন নন। টমাস রস আর গেডনকে এব্বায় পাওয়া গেলে তার পরিণাম যে কি ভয়াবহ হবে তা জেনেও তিনি যেন না জানার ভান করে আছেন।

ইতিমধ্যে এব্বা যাত্রা শুরুর জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। ক্যাপটেন সেরকো জাহাজের মুখ পুবদিকে ঘুরিয়ে দিল। তারমানে নয়জে নদীর বাম তীর ঘেঁষে রওনা হবে স্কুনার।

নিউ-বার্ন থেকে পনেরো মাইল উত্তর-পশ্চিমে অকস্মাৎ বাঁক নিয়েছে নদী, তারপর চওড়া হয়ে গেছে খাঁড়ি। বাঁকের কাছে পৌঁছাতেই প্রবল বাতাস পাওয়া

গেল, ফুলে ওঠা পালগুলো দ্রুতবেগে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এব্বাকে।

বেলা ক্রমশ বাড়তে লাগল। দেখতে দেখতে এগারোটা বেজে গেল। ফ্যালকন বা অন্যকোন জাহাজ তল্লাশি চালাতে এল না। সিভান দ্বীপের অন্তরীপ ঘুরে এল এব্বা, কোন ঝামেলা ছাড়াই পৌঁছে গেল পামলিকো সাউন্ডে।

সিভান ও রোডওক দ্বীপের মধ্যবর্তী দূরত্ব ষাট মাইল। মাঝখানে অনেকগুলো খুদে দ্বীপ এক সারিতে দীর্ঘ একটা রেখা তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে। পামলিকো সাউন্ড থেকে আটলান্টিকে পৌঁছাবার জন্যে একাধিক প্রণালী ব্যবহার করা যায়। সিভান দ্বীপে একটা বাতিঘর আছে, সেটাকে পাশ কাটালেই সামনে পড়বে ওক্রাকোক প্রণালী, আরও সামনে রয়েছে হ্যাটেরাস খাল ছাড়াও দু'তিনটে পথ। ওক্রাকোক প্রণালীর দিকেই যাচ্ছে এব্বা। কিন্তু সবচেয়ে বড় বাধাটা এখানেই। কোন জাহাজ বন্দর ছেড়ে রওনা হলেই ফ্যালকনের কর্মচারীরা বাধা দিচ্ছে। শুধু যে এই একটা প্রণালীর মুখে বাধা দেয়া হচ্ছে, তা নয়; প্রতিটি প্রণালীর মুখেই একটা করে মার্কিন জাহাজ পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। সেনাবাহিনী সদস্যদের ডাকা হয়েছে, তাদের কড়া নজরদারির মধ্যে সার্চ করা হচ্ছে প্রতিটি জাহাজ।

এব্বা কিন্তু বিনা বাধায় ওক্রাকোক প্রণালী পেরিয়ে এল। পামলিকো সাউন্ডের পানিতে আলোড়ন তুলে বাষ্পচালিত বেশ কয়েকটা জাহাজ পাহারা দিচ্ছে, এব্বার দিকে একটাও এগিয়ে এল না বা থামার সংকেত দিল না। এব্বা যে ওগুলোকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করছে, তা-ও কিন্তু নয়। সে তার নিজের খেয়ালে ধীরেসুস্থে সোজা পথ ধরে হ্যাটেরাস প্রণালীর দিকে এগিয়ে চলল। কারও জানা নেই কাউন্ট দার্তিগাস আটলান্টিক পাড়ি দেয়ার জন্যে এই পথটাকেই কেন বেছে নিয়েছেন।

শুল্ক বিভাগ বা নৌবাহিনী এখনও এব্বাকে থামাচ্ছে না। এব্বার আচরণ দেখেও মনে হচ্ছে না যে সে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেতে চায়। আসলে এই দিনের বেলা খোলা সমুদ্রে ফাঁকি দিয়ে পালানো আদৌ সম্ভব নয়। প্রশ্ন হলো, এব্বাকে থামানো হলে কি ঘটবে? তল্লাশি.চালাবে সতর্ক অফিসাররা, তাদের শ্যেনদৃষ্টিকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়। আচ্ছা, এমন কি হতে পারে যে কাউন্ট দার্তিগাস খুব নামকরা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ বলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিরক্ত করতে চাইছেন না? নাহ্, তা কি করে হয়! যতই বিখ্যাত বা জাঁদরেল হন, তিনি বিদেশী। তাঁর সত্যিকার পরিচয়ও আসলে কেউ জানে না। এরকম একজন মানুষকে তল্লাশি থেকে রেহাই দেয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বরং এই সুযোগে কর্তৃপক্ষ যদি জানতে চেষ্টা করেন কে তিনি, কোত্থেকে এসেছেন, উদ্দেশ্য কি, তাতে বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না।

কাউন্ট দার্তিগাস বেতের তৈরি একটা ডেক চেয়ারে আরাম করে বসে আছেন। পাশেই তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছে ক্যাপটেন স্পেড আর এঞ্জিনিয়ার সেরকো।

'ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে আমাদের ব্যাপারে হুজুররা তেমন মনোযোগী নন,' মন্তব্য করল সেরকো।

হালকা সুরে কাউন্ট দার্তিগাস বললেন, 'ওরা ওদের সময় মত আসবে আর কি।'

'হয়তো খেয়াল রাখছে কখন আমরা হ্যাটেরাস প্রণালীতে ঢুকি,' বলল স্পেড। 'তারপরই খপ করে ধরবে।'

'বেশ তো, ধরুক না,' বলে চোখ বুজলেন কাউন্ট দার্তিগাস, যেন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে চাইছেন।

এব্বার কেউই তল্লাশির ব্যাপারে উদ্বিগ্ন নয়। রহস্যটা কি? এরমানে কি এই যে টমাস রস আর গেডনকে জাহাজের এমন কোন গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে, হাজার খুঁজলেও দক্ষ সব গোয়েন্দারা তাঁদেরকে খুঁজে পাবে না?

কর্তৃপক্ষ কি নির্দেশ দিয়েছেন কাউন্ট দার্তিগাসের তা জানার কথা নয়। জানলে হয়তো এতটা নিশ্চিন্ত মনে তিনি থাকতে পারতেন না। ফ্যালকন ছাড়াও শুল্ক বিভাগের প্রতিটি জাহাজকে নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, এব্বার ওপর বিশেষ নজর রাখতে হবে। কারণটাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কাউন্ট দার্তিগাসই একমাত্র বহিরাগত যিনি সর্বশেষ টমাস রসকে দেখতে গিয়েছিলেন। বিকেলে দেখতে গেলেন, আর রাতের মধ্যেই গেডনসহ নিখোঁজ হয়ে গেলেন ফরাসী বিজ্ঞানী। তারপর সকাল হতেই নোঙর তুলে রওনা হয়ে গেল এব্বা। ব্যাপারটা খুবই সন্দেহজনক। তবে নির্দেশে এ-ও বলা হলো, প্রথমে এব্বার মতিগতি লক্ষ করতে হবে, দেখতে হবে জাহাজটা কোন রহস্যময় আচরণ করে কিনা। তারপর যখনই কোন প্রণালী ধরে নাগালের বাইরে চলে যাবার চেষ্টা করবে, তখনই তাকে থামিয়ে সার্চ করতে হবে।

দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। তিনটে বাজে। এব্বা আগের মতই চলছে। হ্যাটেরাস প্রণালী আর মাত্র মাইলখানেক সামনে।

ছোট কয়েকটা মাছধরা জাহাজে তল্লাশি চালিয়ে প্রণালীর মুখেই অপেক্ষা করছে ফ্যালকন। ফাঁকি দিয়ে পালাবে, তার কোন সুযোগই নেই এব্বার। পালতোলা জাহাজ কি কখনও বাষ্পচালিত জাহাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারে! থামার সঙ্কেত পেয়েও এব্বা যদি না থামে, নির্ঘাত কামানের গোলা ছুটে আসবে।

ফ্যালকন থেকে ছোট একটা নৌকা রওনা হলো। সন্দেহ নেই এব্বায় তল্লাশি চালাতেই আসছে ওটা। নৌকায় বসে রয়েছে দশজন নাবিক আর দু'জন

অফিসার।

ডেকে বসে নৌকাটার আসা দেখছেন কাউন্ট দার্তিগাস। ধীরেসুস্থে একটা চুরুট ধরালেন তিনি।

দূরত্ব এখনও প্রায় দুশো গজ, নৌকায় দাঁড়িয়ে এক লোক পতাকা নাড়তে শুরু করল।

'থামার সঙ্কেত দিচ্ছে,' বলল সেরকো।

'অসুবিধে কি, থামি আমরা,' বললেন কাউন্ট দার্তিগাস।

ক্যাপটেন স্পেড জাহাজ থামাবার নির্দেশ দিল। ছপ ছপ করে বৈঠা চালিয়ে এসে নাবিকরা নৌকাটাকে এব্বার গায়ে ভেড়াল। রশি দিয়ে জাহাজের সঙ্গে বাঁধা হলো সেটাকে। রশির সিঁড়ি নামল জাহাজ থেকে, আটজন নাবিককে নিয়ে দ্রুত ডেকে উঠে এলেন অফিসাররা। এব্বার মাঝি-মাল্লারা মাস্তুলের সামনে, উঁচু পাটাতনে সার বেঁধে দাঁড়াল।

ফ্যালকনের একজন লেফটেন্যান্ট কাউন্ট দার্তিগাসের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ডেক চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন এব্বার মালিক।

'কাউন্ট দার্তিগাস? এই স্কুনার আপনার?' জানতে চাইলেন লেফটেন্যান্ট।

'হ্যাঁ, আমিই কাউন্ট দার্তিগাস, এব্বার মালিক।'

'ক্যাপটেন?'

'স্পেড।'

'জাতি?'

'ইন্দো-মালয়ী।'

লেফটেন্যান্ট চোখ তুলে এব্বার পতাকাটা একবার দেখে নিলেন।

কাউন্ট বললেন, 'জানতে পারি, আমার ক্ষুদ্র স্কুনারে কি উদ্দেশ্যে আপনার আগমন?'

'কর্তৃপক্ষের হুকুম, পামলিকো সাউন্ডের প্রতিটি জলযান সার্চ করতে হবে,' বললেন লেফটেন্যান্ট। 'আপনার কোন আপত্তি নেই তো, মঁশিয়ে লা কোঁত্?'

'না, কেন আপত্তি করব। প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করুন। কিন্তু হঠাৎ এরকম তল্লাশি চালাবার কারণ কি বলুন তো?'

'ক্যারলিনের গভর্নরকে রিপোর্ট করা হয়েছে, স্যানাটরিয়াম হেলথফুল হাউস্ থেকে নিখোঁজ হয়েছেন দু'জন মানুষ। কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হতে চান কোন জাহাজে তুলে তাদেরকে পাচার করা হচ্ছে না।'

'বলেন কি! এ-ও কি সম্ভব!' কৃত্রিম হলেও, কাউন্ট দার্তিগাসের আঁতকে ওঠাটা পুরোপুরি নিখুঁত। 'কিন্তু তাদের পরিচয় কি? কারা নিখোঁজ হলেন?'

'নিখোঁজ হয়েছেন একজন উন্মাদ বিজ্ঞানী আর তাঁর শুশ্রূষাকারী।'

'উন্মাদ? আপনি কি টমাস রসের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, টমাস রসই নিখোঁজ হয়েছেন।' লেফটেন্যান্ট তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছেন কাউন্টকে।

'বলেন কি! এ তো দেখছি তাজ্জব ব্যাপার!' একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়লেন কাউন্ট দার্তিগাস। 'আচ্ছা, তাই তো বলি—সেজন্যেই তাহলে এত কড়াকড়ি। কিন্তু আপনারা ভুল জায়গায় এসেছেন, লেফটেন্যান্ট। এব্বায় টমাস রস বা তার সাহায্যকারীকে পাবেন না। তবে আমার কথা বিশ্বাস করার দরকার নেই। তল্লাশি চালিয়ে নিশ্চিত হোন। ক্যাপটেন, এদেরকে তুমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও।' কথা শেষ করে ডেক চেয়ারে বসে পড়লেন কাউন্ট। তাঁর চেহারায় কোন ভাব নেই। নিভে যাওয়ায় চুরুটটা ধীরেসুস্থে আবার ধরাচ্ছেন।

প্রথমে এব্বার কেবিনগুলোয় তল্লাশি চালানো হলো। চোরা কুঠরি আছে কিনা তাও পরীক্ষা করা হচ্ছে। তল্লাশির কাজে স্কুনারের লোকজন সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করছে, তা না হলে মালিকের দুর্নাম হবে যে! কিন্তু তল্লাশি চালিয়ে টমাস রস বা গেডনের নামগন্ধও পাওয়া গেল না। এখন শুধু দেখা বাকি খোল আর পিপেগুলো।

খোলের ভেতর পাওয়া গেল ছোট ও বড় আকারের অসংখ্য পিপে, কোনটায় ভরা আছে মদ, কোনটায় মিষ্টি পানি। আর আছে নানা রকমের খাবার জিনিস। প্রচুর কয়লাও স্তূপ করে রাখা হয়েছে। এত কয়লা দেখেই বোঝা যায় এব্বা অনেক দূরের পথ পাড়ি দেয়ার প্রস্তুতি নিয়েই রওনা হয়েছে। প্রতিটি পিপের ঢাকনি খুলে পরীক্ষা করা হলো। খোলের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁটিয়ে দেখা হলো। না, কোন গোপন কুঠরির সন্ধান পাওয়া গেল না। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে কাউন্ট দার্তিগাসকে শুধু শুধু সন্দেহ করা হয়েছে। টমাস রস আর গেডনকে অপহরণের পিছনে যে রহস্যই থাকুক, তার সঙ্গে এব্বার কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হচ্ছে না।

সবশেষে এব্বার নৌকাগুলোও পরীক্ষা করা হলো। কিন্তু না, টমাস রস বা গেডনকে কোথাও পাওয়া গেল না। লেফটেন্যান্ট বিদায় নেয়ার সময় ম্লান মুখে বললেন, 'আপনাকে শুধু শুধু বিরক্ত করা হলো। আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

'ছি, না, এর মধ্যে ক্ষমা চাওয়ার কি আছে।' বিনয়ে একেবারে নুয়ে পড়লেন কাউন্ট দার্তিগাস। 'আপনার আর দোষ কি, আপনি তো শুধু কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করেছেন।'

সিঁড়ি বেয়ে নৌকায় নেমে গেলেন লেফটেন্যান্ট তার লোকজনকে নিয়ে। নৌকাটা রওনা হতেই কাউন্ট দার্তিগাস স্পেডকে হুকুম দিলেন, 'পাল তোলো

হে, স্পেড।'

প্রবল বাতাসে আবার ফুলে উঠল পালগুলো। তরতর করে ছুটে চলল এব্বা। হ্যাটেরাস প্রণালী হয়ে খোলা সাগরে পৌঁছাতে মাত্র আধঘণ্টা সময় লাগল।

কিন্তু তারপরই পাল একদম নেতিয়ে পড়ল। বাতাস না থাকলে এব্বা অচল। সমুদ্রে ভাসতে লাগল জাহাজটা।

গলুইয়ের কাছে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে স্পেড। হ্যাটেরাস প্রণালী পেরুবার পর থেকেই সমুদ্রের ওপর তীক্ষ্ণ নজর বোলাচ্ছে সে, কি যেন খুঁজছে বলে মনে হলো, কিংবা যেন আশা করছে পানির তলা থেকে হঠাৎ কিছু একটা ভেসে উঠবে। আচমকা চিৎকার করল সে, 'রশি টানো! পালের রশি টানো!'

মাল্লারা যেন নির্দেশ পাবার অপেক্ষাতেই ছিল, নেতিয়ে পড়া পালগুলো সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে তুলে দেয়া হলো আড়কাঠের ওপর। তবে কি কারণে কে জানে, ব্যবস্থা থাকলেও ওগুলোকে বেঁধে বা ঢেকে রাখা হলো না।

কাউন্ট দার্তিগাস কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলা মুশকিল। তিনি কি পালে বাতাস না লাগা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে চান? সেক্ষেত্রে তো পালগুলো টাঙিয়ে রাখারই কথা, গুটিয়ে ফেলা হলো কেন? কি যেন একটা মতলব আছে তাঁর।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। কারণ এরই মধ্যে পানিতে একটা নৌকা নামানো হয়েছে। এব্বার খানিকটা দূরে, বাম দিকে, পানিতে ভাসছে ছোট একটা বয়া। ঠিক এই রকম একটা বয়াকে ভাসতে দেখা গিয়েছিল নয়জে নদীতেও, স্যানাটরিয়াম হেলথফুল হাউসের কাছে, এব্বার ঠিক পাশেই। নৌকাটা ওই বয়ার কাছে গিয়ে থামল।

লোকজন ধরাধরি করে নৌকায় তুলল বয়াটা। বয়ার সঙ্গে লোহার শিকলটাও উঠে এল। নৌকা আবার ফিরে এল এব্বার গলুইয়ের কাছে।

নৌকা ফিরে আসতেই জাহাজ থেকে একটা গুণটানা মোটা রশি ফেলা হলো নিচে। বয়ার শিকলের সঙ্গে বাঁধা হলো সেটা। তারপর বাঁকা একটা কাঠামোর ওপর তোলা হলো নৌকাটাকে। গুণটানা রশিতে টান পড়ল, সেই সঙ্গে পুবদিকে ছুটল এব্বা। অথচ পালগুলো এখনও গুটানো। জাহাজ শুধু ছুটছে না, বলা যায় দ্রুত ছুটছে, অন্তত ঘণ্টায় দশ নট-এর কম নয় গতি।

রাত নেমে এল। হালকা কুয়াশার ভেতর ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে মার্কিন উপকূলের আলো।

এব্বার রহস্যময় গতির কোন ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না।

# পাঁচ

**[এঞ্জিনিয়ার সিমোন আর্‌ৎ-এর ডায়েরী থেকে]**

এখন আমি কোথায়? ওয়ার্ডের কয়েক পা দূরে হঠাৎ কারা যেন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারপর কি হলো?

দরজার পাশেই ঘর; ডাক্তারকে বিদায় জানিয়ে আবার টমাস রসের কাছে যাচ্ছিলাম। ঠিক এই সময় কারা যেন আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোখে কাপড় বেঁধে দিয়েছিল, তাই কাউকেই চিনতে পারিনি। মুখের ভিতরেও একগাদা কাপড় ঠেসে দিয়েছিল, চিৎকার করে লোকজনও জড়ো করতে পারিনি। তারপর এমন শক্ত করে আমাকে বেঁধে ফেলল যে কোন রকম বাধা দেয়ার সুযোগই পেলাম না। এই অবস্থাতেই কারা যেন আমাকে শূন্যে তুলে কিছুদূর নিয়ে গেল। তারপর আমাকে কোন এক জায়গায় চিৎ করে শুইয়ে রাখল।

কিন্তু কোথায়? কোনখানে?

টমাস রসের কি হলো? তাঁর কোন ক্ষতি হয়নি তো? এখানে সবাই আমাকে গেডন নামেই চেনে। সিমন আর্‌ৎ নামে আমাকে কেউ চেনে না। সবাই জানে আমি টমাস রসের শুশ্রূষাকারী ও রক্ষক। তাঁকে চোখে চোখে রাখাই আমার একমাত্র কাজ। তাহলে সামান্য একজন হাসপাতালের নার্সকে আততায়ীরা পাকড়াও করতে যাবে কি উদ্দেশ্যে?

টমাস রসকে যে গুম করা হয়েছে, সে বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই তাঁর আবিষ্কারের গোপন রহস্য জানার জন্যে কেউ তাঁকে অপহরণ করেছে।

কিন্তু কোথায় এনে রাখল আমাদের? মাথার ভেতর এই প্রশ্নটাই খালি ঘুরপাক খাচ্ছে। ভবিষ্যতে কি ঘটবে সে বিষয়ে কিছু ভাবারও সাহস পাচ্ছি না। কিন্তু যাই ঘটুক না কেন, প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে মনে রাখতে হবে। কে জানে আমি হয়তো কোন একদিন রস-ফুলগুরেটরের গোপন সূত্র জেনে ফেলব। আর যদি কোনদিন ছাড়া পাই, তাহলে সেই গোপন সূত্র আমি জগৎবাসীকে জানিয়ে দেব।

কিন্তু আমি এখন কোথায়? এই প্রশ্নটার উত্তর পাওয়াই এই মুহূর্তে আমার জন্যে সবচেয়ে বেশি জরুরী।

হেলথফুল হাউস থেকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যেখানে আমাকে চিৎ করে শুইয়ে রাখল, সেটা একটা বেঞ্চির মত। বেঞ্চিটা দুলছিল। ওটা ঠিক বেঞ্চিও নয়, কোন নৌকার পাটাতন হবে। তবে নৌকাটা খুব ছোট—সম্ভবত কোন জাহাজের।

আমাকে শোয়াবার সাথে-সাথে পাটাতনটা দুলে উঠল। দুলুনি থামতে না থামতেই আবার দুম করে উঠল পাটাতনটা। আর একজনকে নৌকায় তোলা হলো। টমাস রস নন তো? তাঁর হাত-পা-চোখ বাঁধার দরকার নেই, মুখে কাপড়ের ফালি গোঁজারও দরকার নেই। আমার ধারণা যে ভুল নয়, একটু পরেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কাল রাতে ডাক্তার চলে যাবার আগে রসকে কয়েক ফোঁটা ঈথার দিয়ে গিয়েছিলাম। ওষুধ দেবার সময় খুব ঝাপটাঝাপটি করছিলেন রস, এই সময় সামান্য ঈথার তাঁর জামায় ছিটকে পড়ে। তাই এখানে ঈথারের গন্ধটা পেয়ে আমি মোটেও অবাক হলাম না। টমাস রস এই নৌকাতেই আছেন। আমার পাশেই।

একটা প্রশ্ন কেবল মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। কাউন্ট দার্তিগাস হঠাৎ করে হেলথফুল হাউস দেখতে এলেন কেন? তাঁর সাথে টমাস রসের দেখা না হলে এসব কিছুই ঘটত না। দিব্যি খোশ মেজাজেই ছিলেন তিনি। আবিষ্কারের কথা উঠতেই একেবারে খেপে গেলেন। অধ্যক্ষকে মানা করলাম, তিনি আমার কথা কানেই তুললেন না। আমার কথা শুনলে ডাক্তারকে আসতে হত না, দরজাও বন্ধ থাকত। আর এই শয়তানদের মতলবও ফেঁসে যেত।

রসকে অপহরণ করল কারা? কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্র, নাকি কোন বিশেষ ব্যক্তি? তবে অপহরণ যে-ই করুক না কেন, তাদের কোন লাভ হবে না। কারণ গত পনেরো মাস ধরে রসকে সুস্থ করার জন্যে আমি যে কষ্ট করেছি তা করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। চেষ্টা করতে গিয়ে বরং আরও ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু এই মুহূর্তে সমস্যা টমাস রসকে নিয়ে নয়, আমাকে নিয়ে।

হঠাৎ মস্তবড় একটা ঝাঁকুনি, তারপরই ছপ-ছপ শব্দ। বুঝতে পারলাম নৌকাটা ছাড়ল। কয়েক মিনিটের মধ্যে নৌকা আবার এক ঝাঁকি খেলো। কারা যেন হঠাৎ আমার পা আর ঘাড় চেপে ধরল। আজব ব্যাপার! ওরা আমাকে জাহাজের ডেকে তুলল না, বরং নৌকা থেকে আরও নিচে নামিয়ে দিচ্ছে। আমাকে পানিতে ফেলে দেবে নাকি? আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল। প্রায় জন্তুর মত কাপড় গোঁজা মুখ যতটুকু পারা যায় হাঁ করে শ্বাস নিলাম, জানি একটু পরেই ফুসফুসে আর বাতাস ঢুকবে না।

কিন্তু কই, না তো! আমাকে তো পানিতে ফেলল না, বরং শুইয়ে দিল

কনকনে ঠাণ্ডা নিরেট মেঝের ওপর। আরে! আমার বাঁধনও দেখছি খুলে দিয়েছে! আশপাশ থেকে পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। একটু পরেই দরজা বন্ধ হওয়ার ধাতব শব্দ শুনতে পেলাম।

শেষকালে এ কোথায় আসলাম আমি! মুখ থেকে কাপড়ের পুঁটলিটা বের করলাম, চোখের পট্টিটাও খুলে ফেললাম।

অন্ধকার! চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। একবারে বন্ধ ঘরেও একটু-না-একটু আলো চোখে ধরা পড়ে। কিন্তু এখানে তো তাও নেই।

গলা ফাটিয়ে কয়েকবার চিৎকার দিলাম। কোন সাড়া শব্দ নেই। এমনকি কোন প্রতিধ্বনিও শুনতে পেলাম না।

প্রশ্বাসের সাথে যে বাতাস টানছি সেটাও গরম। এভাবে কিছুক্ষণ চললেই তো ফুসফুস জখম হয়ে যাবে।

দু'হাত বাড়িয়ে চারদিকে হাতড়াতে শুরু করলাম। বুঝতে পারলাম, লোহা দিয়ে তৈরি একটা কামরায় রেখেছে আমাকে। লোহার পাতগুলো অসংখ্য নাট-বল্টু দিয়ে আঁটা, ঠিক এয়ার টাইট ঘরে যেমন দেখা যায়।

শুধু একদিকে দরজার কাঠামোর মত কি যেন একটা রয়েছে। দেয়ালের ওপর দিয়ে কব্জাগুলো অনেকদূর পর্যন্ত চলে গেছে। পাল্লাটা ভেতর দিক থেকে খোলে। এই পথ দিয়েই আমাকে এখানে আনা হয়েছে।

দরজার কাছে এসে কান পেতে রইলাম। চারদিকে কোন টুঁ শব্দ নেই। সাধারণত জাহাজের ডেকের ওপর থেকে যে রকম শব্দ ভেসে আসে, এখানে তাও নেই। নয়জে নদীর মোহনার পানি খুব চঞ্চল। যেখানে ঢেউয়ের দোলায় বড়-বড় জাহাজও ঝাঁকুনি খায়, সেখানে আমি কোন দুলুনিও টের পাচ্ছি না।

তবে কি আমি কোন জাহাজে নেই? তীর থেকে নৌকা করে জাহাজে আসতে সময় লেগেছে মিনিট খানেক। সেই থেকে এখন পর্যন্ত আমি নয়জেই আছি, এটা একেবারেই অসম্ভব।

আবার এমনও তো হতে পারে হেলথফুল হাউসের কাছে কোন জাহাজই ছিল না, নৌকাটা হয়তো আবার ডাঙাতেই এসে ভিড়েছিল। সেক্ষেত্রে আমি নিশ্চয়ই কোন মাটির তলার ঘরে বন্দী হয়ে আছি। কোন দুলুনি টের না পাওয়ার এটাই বোধহয় কারণ। কিন্তু মাটির নিচে লোহার দেয়াল এল কি করে? তাছাড়া তীব্র নোনা গন্ধই বা কোথা থেকে আসছে! এই গন্ধ চিনতে কখনও ভুল হয় না। সাধারণত জাহাজগুলোতেই এরকম নোনা আমিষ আমিষ গন্ধ থাকে।

বন্দী হবার পর মনে হয় পনেরো মিনিট কেটেছে, কিন্তু তাতেই মনে হচ্ছে কতকাল! এখন বোধহয় মধ্যরাত। সকাল পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে। ভাগ্যিস সন্ধে নাগাদ ডিনারটা সেরে নিয়েছিলাম। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই

করার নেই। বলা যায় না, কোন ছোটখাট আওয়াজ কানে আসতেও পারে। জাহাজ যদি নোঙর ফেলেও থাকে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে রওনা দিতে হবে। তা-না হলে আমাদেরকে এভাবে গুম করে রাখার কোন অর্থ হয় না।

না, আমার ধারণা ভুল নয়, একটু পরেই খুব হালকা একটা দুলুনি টের পেলাম। কিন্তু দুলুনিটা এতই কম যে প্রায় ধরাই যায় না। এতটুকু কাঁপুনি নেই, ঝাঁকুনি নেই, শুধু একটু দোলা লাগল। জাহাজ যদি পানিতে থাকে তাহলে এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার।

না, মাথা ঠাণ্ডা করে একটু ভেবে দেখা যাক। আমি নয়জের মোহনায় নোঙর করা অনেকগুলো জাহাজের একটাতেই আছি। জাহাজটা বাষ্পচালিত এঞ্জিনের বা শুধু পালতোলাও হতে পারে। নৌকা থেকে আমাকে জাহাজের ওপরে তোলা হয়নি, বরং আরও নিচে, সম্ভবত জাহাজের খোলে রাখা হয়েছে। অবশ্য জাহাজের খোলেই থাকি বা অন্য কোথাও, এটা নিশ্চিত যে জিনিসটা ভাসে আর নড়ে।

মার্কিন উপকূলের সমুদ্র থেকে দূরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি অথবা টমাস রস কেউই মুক্ত হতে পারব না। এটা হয়তো একটা পালতোলা জাহাজ। তাই বাতাস না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করছে। এটুকু নিশ্চিত করে বলা যায়, এটা বাষ্পচালিত জাহাজ নয়। কারণ বাষ্প বা এঞ্জিনচালিত জাহাজে সব সময় তেলকালির গন্ধ থাকে। সেরকম কোন গন্ধ আমি পাচ্ছি না।

আসলে ওদের উদ্দেশ্য ছিল টমাস রসকে নিয়ে আসা। আমি কোথাকার কোন গেডন, আমাকে নিয়ে এসে ওদের কোন লাভ নেই। সে সময় আমি ওয়ার্ডে ছিলাম বলেই ওদের খপ্পরে পড়েছি।

এই অনুমানই যদি সঠিক হয়, তবে কিছুতেই ওদের কাছে আমার আসল পরিচয় ফাঁস করা যাবে না।

তবে একটা বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। জাহাজ এখন দ্রুতবেগে ছুটছে। আগেই বুঝতে পেরেছি এটা বাষ্পচালিত জাহাজ নয়। কিন্তু আবার পালতোলা জাহাজও তো না! পালতোলা হলে এত জোরে চলতে পারত না। তাহলে নিশ্চয়ই কোন শক্তিশালী এঞ্জিনের সাহায্যে চলছে। কিন্তু চাকা ঘোরাবার কলকব্জা চললে যে আওয়াজ হয়, তা শুনতে পাচ্ছি না কেন? অবাক কাণ্ড তো! জাহাজটা তীব্র গতিতে ছুটছে, এঞ্জিনের শক্তিটা সরাসরি চাকায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে, যেন কোন পিস্টনের সাহায্য ছাড়াই। আমার ধারণা জাহাজটা বিশেষ কোন এঞ্জিনের সাহায্যে চলছে।

সেই বিশেষ এঞ্জিনটা টারবাইনও হতে পারে, যা নিয়ে সম্প্রতি অনেক হৈ-চৈ হয়েছে। প্রপেলারের বদলে বসবে টারবাইন, এমন কথাই বলেছিলেন

বৈজ্ঞানিকরা। এই টারবাইন জলের বাধাকে কাজে লাগিয়ে প্রচণ্ড গতিতে জাহাজকে ঠেলে নিয়ে যাবে।

যাক, এসব ভেবে এখন আর কোন লাভ নেই। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা, তারপরেই এই তীব্র গতির রহস্য আমি জানতে পারব।

আরে! ওই তো কার পায়ের শব্দ! লোহার দেয়ালের ওপাশে এসে থামল আওয়াজটা। কারা যেন চাপা গলায় কথা বলছে। দুর্বোধ্য ভাষা, কিছুই বুঝতে পারলাম না।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলাম। হাত দুটো অবশ হয়ে এল লোহার দেয়ালে ঘুসি মারতে মারতে। কিন্তু কোথাও থেকে কোন সাড়া শব্দ পেলাম না।

কতক্ষণ এই বন্দী অবস্থায় আছি আমি? জাহাজটা প্রথম যখন নড়েছে, তখন থেকে কমপক্ষে চার ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। কিন্তু জাহাজ যদি চার-পাঁচ ঘণ্টা একনাগাড়ে ছোটে, তাহলে তো এতক্ষণে পামলিকা সাউন্ড পেরিয়ে মহাসমুদ্রে এসে পড়ার কথা। কিন্তু সমুদ্রের যে উত্তাল ঢেউ, ঝাঁকুনি, সে সব তো কিছুই টের পাচ্ছি না। অবাক কাণ্ড! আমি কি তাহলে চলন্ত জাহাজের খোলে বন্দী নই?

অনেক চেষ্টা করেও আর সজাগ থাকতে পারছি না। বুঝতে পারছি চেতনাও ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি বলতে পারব না। তবে আগের মত শ্বাস নিতে আর কষ্ট হচ্ছে না। যখন ঘুমিয়েছিলাম তখন নিশ্চয়ই এই ঘরে কেউ ঢুকেছিল। বাইরের টাটকা বাতাস ঘরে ঢোকায় তাই আগের মত আর কষ্ট হচ্ছে না।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বিয়ার ভর্তি একটা পাত্র পেলাম, ঢকঢক করে প্রায় সবটুকু বিয়ার খেয়ে ফেললাম।

যাক, এতক্ষণে তৃষ্ণা মিটল। খাবারও নিশ্চয়ই আশেপাশে কোথাও রেখে গেছে।

আবার হাতড়াতে শুরু করলাম। এককোণে একটা ঝুড়ির মধ্যে ঠাণ্ডা শুকনো মাংস আর একটুকরো রুটি পেলাম।

জাহাজ এখন আর চলছে না। তাই এতটুকু নড়াচড়া নেই। রাতে আবার কেউ আসবে কি না জানি না। তবে যখনই আসুক, এবার তাকে ছাড়ব না। ঘুমের ভান করে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকব। তারপর নাগালের মধ্যে এলেই খপ করে ধরব। তখন দেখব আমার কথার জবাব না দিয়ে কোথায় যায়।

## ছয়

খোলা আকাশের নিচে আছি এখন, বুক ভরে টেনে নিচ্ছি ঠাণ্ডা ও তাজা বাতাস। সেই দম বন্ধ করা লোহার ঘরটায় এখন আর আমি নেই। আমাকে নিয়ে আসা হয়েছে জাহাজের ডেকে।

ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! পশ্চিম দিকে, যেখানে হাজার হাজার মাইল জুড়ে থাকার কথা উত্তর আমেরিকার তীর, সেখানে ডাঙার চিহ্ন মাত্র নেই।

এখানে ব্যাখ্যা করা দরকার কাল রাতে কি ঘটেছিল।

প্ল্যান অনুসারে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে ছিলাম। অনেক কষ্ট করে চোখ থেকে ঘুম তাড়াচ্ছিলাম, আর অপেক্ষা করছিলাম কখন ঘরে লোক আসে। সারাটা দিন কেটে গেল অথচ কারও পাত্তাই নেই। খিদেয় পেটে মোচড় দিচ্ছে। ভাগ্য ভাল সামান্য বিয়ার ছিল, তাই পিপাসায় অতটা কষ্ট পেলাম না।

সেই যখন ঘুম ভেঙেছিল, তারপরই মৃদু কম্পন অনুভব করে বুঝতে পেরেছিলাম সারারাত স্থির থাকার পর জলযানটি আবার চলতে শুরু করেছে।

ঠিক ছটার সময় লোহার দরজার ওপাশে পায়ের শব্দ পেলাম। সম্ভবত কেউ আসছে। পরক্ষণেই তালা খোলার আওয়াজ শুনলাম। দরজার কবাট খুলে গেল। লণ্ঠনের আলোয় দেখতে পেলাম দু'জন ষণ্ডামার্কা লোক দাঁড়িয়ে। কিন্তু ভাল করে মুখ দেখার আগেই আমাকে চেপে ধরে একটা কাপড় দিয়ে মাথাটা ঢেকে দিল। তারপর আর কিছুই দেখতে পেলাম না।

তারপরেও সহজে ছেড়ে দিইনি, ধস্তাধস্তি করেছি। কিন্তু লোক দুটোর গায়ে অসম্ভব জোর, কঠিন হাতে তারা আমাকে টেনে নিয়ে চলল। নিজেদের মধ্যে তারা কি এক দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলতে লাগল, যার বিন্দুবিসর্গ কিছুই আমি বুঝতে পারলাম না।

লোক দুটো আমাকে ছেড়ে দিতেই ঝট করে মাথার কাপড় ফেলে দিলাম। তখনি বুঝতে পারলাম আমি একটা স্কুনারের ডেকে দাঁড়িয়ে আছি। অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে স্কুনার। পিছনের পানিতে তৈরি হচ্ছে সাদা ফেনা।

অনেকক্ষণ ধরে অন্ধকারে ছিলাম, হঠাৎ আলোতে এসে চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি একটা মাস্তুল ধরে সামলে নিলাম, তা না হলে পড়েই যেতাম।

ডেকে দশ-বারোজন লোক ব্যস্ত হয়ে কাজ করছিল। লোকগুলো কোন্ দেশের তা বুঝতে পারিনি। তারা আমার দিকে ফিরেও তাকাল না, নিজেদের কাজ নিয়েই ব্যস্ত।

স্কুনারটা বোধ হয় আড়াইশো টনের, বেশ মজবুত। এটার নাম কি? এক লোক গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে অনবরত হুইল ঘুরিয়ে সাগরদোলা কমিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। গলুইয়ের আশেপাশে নিশ্চয়ই কোন ফলকে জাহাজের নাম লেখা আছে। নাম জানার জন্যে ওদিকে এগিয়ে গেলাম। একজন মাল্লার কাছ থেকে জাহাজের নাম জানতে চাইলাম। কোন জবাব না দিয়ে আমার দিকে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। লোকটা আসলে আমার কথা বুঝতেই পারেনি। জানতে চাইলাম, 'ক্যাপটেন কোথায়?'

মাল্লাটা এবারও কোন জবাব দিল না।

হুইলের গায়ে একটা ঘণ্টা ঝোলানো। ওটায় হয়তো জাহাজের নাম লেখা থাকতে পারে। কিন্তু না! ওখানেও কিছু লেখা নেই।

অদ্ভুত ব্যাপার তো! এই জাহাজের কোন নাম নেই নাকি? টমাস রস কোথায়? ওনাকে তো দেখতে পাচ্ছি না। তিনি যে এই জাহাজেই আছেন সেই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তাঁকে সম্ভবত কোন ঘরে আটকে রাখা হয়েছে।

আরে! অবাক কাণ্ড! জাহাজের পালগুলো তো দেখছি মাস্তুলে জড়ানো। তেমন বাতাসও নেই, অথচ জাহাজটা কী সুন্দর স্বচ্ছন্দে বেশ জোরেই ছুটে চলছে। এটা কি তাহলে বাষ্পে চলে? কিন্তু তাহলে ধোঁয়া বের হবার চিমনি কোথায়? তাহলে নিশ্চয়ই বিদ্যুৎ শক্তি কাজে লাগিয়েছে। জাহাজের কোথাও কোন জোরাল ব্যাটারি আছে, তা না হলে এত দ্রুত জাহাজ চলবে কি করে?

ছুটে রেলিঙের কাছে গেলাম। হুইলের কাছে যে লোকটা ছিল, সে সকৌতুকে আমার কাণ্ড দেখছে। আমি ঝুঁকে নিচে তাকালাম।

কিছুই দেখতে পেলাম না। কোন প্রপেলারের তীব্র ঘুরুনি নেই, বাতাসও নেই, অথচ জাহাজ তরতর করে ছুটে যাচ্ছে। প্রশ্ন হলো, এই প্রচণ্ড শক্তির উৎস কি?

জাহাজের সামনের দিকে কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের নির্দেশ মতই হালের লোকটা হুইল ঘোরাচ্ছে। এ তো এক অদ্ভুত রহস্য!

যে করেই হোক এই রহস্যের জট আমাকে খুলতেই হবে। সামনে যেতেই একজনের সাথে দেখা হলো। একটা বুরুজের গায়ে হেলান দিয়ে সে আমাকে লক্ষ করছিল। দেখার সাথে সাথে লোকটাকে চিনে ফেললাম। হেলথফুল হাউসে কাউন্ট দার্তিগাসের সাথে এই লোকটাও এসেছিল।

তাহলে কাউন্ট দার্তিগাসই টমাস রসকে এখানে এনেছেন। আর এটা হলো

তাঁর জাহাজ এব্বা।

হাবভাব দেখে এই লোকটাকেই জাহাজের ক্যাপটেন বলে মনে হলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'চিনতে পারছেন, ক্যাপটেন? হেলথফুল হাউসে আমাদের দেখা হয়েছিল।'

কোন উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

'আমার নাম গেডন। টমাস রসের দেখাশোনা করি। আমাকে এভাবে ধরে এনেছেন কেন, জানতে পারি?'

ক্যাপটেন আমার দিকে না তাকিয়ে কয়েকজন মাল্লাকে কি যেন ইশারা করল। তখুনি তারা আমাকে ডেক থেকে নিচে নামিয়ে আনল, তারপর সরু প্যাসেজ দিয়ে হাঁটিয়ে এনে ঢুকিয়ে দিল একটা কামরায়।

ঘরটায় একটি মাত্র পোর্টহোল। আর আছে ঝুলন্ত বিছানা, টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, কাবার্ড ও আরাম কেদারা। সব কিছু নতুন ও খুব ঝকঝকে। টেবিলে খাবার সাজানো আছে। সাথে সাথে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর একজন লোক আরও কিছু খাবার নিয়ে এল। তার সাথে কথা বলার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। লোকটা নিগ্রো, সে-ও হয়তো আমার ভাষা বুঝতে পারেনি।

খাবার দিয়ে লোকটা দরজা বন্ধ করে চলে গেল। খেতে বসে আমি অনেক কথাই ভাবতে লাগলাম। কাউন্ট দার্তিগাস আসলে কে? তিনি কোথাকার লোক? নাম স্প্যানিশ হলেও ধরনধারণ কিন্তু এশিয়ানদের মত। টমাস রসকে অপহরণ করে তাঁর লাভ কি? নিশ্চয়ই রস ফুলগুরেটরের গোপন রহস্য জানাটাই তাঁর উদ্দেশ্য।

সারাদিন এই ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকলাম। এব্বা নিঃশব্দে অথচ বেশ দ্রুতগতিতে সারাদিন ছুটে চলেছে। এখনও আমার কাছে পরিষ্কার না, জাহাজটা এই বিপুল পরিমাণ শক্তি কোথা থেকে পাচ্ছে।

এই সব ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল একেবারে সেই ভোরে। কি মনে হলো, দরজায় গিয়ে একটা ধাক্কা দিলাম। দড়াম করে কবাটটা খুলে গেল। আরে! দরজা তো খোলাই ছিল দেখছি! বাইরে বেরিয়ে এলাম। লোহার সিঁড়ি বেয়ে তিন লাফে ওপরে উঠে সোজা ডেকে চলে এলাম।

মাল্লারা দেখি ডেক ধুচ্ছে। দুজন হোমরা-চোমরা লোক গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে একজন ক্যাপটেন, অন্যজনকে চিনি না। বয়স পঞ্চাশ হবে। চুলে ও দাড়িতে রূপালি ছোপ, তবে সব দাড়ি বা চুল পেকে যায়নি। চেহারা দেখে লোকটাকে গ্রীক বলে মনে হলো। তাকে যখন ক্যাপটেন সেরকো বলে ডাক দিল, তখন বুঝলাম আমার ধারণা ভুল না। সেরকো জাহাজের এঞ্জিনিয়ার আর স্পেড জাহাজের ক্যাপটেন।

ইতালিয়ান স্পাদা থেকে সম্ভবত স্পেড শব্দটা এসেছে। এই জাহাজে তাহলে গ্রীক ও ইতালিয়ান আছে। আর মাল্লারা এসেছে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে। জাহাজের নাম 'এব্বা'। নামটা এসেছে নরওয়ে থেকে। আর আছে কাউন্ট দার্তিগাস। তাঁর নাম স্প্যানিশ হলেও, আচার-আচরণ এশিয়ান লোকদের মত। কে জানে আসলে তিনি কোথাকার লোক!

এঞ্জিনিয়ার আর ক্যাপটেন নিচু গলায় কথা বলছে।

ডেকহাউসের কাছেই টমাস রসকে দেখতে পেলাম। নির্জন সমুদ্রের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। রসের পাশে দু'জন মাল্লা দাঁড়িয়ে। এক মুহূর্তের জন্যও তারা রসকে চোখের আড়াল করছে না। রাগী মানুষ, কখন কী করে বসেন।

জানি না টমাস রসের সাথে আমাকে দেখা করতে দেয়া হবে কিনা। আমি তাঁর দিকে এগোলাম। স্পেড আর সেরকো আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল বটে, তবে বাধা দেয়ার কোন চেষ্টা করল না। টমাস রস আমাকে দেখেননি। আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। রস আমাকে চিনতে পেরেছেন বলে মনে হলো না। আগের মতই তাকিয়ে আছেন, সরাসরি দিগন্তে। মুখ দেখে মনে হলো এই ঠাণ্ডা বাতাস তাঁর ভালই লাগছে।

'টমাস রস?' আমি ডাকলাম।

হঠাৎ করে রস যেন চৈতন্য ফিরে পেলেন। একবার আমার দিকে তাকিয়ে পরক্ষণেই চোখ ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর হাতটা ধরে আস্তে করে চাপ দিলাম। আমার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিলেন রস, এগিয়ে গেলেন গলুইয়ের দিকে। ওদিকে সেরকো ও স্পেড দাঁড়িয়ে আছে।

জ্বলজ্বলে চোখে তিনি তাকালেন গুটানো পালের দিকে। স্কুনারের রহস্যময় গতি তাঁকেও অবাক করেছে। একটু পরেই জাহাজের পাশে তাকালেন তিনি। রাজহাঁসের মত পানি কেটে অত্যন্ত সাবলীল গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে স্কুনার। দেখেই রস একটু পিছিয়ে এলেন। বাষ্পচালিত জাহাজ হলে যেখানে চিমনি থাকার কথা সেখানে ছুটে গেলেন।

কাল সারাদিন ভেবেও যে রহস্যের কোন কূল-কিনারা করতে পারিনি, রসের মগজেও সেই একই রহস্য জট পাকাচ্ছে। রস ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন গলুইয়ের কাছে, দেখতে চান প্রপেলার আছে কিনা।

বুরুজের ওপর ঝুঁকে পড়লেন রস। এমনভাবে ঝুঁকে পড়লেন, সেরকো আর স্পেড ভয় পেয়ে ছুটে গিয়ে দু'দিক থেকে তাঁকে চেপে ধরল। আমারও ভয় লেগেছিল। রাগী মানুষ, স্কুনারের গতি রহস্য ভেদ করার জন্যে পানিতেই না ঝাঁপিয়ে পড়েন।

রস ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। লক্ষণটা আমার খুব চেনা। আবার একটা পাগলামির পূর্ব মুহূর্ত। এখন সাবধান না হলে তাঁকে সামলানো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। হঠাৎ তিনি মাস্তুলটা আঁকড়ে ধরে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকাতে শুরু করলেন।

ক্যাপটেনের নির্দেশে দু'জন মাল্লা তাঁর দিকে ছুটে গেল। তারপর কিছুক্ষণ টানা-হ্যাঁচড়া চলল। জোরজার করে টমাস রসকে সরিয়ে আনল তারা।

এখুনি টমাস রসকে ঘরে নিয়ে যাওয়া দরকার। ঘুম পাড়াতে হবে তাঁকে। না ঘুমালে তাঁর উত্তেজনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে। পাগলামির একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে যাবেন তিনি।

কি করব ভাবছি, এমন সময় কার যেন রাশভারী গম্ভীর গলা কানে এল।

ফিরে তাকাতেই চিনতে পারলাম তাঁকে, কাউন্ট দার্তিগাস।

সাথে সাথে তাঁর কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, 'কোন অধিকারে আমাদেরকে এখানে ধরে এনেছেন?'

'শক্তিমানের অধিকারে,' বলেই গলুইয়ের কাছে চলে গেলেন কাউন্ট। আর মাল্লারা টমাস রসকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেল।

## সাত

আমাকে সবচেয়ে আগে জানতে হবে স্কুনার এব্বা যাচ্ছে কোথায়। আর এই কাউন্ট দার্তিগাসই বা কে। মানুষটা অত্যন্ত রহস্যময়। অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলেন। উচ্চারণ অনেকটা এশিয়ানদের মত। গায়ের রঙ কালো, চুলটাও একেবারে কুচকুচে কালো। চোখের তারা দুটি নিষ্কম্প, তাকালে মনে হয় ভেতরের সবকিছু যেন জেনে নিচ্ছেন। যাই হোক, সব মিলিয়ে তাঁকে এশিয়ার পুব প্রান্তের মানুষ বলেই মনে হয়।

টমাস রস আর আমাকে যখন তিনি অপহরণ করেছেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য খুব একটা মহৎ নয়। হয়তো কোন বিদেশী রাষ্ট্রের হয়ে এই কুকর্মটি করেছেন তিনি।

জাহাজের সামনে যেতে চাইলেই মাল্লারা আপত্তি জানাচ্ছে। তাছাড়া বাকি সব জায়গাতেই নির্বিঘ্নে যেতে পারি। সামনে গেলেই মাল্লারা ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলছে। 'সরে যাও। কাজের সময় ঝামেলা কোরো না।'

কাউন্ট দিনের মধ্যে কয়েকবার ডেকে উঠলেন। ক্যাপটেনের সাথে সেই

দুর্বোধ্য ভাষায় অনেক কথাই বললেন, যার বিন্দুবিসর্গ কিছুই আমি বুঝতে পারলাম না।

টমাস রসকে সারাদিনেও আর দেখতে পেলাম না। কালকের ঘটনার পর এখনও বোধহয় সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি।

বিকালের দিকে কাউন্ট আমাকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'টমাস রসের পাগলামি বাড়াবাড়ি পর্যায়ে কতক্ষণ থাকে?'

'প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা।'

'ওষুধ কি?'

'ওষুধ একটাই—ঘুম। ভাল ঘুম হলে অনেকটাই শান্ত হয়ে আসেন। ঘুম থেকে উঠে অবশ্য কিছুক্ষণ ঝিম মেরে চুপচাপ বসে থাকেন।'

'গেডন, যদি দরকার হয় তুমি আগের মতই টমাস রসের দেখাশোনা করবে।'

'দেখাশোনা করব?'

'হ্যাঁ, অন্তত যতক্ষণ না ডাঙায় পৌঁছাচ্ছি।'

'ডাঙায় কোথায় পৌঁছাচ্ছি?'

'সেটা কাল বিকালেই দেখতে পাবে।'

'কিন্তু কোথায় যাচ্ছি তা জানার অধিকার আমার আছে।'

'মোটেই না। এমনকি আমি না চাইলে আমার সাথে কথা বলার অধিকারও তোমার নেই।'

'আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

'যত খুশি প্রতিবাদ জানাও, আমি শুনতে পাচ্ছি না,' বলেই চলে গেলেন কাউন্ট।

পিছন থেকে সেরকো বলল, 'মিস্টার গেডন, আমি কিন্তু এই অবস্থায় চুপ করে থাকতাম।'

চারটের সময় মাইল ছয়েক দূরে একটা মার্কিন যুদ্ধজাহাজ দেখা গেল। এই অবস্থায় তোপ দেগে অভিবাদন জানায় অন্যান্য জাহাজ। কিন্তু এব্বা সে সব কিছুই করল না। গলুইয়ের কাছে নোঙর তোলার ক্যাপস্টান, আর কাছাকাছি রয়েছে ছোট একটা যন্ত্র বা কল, এটা দিয়েই মনে হয় সঙ্কেত দেয়া হয়, অনেকটা টেলিগ্রাফের মত দেখতে। সামনে বোতাম বসানো। মার্কিন যুদ্ধ জাহাজটা দেখেই সেখানে গিয়ে একটা বোতামে চাপ দিলেন ক্যাপটেন। সাথে সাথে দক্ষিণ-পুবে এব্বার মুখ ঘুরে গেল। পালগুলো নামিয়ে নিল মাঝিরা।

সন্ধে ছ'টার সময় দূরে আরেকটা জাহাজ দেখা গেল। এব্বা এবার এটাকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করল না। বরং সরাসরি ওদিকেই মুখ ঘুরিয়ে নিল।

বাতাস ছিল না বলে দূরের জাহাজটা পাল গুটাচ্ছিল। কিন্তু এব্বার তো সে সব কোন ঝামেলা নেই। বাতাস নেই অথচ অনায়াসে সামনের জাহাজের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

রাতের অন্ধকার গাঢ় হতেই দুটো জাহাজের দূরত্ব মাত্র মাইল দেড়েক দাঁড়াল। কোথায় ছিল কে জানে, হঠাৎ এসে রীতিমত কঠিন সুরে আমাকে আমার কামরায় ফিরে যাবার নির্দেশ দিল ক্যাপটেন স্পেড।

ভঙ্গিটা অপমানকর হলেও, মেনে না নিয়ে উপায় নেই আমার। অশুভ ও ক্ষতিকর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, এরকম একটা অনুভূতি নিয়ে নিজের কামরায় ফিরে এলাম। দেখলাম টেবিলে আগেই খাবার দেয়া হয়েছে। সে-সব পড়ে থাকল, চুপচাপ বিছানায় উঠে শুয়ে পড়লাম।

মনের ভেতর ঝড় বইছে। দু'চোখ এক করতে পারলাম না। এভাবে দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেল। বাইরে পানির বিরতিহীন আওয়াজ পাচ্ছি, কিন্তু আর কোন শব্দ নেই। হাতঘড়িতে সময় এখন দশটা। ভেবে কূল পাচ্ছি না–এব্বা থামল কেন? ক্যাপটেন স্পেড আমাকে যখন নিচে নামার নির্দেশ দিল তখন তো স্কুনারের চারপাশে কোথাও ডাঙার চিহ্ন দেখিনি। তাহলে? সওদাগরি জাহাজটা ইতিমধ্যে হয়তো এব্বার দু'চারশো হাতের মধ্যে চলে এসেছে।

আরে! এটাই তো পালাবার সবচেয়ে ভাল সুযোগ। ডেকে একবার পৌঁছাতে পারলেই তো হয়।

বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম আমি। দরজা ঠেলতেই বুঝতে পারলাম বাইরে থেকে বন্ধ।

হতাশ হয়ে আবার বিছানায় ফিরে এলাম। খুব ক্লান্ত লাগছে। কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম বলতে পারব না।

শোরগোলের আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল। এব্বায় তো এমন আওয়াজ কখনও শুনিনি। পোর্টহোল দিয়ে তাকিয়ে দেখি সকাল হচ্ছে–এখন মাঝ সাগরে থেমে আছে এব্বা। সাড়ে-চারটে বাজে ঘড়িতে।

মাঝিরা ডেকের উপর ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে। আমার কামরার নিচেই গুদাম ঘর, সেখান থেকেও আওয়াজ আসছে।

জাহাজের পাশেই পানির শব্দ শুনলাম। নৌকার শব্দ নাকি? মনে হলো মালপত্র নামাচ্ছে।

কাউন্ট দার্তিগাস বলেছিলেন গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে বিকেল হয়ে যাবে। এত আগে তো পৌঁছাবার কথা নয়। স্কুনার যে সারা রাত চলেনি, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

হঠাৎ দরজায় চাবির শব্দ। সাথে সাথে বিছানা ছেড়ে উঠে ধাক্কা দিলাম

দরজায়। খুলে গেল কবাট। এক দৌড়ে ডেকে উঠে এলাম। দেখি চারদিকে মালপত্র সাজানো হচ্ছে। তারমানে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে আর বেশি দেরি নেই। আশেপাশে কোথাও কাউন্ট দার্তিগাসকে দেখতে পেলাম না।

ক্যাপটেন স্পেড একটা বোতামে চাপ দিল, সঙ্গে সঙ্গে এব্বা দুলে উঠল। পুবদিকে এগোতে শুরু করল আবার, যদিও পাল গোটানো।

দুই এক ঘণ্টা পর কাউন্ট দার্তিগাসকে ডেকে দেখতে পেলাম। একটু পর সেরকো আর ক্যাপটেনও তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। তিনজনেই চোখে দূরবীন লাগিয়ে পুব দিকটা দেখতে লাগল।

বেলা সাড়ে তিনটের দিকে ডাঙার কালো রেখা দেখা গেল। একটা পাহাড় ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার চূড়া থেকে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

আগ্নেয়গিরি? এখানে?

# আট

**আটলান্টিকের এদিকে কোথায় আসতে পারে স্কুনার এব্বা? পামলিকা সাউন্ড থেকে বের হবার পর স্কুনার যে পথ ধরে এতদূর এসেছে, তাতে ধরে নিতে হয় এই জায়গাটা বারমুডা ছাড়া আর কিছুই নয়। পুব-দক্ষিণপুবে কমপক্ষে পাঁচ-ছ'শো মাইল পেরিয়েছে জাহাজটা।**

স্কুনারের গতি কিন্তু আগের মতই। অবশ্য কাউন্ট দার্তিগাস আমাকে যা বলেছিলেন, তাতে তো মনে হয় এটাই আমাদের গন্তব্য। মাল্লারা সবাই ডেকে দাঁড়িয়ে তৈরি হয়ে আছে। এফরনডাটও নোঙর ফেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

টমাস রসের দেহরক্ষী গেডন একজন সাধারণ মানুষ। কিন্তু কাউন্ট দার্তিগাস যেভাবে আমার উপর নজর রাখছেন, সেটা সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে কাউন্ট এখনও বুঝতে পারেননি আমার আসল পরিচয় কি। এখন থেকে আমাকে আরও সাবধান হতে হবে। আমি কি ভাবছি না ভাবছি সেটা ওদেরকে কিছুতেই বুঝতে দেয়া যাবে না।

রহস্যের জাল একটু একটু করে ছিঁড়তে শুরু করেছে। এব্বা যতই সামনে যাচ্ছে, আকাশের গায়ে ততই স্পষ্টভাবে একটা পাহাড়ের আকৃতি ফুটে উঠছে। আমি মনে মনে একটু আশ্বস্ত হলাম। কোথাও তো অন্তত পৌঁছাচ্ছি।

পাহাড়টার গড়ন অদ্ভুত। ঠিক যেন একটা উল্টো করা পেয়ালা। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে পাহাড়ের চূড়া থেকে। চূড়াটা তিনশো ফুটেরও বেশি উঁচু

হবে। পশ্চিম দিক থেকে যেকোন জাহাজ দ্বীপটাকে দেখেই চিনতে পারে, কারণ প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া একটা পাথুরে খিলান আছে সেদিকে, যেটাকে একটা পেয়ালার হাতলের মত দেখায়। আগেই বলা হয়েছে, দূর থেকে তাকালে দ্বীপটাকে দেখতে লাগে ঠিক ওল্টানো একটা পেয়ালা। তাই এই দ্বীপের নাম দেয়া হয়েছে 'ব্যাকাপ'।

দ্বীপটাকে চিনতে আমার মোটেও ভুল হয়নি। বারমুডা দ্বীপপুঞ্জের গা ঘেঁষা এই দ্বীপের পাথুরে জমির ওপর আমি নিজের পায়ে হেঁটেছি। কয়েক বছর আগে এদিকে একবার এসেছিলাম। কেন এসেছিলাম সেটা এখানে বলে রাখি।

উত্তর ক্যারলিনের প্রায় দুশো মাইল দূরে ৬৪° মধ্যরেখা আর ৩২° দ্রাঘিমায় বারমুডা দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। ছোট বড় কমপক্ষে দুশোর মত দ্বীপ নিয়ে এই দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। বারমুডা দ্বীপপুঞ্জ ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইংরেজদের দখলে ছিল। শুধু যে কেবল নিজেদের সম্পত্তি বলে ইংরেজরা এখানে ঘাঁটি গেড়েছিল, তা নয়, যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি একটা নৌঘাঁটি হিসাবেও তার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। সেইন্ট জর্জ হলো দ্বীপপুঞ্জের রাজধানীর নাম। ওই নামেরই একটা দ্বীপে সেটা অবস্থিত। বারমুডার আবহাওয়া এমনিতে মৃদু হলেও, শীতকালে আটলান্টিকের বিশাল সব ঝড় এই দ্বীপের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। তখন এদিকে জাহাজের আসা-যাওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে। দ্বীপগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য আছে, এখানে কোন স্রোতস্বিনী বা নদী নেই, কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি হয় বলে এখানকার বাসিন্দারা বিশাল সব জলাধার তৈরি করে পানির অভাব মিটিয়েছে। ওগুলো যিনি বানিয়েছেন, তাঁর কল্পনাশক্তি ও উদ্ভাবনীশক্তি সত্যি প্রশংসার যোগ্য। আর আমি এই জলাধারগুলো স্বচক্ষে দেখার জন্যেই এখানে এসেছিলাম।

আমি বারমুডায় থাকার সময় অদ্ভুত কিছু ভৌগলিক ঘটনা ঘটে। যার কারণে ওখানকার বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে ভয়ে পালিয়ে যায়। এরা ব্যাকাপের পুব দিকের উপকূলে পঞ্চাশ বছর ধরে বসবাস করছে। বাড়িঘর বানিয়েছে পাথর কিংবা কাঠ দিয়ে। বারমুডা দ্বীপপুঞ্জের সাথে যোগাযোগও ছিল খুব ভাল। বড় বড় মজবুত নৌকা ছিল তাদের। সেটা করেই মাছ চালান দিত আর জরুরী সব জিনিস আমদানি করত বাইরে থেকে। তাহলে কেন তারা সবাই তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালাল? সে ঘটনাও তাহলে একটু বলতে হয়।

হঠাৎ একদিন ব্যাকাপের তলা থেকে অদ্ভুত ও ভয় ধরানো একটা আওয়াজ শুনতে পেল এখানকার বাসিন্দারা। আর দেখতে পেল পাহাড়ের চূড়া থেকে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া আর আগুনের শিখা বেরিয়ে আসছে। এতদিন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি ওল্টানো পেয়ালা আসলে একটা আগ্নেয়গিরি, আর চূড়াটা হচ্ছে তার জ্বালামুখ। এটা একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি এবং এই ছোট

বসতিটি যখন তখন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, তাতে আর কারও সন্দেহ থাকল না। তাই এরকম আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী বিপদ দেখে কেউ আর এখানে থাকতে চাইল না। যে যার জিনিসপত্র নিয়ে একদিন সবাই বিভিন্ন দ্বীপে চলে গেল। এই দ্বীপে আবার ফিরে আসার কথা কেউ আর ভাবলও না।

কিন্তু বারমুডার সবগুলো দ্বীপেই এই আগ্নেয়গিরির খবর ছড়িয়ে পড়ল। এতে অনেকে যেমন ভীষণ ভয় পেল, আবার অনেকেই হয়ে উঠল কৌতূহলী। আমি ছিলাম কৌতূহলীদের দলে। ভেবেছিলাম, জেলেরা তো ভুলও বুঝতে পারে। তারা খবরটা কি পরিমাণ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে খবর ছড়াচ্ছে সেটাও তদন্ত করে জেনে আসা উচিত।

ছোট একটা নৌকা করে সাদাম্পটন বন্দর থেকে কয়েকজন অভিযানকারীকে সঙ্গে নিয়ে একদিন ব্যাকাপে গিয়ে হাজির হলাম। তীরে জেলেদের শূন্য ঘরবাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। সত্যি সত্যিই মাটির তলা থেকে গুরুগম্ভীর আওয়াজ, আর জ্বালামুখ থেকে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিটা জেগে উঠেছে। যে কোন সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

আমরা জ্বালামুখের কাছে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলাম। কারণ সেই পঁচাত্তর ডিগ্রী কোণ তৈরি করা খাড়া, পিচ্ছিল, মসৃণ ঢাল বেয়ে ওঠার সাধ্য কারও নেই। অগত্যা আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, পুরো দ্বীপটাই ঘুরে দেখব। কিন্তু জেলেদের বসতি ছাড়া অন্য সব জায়গায় এলোমেলোভাবে পাথরের বড় বড় চাঁই পড়ে ছিল। সেজন্যে তদন্তের শেষ পর্যায়ে আমাদের বেশ কষ্ট পোহাতে হয়েছে। আগুনের শিখা, ধোঁয়া, গম্ভীর আওয়াজ, এসব দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে জেলেরা এখান থেকে চলে গিয়ে ভালই করেছে।

সেই সময় ব্যাকাপে গিয়েছিলাম বলেই এখন দ্বীপটাকে চিনতে পারছি। কিন্তু ওখানে তো জাহাজ ভেড়াবার কোন বন্দর নেই। এব্বা কেন যে ওই দ্বীপের দিকে যাচ্ছে সেটা কিছুতেই আমি বুঝতে পারছি না।

প্রায় চারশো হাত দূরে একটা খাঁড়ির মুখে এসে স্কুনারটা থামল। সঙ্গে সঙ্গে সেরকো আর স্পেডকে নিয়ে জাহাজের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন কাউন্ট দার্তিগাস, আর আমার চোখের সামনেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।

গলুইয়ের নিচে একটা ছোট বয়া ভাসছিল। মাল্লারা সেটাকে টেনে ডেকের ওপর তুলল। তারপর হঠাৎ দেখি বিশাল কালো ছায়ার মত কি যেন একটা পানিতে ভেসে উঠছে। তিমি মাছ নাকি? ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম আমি। তিমির ধাক্কায় এব্বা পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়বে না তো?

কিন্তু তারপর আমি যা দেখলাম তাতে একেবারে বোকা বনে গেলাম। কারণ আমার চোখের সামনে পানি তোলপাড় করে যে বিশাল কালো জিনিসটা

ভেসে উঠল, সেটা আসলে একটা ডুবোজাহাজ। তখুনি এক্বার এই তীব্রগতির রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। নতুন আবিষ্কার করা জোরাল জেনারেটর থেকে পাওয়া বিদ্যুৎশক্তির জোরেই পানির তলায় থেকে ছুটছে এই ডুবোজাহাজ, আর পিছন থেকে স্কুনারটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ল্যাংবোটের মত। এক্বার মাস্তুল, পাল ও হাল, সবই হলো লোক দেখানো। এই ডুবোজাহাজটিই স্কুনারের গতির আসল উৎস।

ডুবোজাহাজের ওপর একটা পাটাতন আছে, পাটাতনের পাশে লোহার পাতে গড়া একটা চোঙ। পাটাতনের মাঝখান দিয়ে ডুবোজাহাজের ভিতরে ঢুকতে হয়। সামনে একটা পেরিস্কোপ আর সার্চ লাইট আছে, বোতাম টিপলেই পানির ভেতর আলো পড়ে।

সব রহস্যের জট কিন্তু এখনও খোলেনি। বুঝতে পারলাম ডুবোজাহাজটা বিদ্যুৎ শক্তি দিয়ে চলে, কিন্তু সেই বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় কোথায়?

যাই হোক, এসব নিয়ে ভাবার সময় এখন নেই। ইতিমধ্যে ডুবোজাহাজটা স্কুনারের পাশে এসে পড়েছে।

'চটপট নেমে পড়ুন।'

গলা শুনে তাকিয়ে দেখি সেরকো আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'কোথায়?'

'ডুবোজাহাজে।'

কথা না বলে ডুবোজাহাজের পাটাতনে নামলাম আমি। একটু পরেই টমাস রস আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে কেমন যেন একটা প্রশান্তির ভাব। ততক্ষণে সেরকো পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কাউন্ট দার্তিগাসও ডুবোজাহাজে নেমে এলেন।

ক্যাপটেন কিন্তু মাল্লাদের নিয়ে স্কুনারেই থাকল। গুণটানা লম্বা রশি দিয়ে বাঁধা একটা নৌকা পানিতে নামিয়েছে চারজন মাল্লা। পাহাড়ে গাঁথা লোহার আঙটার মধ্যে কাছিটা গলিয়ে স্কুনারটাকে আস্তে আস্তে তারা খাঁড়ির মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। আশ্চর্য ব্যাপার! বাইরে থেকে কেউই বুঝতে পারবে না এখানে কোন জাহাজ ভিড়েছে।

আধঘণ্টার মধ্যে নৌকাটা নিয়ে ফিরে এল মাল্লারা। সবাই ওঠার পর নৌকাটা ডুবোজাহাজের মধ্যে তোলা হলো। এরপর ব্যাকাপের পাশ ঘেঁষে ডানদিকে ছুটল ডুবোজাহাজ। দ্বীপের ভেতরে ঢোকার আরেকটা পথ পাওয়া গেল কয়েকশো ফুট যাবার পর। সেই সরু পথ দিয়েই ভিতরে ঢুকল ডুবোজাহাজটা। তবে অল্প কিছুদূর যাবার পরেই খাড়া পাহাড়ের ঢালের গায়ে

পথটা এসে শেষ হলো।

সেরকো নির্দেশ দেয়ায় লোহার সিঁড়ি বেয়ে ডুবোজাহাজের নিচে নামলাম। নিচের ঘরটা বোঝাই হয়ে আছে মালপত্রে। পাশের একটা ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া হলো আমাকে। ঢুকেই চিনতে পারলাম ঘরটা। এটাই তো সেই লোহার খুপরি, যেখানে অনেকক্ষণ আমি বন্দী হয়ে ছিলাম।

ঝনঝন করে কয়েকবার আওয়াজ হলো, বুঝতে পারলাম পোর্টহোলের ঢাকনিগুলো বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। এবার পানির মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে ডুবোজাহাজটা। ভার জমাবার জন্যে বড় বড় চৌবাচ্চাগুলো পানিতে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে।

মৃদু কম্পন থেকেই বুঝতে পারলাম নিচে নামার পরপরই চলতে শুরু করেছে ডুবোজাহাজ।

দু'তিন মিনিট পর ডুবোজাহাজটা আবার পানির ওপর ভেসে উঠল। ঘুলঘুলি বা পোর্টহোলের ঢাকনি খোলার ধাতব শব্দ শুনতে পেলাম। একটু পরেই আবার দরজা খুলে গেল। পাটাতনে গিয়ে দাঁড়াতেই একেবারে অবাক হয়ে গেলাম আমি।

কারণ ডুবোজাহাজটা পানির তলা দিয়ে ব্যাকাপের একেবারে ভেতরে অর্থাৎ পেয়ালার কানা পেরিয়ে ঠিক মধ্যের ফাঁকায় এসে পৌঁছেছে।

## নয়

পানি থেকে একশো পা দূরেই আমার ঘর। এখানে কোন কিছুরই অভাব নেই। আর সবকিছুই একেবারে আনকোরা নতুন। টেবিলে কাগজ, কলম, দোয়াত সাজানো। মাথার ওপর বাতি জ্বলছে। এই বিদ্যুৎ কোথা থেকে আসে, জেনারেটরটা কোথায়, এ-সব আমার জানা দরকার।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা খুবই ভাল। নোনা মাংস, মাছ, রুটি, হুইস্কি আর বিয়ার পেলাম প্রথম দিনে।

নানারকম জল্পনাকল্পনায় রাতটা কেটে গেল। সকাল সাতটায় বিছানা ছেড়ে উঠলাম। নিজেকে মনে করিয়ে দিলাম ঘুরেফিরে সব দেখতে হবে আমাকে। দেখতে গিয়ে চোখ একেবারে কপালে উঠল আমার।

পানির মধ্যে দিয়ে টানেল গেছে। এব্বার ডুবোজাহাজ যে সুড়ঙ্গ দিয়ে এখানে এল, সেটাকেই আমি টানেল বলছি। সেই সুড়ঙ্গের শেষেই এই গুহাটা।

টানেলের দৈর্ঘ্য চল্লিশ গজের কম হবে না। কোন ডুবোজাহাজ ছাড়া ওই জলমগ্ন পথ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করা স্রেফ বোকামি।

আর পালিয়ে যাবই বা কোথায়? প্রথমে আমাকে খুঁজতে হবে এই টানেল ছাড়া বাইরে বেরুবার অন্য কোন পথ আছে কি না। আর সেই পথ দিয়ে যদি পালাতেও পারি, তবু কোন লাভ হবে না। কারণ, ব্যাকাপ তো আর বিশাল কোন দ্বীপ নয়। যেই ওরা বুঝতে পারবে আমি পালিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপের চারদিকে তল্লাশি চালাবে। পেয়েও যাবে। তারপর পালাবার চেষ্টা করায় নানা ভাবে নির্যাতন চালাবে। কাজেই আপাতত পালাবার চেষ্টা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ব্যাকাপে কোন কালে আগ্নেয়গিরি ছিল না। এখনও নেই। কাউন্ট নিশ্চয়ই হঠাৎ এই টানেল দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছিলেন। তারপর অনেক শুকনো শ্যাওলা পুড়িয়ে ধোঁয়ার সৃষ্টি করেছেন, বোমা ফাটিয়ে বিকট আওয়াজ শুনিয়েছেন। আর তাতেই অর্ধ-শতাব্দীর আবাস ছেড়ে জেলেরা সব পালিয়েছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলাম ডুবোজাহাজটা গহ্বরের মধ্যেকার বিশাল হ্রদের তরঙ্গহীন পানিতে ভাসছে। পাশেই রয়েছে ছোট একটা জেটি। একদিকে বিশ হাত চওড়া একটা পাথরের কার্নিসে লোকজন মালপত্র নামাচ্ছে।

দ্বীপের মধ্যে যে পাহাড়টা আছে, সেই উল্টো করা পেয়ালার মধ্যে জড়ো করা হয়েছে শ্যাওলা আর কয়লার স্তূপ। দরকার হলেই আগুন দেয়া হবে। আর তাতে লোকজন কালো ধোঁয়া দেখে ভাববে বুঝি আগ্নেয়গিরি।

হ্রদের পশ্চিম তীর দিয়ে যেতে যেতে গুহাবাসীদের আশ্রয়নিবাস দেখতে পেলাম। নিরেট চুনাপাথর কেটে মৌচাকের মত খুপরি বানানো হয়েছে, সেই জন্যেই এটার নাম দেয়া হয়েছে 'মৌচাক'। খুপরিগুলোর সংখ্যা দেখে মনে হলো কাউন্টের শিষ্যরা সংখ্যায় প্রায় শ'খানেক হবে। কাউন্টের নিজের ঘর মৌচাক থেকে একটু দূরে।

পাহাড়ের গা কেটে হ্রদের অন্য তীরে বানানো হয়েছে বিশাল গুদাম ঘর। মালপত্র নামিয়ে নৌকা বোঝাই করে লোকজনরা সেই গুদামের দিকে রওনা হলো। সেরকো আর ক্যাপটেনের সাথে কি নিয়ে যেন কথা বলতে বলতে ডুবোজাহাজের দিকে চলে গেলেন কাউন্ট।

পাহাড়ের একটু দূরে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা দেখতে পেলাম, ভিতরে কি সব যেন খাড়া করে রাখা। ঠিক মাঝখানের একটা উঁচু খুঁটি থেকে মাকড়সার জালের মত মোটা মোটা তার দেখতে পেলাম। সেই তার ফাঁপা পাহাড়ের চারদিকে চলে গেছে। তারের ভেতর দিয়ে জোরাল বিদ্যুৎ বয়ে যাচ্ছে।

এটাই তাহলে সেই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। ডায়নামো। অ্যাকুমুলেটার আর অন্যান্য সব কলকব্জা এখানেই বসানো হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেড়ার ফাঁক দিয়ে একেবারে আনকোরা নতুন সব কলকব্জা দেখতে পেলাম। যন্ত্রপাতিগুলো আধুনিক। এদের সব কাজকর্ম নিশ্চয়ই এই বিদ্যুতেই সারা হয়।

পাশের একটা খুপরিতে দেখলাম সমুদ্রের পানি পরিশোধন করে, অর্থাৎ লবণ বের করে খাওয়ার উপযোগী করা হচ্ছে। কাছেই একটা জলাধার, তাতে সেই পরিষ্কার, বিশুদ্ধ, টলটলে পানি জমানো হচ্ছে।

পাথরের থামবহুল সেই একটা গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম। ওখানে নানা জাতের পশুপাখি আছে। গাংচিল, সারস, নানা ধরনের সিন্ধুপাখি গহ্বরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হ্রদের পানিতে প্রচুর মাছ। গুদামের মধ্যে আছে বিশাল বিশাল সব মদের পিপে। মোট কথা, বেঁচে থাকার জন্যে যা যা দরকার সবই এখানে আছে।

এদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্যই ভাল। তিরিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে, সব বয়সের মানুষই দেখতে পাচ্ছি। সবাই প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে পারে। সমুদ্রের খোলা বাতাসে অসুখবিসুখ খুব সহজে কাছে ঘেঁষতে পারে না।

## দশ

কাউন্ট দার্তিগাসের ঘর থেকে দুশো হাত দূরে আমার কামরা। টমাস রসকে আমার সাথে রাখা হবে কিনা, সে-ব্যাপারে আমি এখনই নিশ্চিত নই। কিন্তু আমাকে যদি টমাস রসের দেখাশোনা করতে হয় তবে দুজনের কামরা পাশাপাশি হওয়াই ভাল।

কাউন্ট দার্তিগাসের সাথে কথা বলার জন্যে বিকেলবেলা একবার বের হলাম। হ্রদের পাশ দিয়ে তাঁকে হনহন করে হেঁটে যেতে দেখলাম। তিনি সম্ভবত আমাকে দেখতে পাননি, কিংবা আমাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছেন। কারণ, দ্রুত পা চালিয়েও আমি তাঁকে ধরতে পারলাম না।

পুবদিক ধরে মৌচাকের সামনে দিয়ে এগোচ্ছি, হঠাৎ টমাস রসের কথা মনে পড়ল। তাঁকে কোথাও দেখতে না পেয়ে খুব আশ্চর্য লাগছে। হয়তো আবার তিনি খেপে গেছেন। কিছুদূর যেতেই সেরকোর সাথে দেখা হয়ে গেল।

কাউন্ট দার্তিগাসের মত অতটা গম্ভীর নয় সেরকো। তার ব্যবহারও বেশ

ভাল।

আমাকে দেখে সে-ই প্রথমে কুশল জিজ্ঞেস করল। যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও, ঠাণ্ডা সুরে জবাব দিলাম আমি।

'আপনাকে রক্ষা করুন সেইন্ট জোনাথান, মিস্টার গেডন। আপনি নিশ্চয়ই এত সুন্দর গুহা দেখে ভাগ্যকে দোষ দিচ্ছেন না? পৃথিবীতে আপনি এত সুন্দর জায়গা আর কোথায় পেতেন, বলুন!'

'গুহা দেখার পর আমাকে চলে যেতে দেয়া হলে নালিশ করার কিছুই থাকত না।'

'কি আশ্চর্য! এত তাড়াতাড়ি আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবছেন! এই চমৎকার জায়গাটার এখনও কিছুই তো দেখেননি আপনি।'

'যথেষ্ট হয়েছে, আর কিছু আমি দেখতেও চাই না। আমাকে এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে দেয়া হোক। আমি কাউন্ট দার্তিগাসের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে তাঁর ঘরে ঢুকতে দেয়া হয়নি।'

'কি বলছেন, এখানে তো কাউন্ট দার্তিগাস বলে কেউ থাকে না!'

'আপনি অবশ্যই ঠাট্টা করছেন। আমি একটু আগেই তাঁকে দেখেছি।'

'আপনি যাকে দেখেছেন, তিনি কাউন্ট দার্তিগাস নন।'

'তাহলে কে?'

'কের কারাইয়ে।'

নামটা শুনে আমার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। সেরকো নাম বলেই তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে গেল।

জলদস্যু! কের কারাইয়ে! এই নাম শোনেনি এমন কেউ আছে কিনা সন্দেহ। সবাই জানে এই নামের সাথে কত রক্তারক্তি কাণ্ড জড়িত। কার পাল্লায় পড়েছি, এবার তা বুঝতে পারলাম।

প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম অংশ আট-নয় বছর আগে এক জলদস্যুর উৎপাতে অশান্ত হয়ে উঠেছিল। দেশত্যাগী গুণ্ডাপাণ্ডা, জেল পলাতক কয়েদী, জাহাজ পালানো মাল্লা, এই ধরনের লোকরা মিলে একজন দুর্ধর্ষ দলপতিকে ঘিরে একটা ভয়ঙ্কর দল গড়ে তুলেছিল।

প্রথমে এই দলের সূত্রপাত হয়েছিল আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের গুণ্ডাপাণ্ডাদের নিয়ে। নিউ-সাউথ-ওয়েলসে সোনা আছে শুনে তারা বাড়ি ছেড়ে বেরোয়। এই স্বর্ণলোভীদের মধ্যে ছিল এঞ্জিনিয়ার সেরকো ও ক্যাপটেন স্পেড। কিন্তু শত চেষ্টা করেও কিছুতেই তারা নিজেদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারছিল না। তাদের আচার-আচরণ, স্বভাব এবং ভাবনায় এতই মিল ছিল যে, তারা খুব তাড়াতাড়ি অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। কিন্তু তাদের

বিবেক বা কাণ্ডজ্ঞান ছিল না বলে খুব বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও তারা উন্নতি করতে পারেনি। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, যে করেই হোক তাড়াতাড়ি বড়লোক হতে হবে। তাই তারা ধৈর্য সহকারে কোন কাজে হাত দিতে পারছিল না। যার ফলে এমন সব বেপরোয়া ও দুর্ধর্ষ অভিযানে তারা জড়িয়ে পড়েছিল যে ফিরে আসার আর কোন পথ তাদের সামনে খোলা ছিল না। সেই সব সোনার খনিতে বেশিরভাগ ভবঘুরের মত তারাও কাজ করতে লাগল। ওই খনি এলাকায় একজন ভয়ঙ্কর বেপরোয়া লোক ছিল, তার নাম কের কারাইয়ে। এই কের কারাইয়ে কখনও কিছুতেই পিছপা হতে জানে না। তার অভিধানে ভয় বলে কিছু নেই। অনেক চেষ্টা করেও লোকটার জাতীয়তাও কেউ জানতে পারেনি।

আমার মনে হয় কের কারাইয়ে আসলে মালয়ের মানুষ। তবে সে কোন দেশের লোক, এটার তেমন কোন তাৎপর্য নেই। আসল কথা হলো, সমুদ্রপথে সংঘটিত বহু রক্তারক্তি ঘটনার নায়ক সে। অস্ট্রেলিয়ার সেই খনিগুলোয় কয়েক বছর কাটাবার পর স্পেড আর সেরকোর সঙ্গে কের কারাইয়ের পরিচয় হয়। তারপর মেলবোর্ন শহরের একটা বন্দর দখল করে সে। প্রথম দিকে তার শিষ্য ছিল তিরিশ জন, খুব শিগ্‌গিরই এই সংখ্যা তিন গুণ হয়ে গেল। প্রশান্ত মহাসাগরের ওদিকে তখন জলদুস্যতা ছিল খুব সোজা ও লাভজনক ব্যবসা। কত লোক মারা গেছে, কত জাহাজ লুঠপাট হয়েছে, কত ছোটখাট দ্বীপে আক্রমণ চালানো হয়েছে, তার কোন হিসেব নেই। কের কারাইয়ের জাহাজ চালাত ক্যাপটেন স্পেড। কোন জাহাজই তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারত না। ছোট-ছোট দ্বীপগুলোর মধ্যে কি করে যেন গায়েব হয়ে যেত জাহাজটা। এই কের কারাইয়ের জন্যেই সমুদ্রপথে তখন চরম অশান্তি নেমে আসে। এই জাহাজের পিছু নেয়ার জন্যে ফরাসী, জার্মান, ইংরেজ, রুশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনেক রণতরী পাঠানো হয়েছে, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। ছায়ার মত কোন কোন জায়াগায় জাহাজটা হঠাৎ দেখা যায়, অবাধে লুঠপাট করে পরক্ষণেই আবার নেই!

তারপর হঠাৎ করে একদিন এই জলদুস্যতার ইতি ঘটল। কের কারাইয়ের কথা আর শোনা গেল না। বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পরও যখন আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, তখন সবাই ধারণা করল যে কের কারাইয়ে ও তার দলবল এতদিন লুঠপাট করে যে সম্পত্তি পেয়েছিল তা ভোগ করছে। কিন্তু জলদস্যুরা আশ্রয় নিল কোথায়? অনেক অনুসন্ধান চালিয়েও তাদের খুঁজে পাওয়া গেল না।

এসব কথা জানে না এমন মানুষ খুব কমই আছে। কিন্তু ব্যাকাপ দ্বীপ থেকে আমি বের হতে না পারলে এর পরের ঘটনাটা কেউ জানতে পাবে না।

লুঠপাট চালিয়ে বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী হয়েছে তারা। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর ছেড়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে দলটা। আগেই ঠিক করা আছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবাই জড়ো হবে। সেরকো এঞ্জিনিয়ারিঙে মহাপণ্ডিত। তার বিশেষ দক্ষতা কারিগরি বিদ্যায়। ডুবোজাহাজ নিয়েও তার বিশাল পড়াশোনা। কের কারাইয়েকে একদিন ডুবোজাহাজ বানাবার পরামর্শ দেয় সেরকো। এই ডুবোজাহাজ থাকলে কিছুতেই আর কোন ভয় থাকবে না। সাথে সাথে কের কারাইয়ে তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। টাকা পয়সার অভাব না থাকায় তারা দ্রুত কাজে লেগে গেল।

কাউন্ট দার্তিগাস নামে একজন ভদ্রলোক যখন গোটেনবার্গ জেটিতে এব্বা নামে একটা স্কুনার বানাবার হুকুম দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই ফিলাডেলফিয়ার জাহাজ তৈরির কারখানায় একটা ডুবোজাহাজ বানাবার প্ল্যান পাঠিয়েছিল সেরকো। এই ডুবোজোহাজের এঞ্জিনে নতুন আবিস্কৃত তড়িৎ কোষ থেকে উদ্ভূত বিদ্যুৎশক্তি কাজে লাগানো হলো।

কেউই বুঝতে পারেনি যে এই কাউন্ট দার্তিগাসই জলদস্যু কের কারাইয়ে। তাছাড়া এঞ্জিনিয়ার সেরকোই যে প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তি সৃষ্টির জন্যে অন্যতম দায়ী ব্যক্তি, সেটাও কেউ বুঝতে পারেনি। সেরকোর ডুবোজাহাজটা তৈরি হবার এক বছর আগেই এব্বা পানিতে ভাসল। আঠারো মাসে শেষ হলো ডুবোজাহাজ তৈরির কাজ। ওটার দ্রুত ডুবে যাবার ক্ষমতা, পাল্লা, গতি এবং ভেতরের আধুনিক কলকব্জা দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। প্রাথমিক কতগুলো পরীক্ষার পর ঘোষণা করা হলো, চার্লস্টনের চার মাইল দূরে খোলা সমুদ্রে সবার সামনে জাহাজটিকে চালিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হবে।

ডুবোজাহাজটা দেখার জন্যে এব্বাও সেখানে হাজির হলো। স্পেড, সেরকো ও অন্যান্য মাঝিরাও উপস্থিত, নেই শুধু কের কারাইয়ে। ডুবোজাহাজে নাবিক উঠল ছয়জন। তাদের মধ্যে গিবসন নামে একজন ইংরেজ যন্ত্রবিদ আছে।

কিছুক্ষণ পানির সারফেসে ভেসে ঘুরে বেড়াবে ডুবেজাহাজটা। তারপর কয়েক ঘণ্টা পানির নিচে ঘোরাফেরা করে বারদরিয়ার কয়েক মাইল দূরে একটা বয়ার কাছে ভেসে উঠবে। আর তাহলেই বোঝা যাবে যে জাহাজটা পরীক্ষায় পাশ করেছে।

যাত্রার সময় আস্তে আস্তে ঘনিয়ে এল। জাহাজে ওঠা-নামার দরজাটা বন্ধ করে দেয়া হলো। তারপর ডুবোজাহাজটা পানির সারফেসে এমন সব কসরৎ দেখাতে লাগল যে কেউ মুগ্ধ না হয়ে পারল না। এরপর এব্বা থেকে একটা সঙ্কেত দিতেই জাহাজটা ধীরে ধীরে পানিতে ডুবে গেল। যেখানে ভেসে ওঠার

কথা সেখানে আগে থেকেই অনেক জাহাজ ভিড় করেছে। এক দুই করে তিন ঘণ্টা কেটে গেল, কিন্তু ডুবোজাহাজটা আর ভেসে উঠল না। কেউই জানতে পারল না এঞ্জিনিয়ার সেরকো আর কাউন্টের মধ্যে আগেই কথা হয়ে আছে যে এই গোপন স্কুনার টানা ডুবোজাহাজটা নির্ধারিত স্থান থেকে কয়েক মাইল দূরে গিয়ে ভেসে উঠবে। সবাই ভাবল জাহাজের কলকব্জায় নিশ্চয়ই কোথাও বড় ধরনের ত্রুটি ছিল, যার ফলে এই পরীক্ষা পর্বেই তার সলিল সমাধি ঘটেছে। সাথে সাথে পানির নিচে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। কিন্তু সব প্রচেষ্টাই বিফল হলো।

কাউন্ট দার্তিগাস ওরফে কের কারাইয়ে দু'দিন পর সাগর পাড়ি দেয়ার অভিযানে বের হলো। তার ঠিক আটচল্লিশ ঘণ্টা পর পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে ডুবোজাহাজটা দেখতে পেল সে। আর এভাবেই বিপদগ্রস্ত জাহাজকে আক্রমণ করার এবং স্কুনার চালাবার একটা চমৎকার ব্যবস্থা করে নিল জলদস্যুরা।

এতসব ঘটনা সবই আমি সেরকোর মুখে শুনেছি। সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটা তার মাথা থেকেই বেরোয়।

কের কারাইয়ে যে কি ভীষণ অপক্ষমতা হাতে পেয়েছে তা আর আমার বুঝতে বাকি থাকল না। রাতে ওই ডুবোজাহাজ অসহায় সব জাহাজকে আক্রমণ করে। আর তখন পাশে এসে দাঁড়ায় স্কুনার এব্বা। লুটপাট চলে অবাধে, খুন জখম চালানো হয় ইচ্ছামত। আর এভাবেই একের পর এক জাহাজ রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে যেতে লাগল।

চার্লসটন উপসাগরের সেই প্রহসনের পর এক বছরের মধ্যেই আবার কের কারাইয়ের অত্যাচারে আটলান্টিক মহাসাগর অশান্ত হয়ে উঠল। লুণ্ঠিত যে-সব পণ্য কের কারাইয়ের কাজে লাগে না সে-সব সে বেচে দেয় দূর দেশে, তাই তার ধন-সম্পদ দিন দিন বেড়েই চলছে। কিন্তু এসব ধন-সম্পদ নিরাপদে লুকিয়ে রাখার মত কোন জায়গা তখনও জলদস্যুরা পায়নি।

ভাগ্যই তাদেরকে একটা গোপন আস্তানা জুটিয়ে দিল। বারমুডার জলসীমার ভেতর সন্ধান করার সময় একদিন গিবসন আর সেরকো ব্যাকাপ দ্বীপে ঢোকার এই সুড়ঙ্গ বা টানেলটা আবিষ্কার করে ফেলে। এখানে কেউ লুকিয়ে থাকলে কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না।

কের কারাইয়ে ব্যাকাপে থাকার সিদ্ধান্ত নিল। এঞ্জিনিয়ার সেরকো দ্রুত একটা বিদ্যুৎ কারখানা তৈরি করে ফেলল। ভারী ভারী কলকব্জা আনা হলো বিদেশ থেকে। লোকের চোখে যাতে ধরা না পড়ে সে জন্যে শুধু কতগুলো ব্যাটারি বসানো হলো। ব্যাটারি বানাতে লাগে কেবল মাত্র কয়েকরকম

রাসায়নিক দ্রব্য আর ধাতুর পাত। এব্বা খুব সহজেই সে সব উপকরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করল।

১৯-২০ রাতে কি ঘটেছিল সেটা সহজেই এখন বোঝা যায়। তিন মাস্তুলের সেই জাহাজটি বাতাসের অভাবে কোথাও যেতে পারছিল না। অথচ আমি সকালবেলা জাহাজটাকে কোথাও দেখতে পাইনি। তবে এখন আমি পরিষ্কার জানি সেদিন কি ঘটেছিল। প্রথমে ডুবোজাহাজটা সেটাকে আক্রমণ করে, তারপর এব্বার মাঝিরা লুঠপাট করে সেটাকে পানিতে ডুবিয়ে দেয়।

হ্রদের পাশে হাঁটতে হাঁটতে অনেক কিছু ভাবছিলাম। পিছনে তাকিয়ে দেখি কের কারাইয়ে আর স্পেড দাঁড়িয়ে আছে।

'আপনি আমাকে জোর করে এখানে ধরে রেখেছেন। যদি মনে করেন আমাকে দিয়ে টমাস রসের সেবা করাবেন, তাহলে তা ভুলে যান। কারণ, এখন আমি জেনে গেছি আপনি কে,' বললাম আমি।

'কাউন্ট দার্তিগাসই জলদস্যু কের কারাইয়ে। আর গেডন নামক সেবাকারীই হলো এঞ্জিনিয়ার সিমোন আর্‌ৎ। কের কারাইয়ে তাকে আর কখনোই মুক্তি দেবে না, কারণ সিমোন আর্‌ৎ তার সব গোপন কথা জেনে গেছে,' বললেন জলদস্যু কের কারাইয়ে ওরফে কাউন্ট দার্তিগাস।

# এগারো

ব্যস, এক পলকেই সব রহস্যের জট খুলে গেল। আমার আসল পরিচয় কের কারাইয়ে জানে। এখন জেনেছে, ব্যাপারটা তাও নয়; জানে টমাস রস আর আমাকে অপহরণ করার সময় বা তারও আগে থেকে। কিন্তু এ কিভাবে সম্ভব? হেলথফুল হাউসের কাউকেই আমি নিজের পরিচয় জানতে দিইনি, কের কারাইয়ে তা জানল কিভাবে? টমাস রসের শুশ্রূষাকারী একজন ফরাসী এঞ্জিনিয়ার, এই তথ্য কে দিল তাকে? একটা ধাঁধার সমাধান হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নতুন আরেকটা ধাঁধায় পড়লাম। সন্দেহ নেই কাউন্টের তথ্য দফতর খুবই দক্ষ। এ জন্যে নিশ্চয় তাকে দু'হাতে পয়সা ঢালতে হয়।

এখন থেকে তাহলে এই কের কারাইয়ে আর তার শিষ্য এঞ্জিনিয়ার সেরকোই আমার বদলে টমাস রসের দেখাশোনা করবে? বেশ বেশ। কিন্তু আমার চেয়ে বেশি কি-ই বা করার আছে ওদের? ওদের সেবা-শুশ্রূষায় রস কি সেরে উঠবেন? সে সম্ভাবনা কি সত্যি আছে? ঈশ্বর সহায়, তাহলে আর সভ্য

জগতের বিপদের কোন সীমা থাকবে না।

কের কারাইয়ের শেষ কথার উত্তরে কিছুই আমি বলতে পারিনি। তার কথা বুলেটের মতই আঘাত করেছে আমার বুকে। তথাকথিত কাউন্ট দার্তিগাস ওরফে কের কারাইয়ে সম্ভবত ভেবেছিল তার কথা শুনে আমি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ব। কিন্তু সে রকম কিছু ঘটল না। বরং তার অগ্নিদৃষ্টি অগ্রাহ্য করে আমিও সরাসরি তার চোখে তাকিয়ে থাকলাম। সে অবশ্য চোখ নামায়নি বা চোখের পাতাও ফেলেনি। তার মত আমিও হাত দুটো বুকে ভাঁজ করে দাঁড়িয়েছিলাম। তবে মনে মনে জানি তার ওপরই আমার ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সে চাইলে আমি মারা যাব। শুধু একটা ইঙ্গিতের অপেক্ষা, পিস্তলের গুলি ফুটো করে দেবে আমার ফুসফুস। তারপর লাশটা হ্রদে ফেলে দেয়া হবে। সুড়ঙ্গ হয়ে সেটা পৌঁছে যাবে খোলা সমুদ্রে।

ওই ঘটনার পরও আমি আগের মত ঘোরাফেরা করছি। কেন জানি না আমার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেয়া হয়নি। আমি সিমোন আর্‌ৎ, এটা কের কারাইয়ে জানে, তবে ব্যাকাপের অবস্থান যে আমার কাছে গোপন নেই এটা সে নিশ্চয়ই এখনও জানে না। মৌচাকের শেষ মাথায় আমার ঘর, সেখানে ফিরে যাবার সময় ভাবলাম, আমার পরিচয় জানে বলেই কের কারাইয়ে টমাস রসের ধারেকাছেও আমাকে ঘেঁষতে দেবে না, তাঁর সেবা-শুশ্রূষার সুযোগ দেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম, ফুলগুরেটরের সূত্র আদায় করার জন্যে চাপ দেয়া হচ্ছে রসকে। ছলে-বলে-কৌশলে ওরা বিস্ফোরক তৈরির রহস্য জানার চেষ্টা করবে। ওরা জলদস্যু, নিজেদের কাজে ওই বিস্ফোরক ব্যবহার করতে চাইবে।

দেখতে দেখতে পনেরো দিন পার হয়ে গেল। স্বাধীনভাবে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু টমাস রসকে একবারও দেখতে পেলাম না। খাওয়াদাওয়া ভালই হচ্ছে, তাই শরীর-স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েনি। হাতে প্রচুর অবসর, সেটা কাজে লাগাচ্ছি যা কিছু ঘটছে সব সবিস্তারে লিখে রেখে। নিয়ম ধরে রোজই কিছু না কিছু লিখি।

পরপর তিন-চারদিন দেখলাম টমাস রস হ্রদের কিনারা ধরে পায়চারি করছেন, তাঁর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বকবক করছে সেরকো। সে-ই এখন রসের শুভানুধ্যায়ী ও গাইড। গোটা গহ্বরটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাল, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে নিয়ে গেল, ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল ডুবোজাহাজটা কিভাবে কাজ করে, কিভাবে স্কুনার এব্বাকে টেনে নিয়ে যায়। রস আগের চেয়ে অনেক শান্ত, হাবভাব দেখে মনে হয় স্যানাটরিয়াম হেলথফুল হাউস থেকে বেরিয়ে আসার

পর এখন তিনি অনেকটাই সুস্থ।

কের কারাইয়ের সাজানো-গোছানো বাড়িতেই রাখা হয়েছে টমাস রসকে। তাঁকে সারাক্ষণ কেউ একজন চোখে চোখে রাখে, সম্ভবত সেরকোই। জানি না রস এখনও টাকাটাকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবছেন কিনা। তাঁর চাওয়া যে-কোন দাম দিতে এরা রাজি হয়ে গেলে রস কি করবেন তাও আমার জানা নেই। তিনি কি টাকার লোভে তাঁর আবিষ্কারের সব সূত্র ফাঁস করে দেবেন? এরা জলদস্যু, বহু বছর ধরে লুঠপাট করে বিপুল সোনা জমিয়েছে। সে-সব যদি রসের সামনে ঢেলে দেয়া হয়, তাঁর চোখ তো ধাঁধিয়ে যাবারই কথা।

এই চিন্তাটা রীতিমত অসুস্থ করে তুলল আমাকে। রাতে ঘুমাতে পারি না, খিদে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

জুলাইয়ের পঁচিশ তারিখে হঠাৎ করে টমাস রসের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। তখন সকাল, দেখি কি হ্রদের ওপারে একাই বসে আছেন রস। মনে পড়ল, কাল রাতে কের কারাইয়ে, সেরকো বা স্পেডকে কোথাও দেখিনি। তারা সম্ভবত কোন অভিযানে বেরিয়েছে। পাহারা দেয়ার কেউ নেই, কাজেই রসের কাছে এখন যাওয়া যায়। দ্রুত পায়ে তাঁর দিকে এগোলাম। তবে হুট করে সামনে গেলাম না। তিনি আমার উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হবার আগে, আড়াল থেকে খুঁটিয়ে দেখলাম তাঁকে।

রস চিন্তিত ও নার্ভাস হলেও, দেখে মনে হচ্ছে না যে তিনি মানসিক রোগী। মাথাটা নত, ধীর পায়ে হাঁটাহাঁটি করছেন, বগলের ছোট্ট ড্রয়িংবোর্ডে এক পাতা কাগজ আটকানো। কাগজটায় কি সব যেন আঁকা রয়েছে। নকশা বলেই মনে হলো। কিন্তু কিসের নকশা বুঝতে পারলাম না।

আড়াল থেকে বেরুতেই আমাকে তিনি দেখতে পেলেন। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পেরেছেন। এক পা এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। 'আরে! গেডন! তোমাকে আবার দেখতে পাব বলে তো ভাবিনি। এখন কিন্তু আমি ভাই স্বাধীন, তোমার নজরবন্দী নই।'

হ্যাঁ, হেলথফুল হাউসের চেয়ে এখানে তাঁর স্বাধীনতা তো অবশ্যই বেশি। বুঝতে পারলাম, আমাকে দেখে তিক্ত কিছু স্মৃতি ফিরে এসেছে তাঁর মনে। এখন যদি তাঁর মানসিক রোগটা বেড়ে যায় আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

'হ্যাঁ, ঠিক চিনতে পেরেছি, তুমি সেই গেডনই। খবরদার, কাছে আসবে না! ভেবেছ আবার আমাকে বন্দী করবে? জেলখানায় ভরবে? ভুলে যাও, ভুলে যাও। এখানে আমার যারা বন্ধু তাদের অনেক ক্ষমতা, তারাই তোমার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করবে। জানো, এখানে কে আমার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন? বিশাল ধনী মানুষ তিনি, সম্ভ্রান্ত একজন কাউন্ট—কাউন্ট দার্তিগাস। এঞ্জিনিয়ার

সেরকোকে চেনো, আমার পার্টনারকে? সে আমার সহকারী হিসেবে কাজ করতে রাজি হয়েছে, সিদ্ধান্ত হয়েছে এখানেই আমরা ফুলগুরেটর বানাব। তবে এ-সব কথা তোমাকে বলার কোন মানে হয় না। তুমি এখন যাও, তাড়াতাড়ি কেটে পড়ো!'

রসের গলা ক্রমশ চড়ছে, তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাত-পা নাড়ছেন ঘন ঘন। এ-সব যে খেপে ওঠার লক্ষণ, কে আর আমার চেয়ে ভাল জানে। হঠাৎ পকেটে হাত ভরে মুঠো মুঠো ব্যাংকনোট আর কাগজের ডলার বের করলেন। আরেক পকেট থেকে বেরোল গিনি—সোনার টাকা। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্মান—সব দেশের টাকাই রয়েছে তাঁর কাছে। পকেট থেকে বের করে নিজের চারদিকে ছড়াচ্ছেন। একদিক থেকে ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যজনক। এত টাকা কোত্থেকে পেলেন রস? আবার চিন্তা করে দেখলে এর মধ্যে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। টমাস রসের টাকা পাবার সম্ভাব্য উৎস তো মাত্র একটাই—কের কারাইয়ে। ফুলগুরেটর বানিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করার বিনিময়ে এই টাকা রসকে দিয়েছে সে।

ইতিমধ্যে চিৎকার জুড়ে দিয়েছেন রস। আশপাশ থেকে জলদস্যুদের কয়েকজন ছুটে এল। তারা আসলে কাছাকাছিই ছিল, আড়াল থেকে লক্ষ রাখছিল আমাদের ওপর। টমাস রসকে শক্ত করে ধরে সরিয়ে নিল তারা। আমার সামনে থেকে সরে যেতেই আবার আগের মত শান্ত ও চুপচাপ হয়ে গেলেন রস। দেখে মনেই হলো না একটু আগে খেপে গিয়েছিলেন।

আজ সাতাশে জুলাই। সকালে সেই পাথরের পিলারগুলোর একেবারে শেষ মাথা পর্যন্ত গিয়েছিলাম। পাথরের গা ঘেঁষে যেখানে ডুবোজাহাজটা থাকে সেখানে গিয়ে দেখি সেটা নেই। অনেক খুঁজেও হ্রদের কোথাও দেখতে পেলাম না।

স্বভাবতই আমার সন্দেহ হলো, ডুবোজাহাজের সাহায্যে প্রমোদতরী এব্বা রওনা হয়েছে নতুন কোন অভিযানে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য লুঠপাট না-ও হতে পারে। টমাস রসের ফুলগুরেটর বানাতে হলে অনেক উপকরণ লাগবে, কের কারাইয়ে নিশ্চয়ই সেগুলো কিনতে গেছে। নিজের ওপর একটু রাগ হলো। ওরা যে এব্বা নিয়ে রওনা হবে, এটা আগেই আমার আন্দাজ করা উচিত ছিল। চেষ্টা করলে হয়তো ডুবোজাহাজে ঢুকতে পারতাম, তারপর সেখান থেকে এব্বার খোলে গিয়ে লুকিয়ে থাকা কঠিন হত না। এব্বা নিশ্চয়ই কোন বন্দরে ভিড়বে, তখন সুযোগ বুঝে নেমে পড়লেই মুক্তি পেতাম, সেই সঙ্গে দুনিয়ার মানুষকে এই দস্যুদলের ষড়যন্ত্রের কথা বলে দিতে পারতাম।

এ-সব চিন্তা করে অস্থিরতা অনুভব করছি, এই সময় দেখি কিং জেটি থেকে

চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হাত দূরে হ্রদের পানিতে তুমুল আলোড়ন উঠল। পাটাতনের ঘুলঘুলি খুলে গেল, নিজের লোকজন নিয়ে ওপরে উঠে এল গিবসন। বাকি সবাই পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। নোঙরের রশিটা ছুঁড়ে দিতেই লুফে নিল তারা, তারপর ডুবোজাহাটাকে টেনে আনল পাথরের কিনারায়।

দেখলাম শুধু ডুবোজাহাজটাই ফিরেছে, এব্বা ফেরেনি। তারমানে কের কারাইয়ে আর তার সঙ্গীদের এব্বায় তুলে দিয়ে এল ডুবোজাহাজ। ওটার সাহায্য ছাড়াই রওনা হয়েছে এব্বা। কবে ফিরবে তাও নিশ্চয় বলে গেছে কের কারাইয়ে। সেদিন টানেল ধরে আবার বেরিয়ে যাবে ডুবোজাহাজ, এব্বা থেকে ফিরিয়ে আনবে সবাইকে।

ঘটনা খুব দ্রুত ঘটছে। এরা না সত্যি সত্যি ফুলগুরেটর বানিয়ে ফেলে। তা যদি পারে, সর্বনাশের তাহলে আর কিছু বাকি থাকবে না।

আজ অগাস্টের তিন। বিকেল তিনটের দিকে আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটে গেল। কোন কারণ নেই, হঠাৎ হ্রদের পানিতে তুমুল আলোড়ন উঠল। দুই কি তিন মিনিট পর শান্ত হলো হ্রদ। কিন্তু খানিক পর আবার সেই তুমুল আলোড়ন। দৃশ্যটা দেখে জলদস্যুদেরও চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। সবাই তারা হ্রদের কিনারায় জড়ো হয়েছে। ডুবোজাহাজ জেটিতে বাঁধা রয়েছে, তাহলে পানির তলায় কি ওটা? অন্য কোন ডুবোজাহাজ, টানেল হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে?

হঠাৎ হ্রদের আরেক তীরে একটা হৈ-চৈ শুরু হলো। দুর্বোধ্য ভাষায় কি সব বলাবলি করল জলদস্যুরা, তারপর ছুটতে ছুটতে ফিরে গেল মৌচাকে। পানির নিচে প্রকাণ্ড কোন সামুদ্রিক প্রাণী দেখেছে ওরা? ভীষণ কোন দানব? সেটাকে মারবে বলে অস্ত্র আনতে গেল নাকি?

একটু পরই দেখি জলদস্যুরা মৌচাক থেকে ফিরে আসছে। আমার ধারণাই ঠিক। তাদের হাতে বন্দুক আর হারপুন দেখতে পেলাম।

ওটা একটা প্রাণীই বটে, বারমুডার বিশাল তিমিঙ্গিল। কিভাবে যে টানেল দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে, তারপর আর বেরুতে পারছে না, অসহায় ক্ষোভে লেজ আছড়াচ্ছে পানিতে। মনে প্রশ্ন জাগল, এখানে কেন এল ওটা? তবে কি কোন তিমি শিকারি জাহাজ তাড়া করেছে ওটাকে?

খানিক পরই পানির ওপর ভেসে উঠল তিমিঙ্গিলটা। ওটার প্রকাণ্ড পিঠ সবুজ আর পিচ্ছিল। শরীরটা ঘন ঘন মোচড়াচ্ছে। পানি ছিটাল ওটা—এক জোড়া স্তম্ভের আকৃতি পেল দুটো ধারা।

একটু পরই ওটার এই অপ্রত্যাশিত আগমনের কারণ বুঝতে পারলাম।

ওটাকে আসলে তাড়া করছে হিংস্র হাঙরের একটা দল। এদিকের পানিতে সংখ্যায় খুব বেশি ওরা। পানি স্বচ্ছ হওয়ায় পাঁচ-সাতটা হাঙরের সাদা পেট স্পষ্টই দেখতে পেলাম। দাঁতগুলো অসম্ভব ধারাল। হাঙরগুলো একযোগে হামলা করছে। শুধু লেজের ঝাপটা মেরে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে প্রকাণ্ড তিমিটা। হাঙরগুলো আগেই দাঁত দিয়ে কামড়ে ওটার গা থেকে প্রচুর মাংস তুলে নিয়েছে। অতিকায় প্রাণী, কিন্তু একদল হাঙরের কাছে অসহায়। বারবার ডুবছে আর ভাসছে, সেই সঙ্গে লাল হয়ে উঠছে হ্রদের পানি।

কিন্তু হাঙরগুলোর কপাল খারাপ। ওগুলোর মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। হাঙর যতই হিংস্র হোক, কিংবা দলে যতই ভারী হোক, সশস্ত্র মানুষই আসলে সব সময় জেতে। কের কারাইয়ের শিষ্যরা কেউ পানিতে নামল না। তীরে দাঁড়িয়েই তারা তিমিটাকে দখল করবে। গোটা একটা তিমি ব্যাকাপ বাসিন্দাদের কাছে খুবই মূল্যবান। ওটাকে হাতছাড়া করা যায় না।

কের কারাইয়ের সেই মালয়ী শিষ্য রশি আর হারপুন হাতে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তিমিটা নাগালের মধ্যে আসতেই হারপুন ছুঁড়ল সে। অস্ত্রটা ঠিক পাখনার পাশে বিঁধল। পরমুহূর্তে তীব্র ঝাঁকি খেয়ে ডুব দিল তিমি। মালয়ী লোকটার হাত থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল পঞ্চাশ কি ষাট গজ রশি। এরপর শেষ নিঃশ্বাস ফেলার জন্যে তিমিটা পানির ওপর ভেসে উঠলেই হয়, টেনে ওটাকে তীরে তোলা কোন ব্যাপারই নয়।

মালয়ীকে তার সঙ্গীরা সাহায্য করছে; সবাই খুব সতর্ক হারপুনটা যাতে তিমির গা থেকে খুলে না যায়। টানেলের ঠিক মুখের কাছে আবার ভেসে উঠল ওটা। আঘাত খুব গুরুতর, মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে, শেষমুহূর্তে রক্ত মেশানো পানির স্তম্ভ উগরে দিচ্ছে শূন্যে। শেষবারের মত প্রচণ্ডবেগে লেজটা ঝাপটাল। হাঙরগুলো ছেঁকে ধরেছিল, দল থেকে ছিটকে পাথরে আছাড় খেলো একটা হাঙর। সঙ্গে সঙ্গে থেঁতলে গেল ওটার শরীর, মারা গেছে। লেজের বাড়ি মেরেই ডুব দিল তিমি। খানিক পর আবার ভেসে উঠে এত জোরে ঝাপটা মারল, পানি সরে যাওয়ায় টানেলের প্রবেশমুখটা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমি। হাঙরগুলো ছুটে এল আবার। তবে নতুন করে দাঁত বসাবার সুযোগ পেল না, একই সঙ্গে গর্জে উঠল কয়েকটা পিস্তল। কয়েকটা হাঙর গুলি খেয়ে পটল তুলল, বাকিগুলো অবস্থা বেগতিক দেখে কেটে পড়ল।

যে পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে, সেটা কি খুঁজে পাবে ওগুলো? না পেলে খোলা সমুদ্রে বেরুতে পারবে না। তা বেরুতে পারুক বা না পারুক, অন্তত কয়েকটা দিন হ্রদের পানিতে গোসল করা উচিত হবে না।

তিমিটা মারা গেছে। একটা নৌকা নিয়ে দু'জন লোক এগোল, তিমিটাকে

টেনে নিয়ে এল জেটির কাছে। দক্ষ হাতে মালয়ী লোকটা কাটল ওটাকে। কুড়ুল চালাবার ভঙ্গিই বলে দেয়, এই কাজে সে অভ্যস্ত।

পশ্চিম দেয়ালের ঠিক কোথায় টানেলের মুখ, এখন আমি তা জানি। পানির সারফেস থেকে মাত্র তিন কি চার গজ নিচে মাত্র। কিন্তু জেনেই বা কি লাভ আমার!

অগাস্টের আজ সাত। বারো দিন হয়ে গেল এঞ্জিনিয়ার সেরকো আর ক্যাপ্টেন স্পেডকে নিয়ে অভিযানে বেরিয়েছে কের কারাইয়ে। কবে তারা ফিরবে বোঝা যাচ্ছে না। এদিকে ডুবোজাহাজটা সমুদ্র পাড়ি দেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। গিবসন ব্যাটারিগুলো চার্জ করে রেখেছে।

ব্যাকাপের খাঁড়িতে ঢোকার জন্যে রাতের অন্ধকারই সম্ভবত বেশি পছন্দ করবে কের কারাইয়ে। ডুবোজাহাজের প্রস্তুতি দেখে মনে হলো এব্বা হয়তো আজ রাতেই ব্যাকাপের খাঁড়িতে ফিরে আসবে।

দশ অগাস্ট। কাল রাতে হঠাৎ টানেল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ডুবোজাহাজ। এব্বাকে খাঁড়িতে রেখে আরোহীদের ভেতরে নিয়ে এসেছে।

আজ সকালে হ্রদের পাশে সেরকোকে দেখলাম, টমাস রসের সঙ্গে আলাপ করছে। আমার খুব ভালই ধারণা আছে কি নিয়ে আলাপ করতে পারে ওরা।

টমাস রসকে অস্থির ও আগ্রহী মনে হলো। ডুবোজাহাজে ওঠার জন্যে দ্রুত পা চালিয়ে জেটির দিকে চলে গেলেন। তাঁর পিছু নিল সেরকো।

মাল্লারা কার্গো খালাস করছে। ইতিমধ্যে দশটা কাঠের বাক্স নামিয়ে পাথরের ওপর রেখেছে তারা। বাক্সগুলোর গায়ে লাল অক্ষরে কি সব লেখা। অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে লেখাগুলো পড়লেন রস। সেরকোর নির্দেশ মত বাক্সগুলো নৌকায় তুলে স্টোররুমের দিকে চলে গেল মাল্লারা।

সন্দেহ নেই বাক্সগুলোতে বিস্ফোরক বানাবার রাসায়নিক উপকরণ আছে। নিশ্চয়ই কোন মার্কিন কোম্পানিকে ক্ষেপণাস্ত্র বানাবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বানানো হয়ে গেলে এব্বা গিয়ে নিয়ে আসবে।

এব্বা সম্ভবত এই প্রথম লুঠের মাল না নিয়েই ফিরে এল। জলদস্যুদের সব কাজই এখন বিস্ফোরক তৈরি করাকে ঘিরে। দুনিয়ার বড় বড় দেশ যে ক্ষমতা পেয়েও নিতে পারেনি, সেই ক্ষমতার মালিক হতে যাচ্ছে একজন দস্যুসর্দার কের কারাইয়ে। সে আর তার দস্যুদল কী ভয়ঙ্কর ক্ষমতা পেয়ে যাচ্ছে, ভাবতেই আমার বুকটা কেঁপে উঠল। টমাস রস যদি কিছু বাড়িয়ে না বলে থাকেন, তাঁর আবিস্কৃত বিস্ফোরক গোটা জগৎটাকেই ধ্বংস করে দিতে পারে। ঈশ্বরই

জানেন শেষ পর্যন্ত কি ঘটতে চলেছে। একদিন হঠাৎ খেপে গিয়ে তিনি নিজেই যে দুনিয়াটাকে উড়িয়ে দিতে চাইবেন না, এর কি কোন নিশ্চয়তা আছে?

## বারো

**এগারো থেকে সতেরো অগাস্ট পর্যন্ত কি কি ঘটল।**

আজকাল হ্রদের বাঁ তীরের কারখানাতেই ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে টমাস রস। কারখানা মানে নিশ্চয়ই ল্যাবরেটরি।

সেখানে একাই তিনি কাজ করেন, আর কাউকে ঢুকতে দেন না। এর কারণ নিশ্চয়ই গোপনীয়তা। কিভাবে তিনি বিস্ফোরক তৈরি করবেন তা কাউকে জানতে দিতে চান না।

রস ল্যাবে ঢোকেন সকালবেলা, বেরোন গভীর রাতে। নিজের কাজের প্রতি তাঁর অটল মনোযোগ আর নিষ্ঠা, আশপাশে কি ঘটছে না ঘটছে সে-সম্পর্কে কোন ধারণাই রাখেন না। দেখেশুনে মনে হয় এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ। মাথাটা অবশ্য ঠাণ্ডা থাকারই কথা, কারণ তাঁর মূল দাবি তো পূরণ করা হয়েছে। দস্যুসর্দার কের কারাইয়ে তাঁকে বিপুল অর্থ-সম্পদ দেবে বলে কথা দিয়েছে, কিংবা হয়তো এরই মধ্যে দিয়ে দিয়েছে।

**সতেরো ও আঠারোই অগাস্ট।**

রাত তখন প্রায় একটা হবে। অকস্মাৎ বিরতিহীন বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলাম কেউ বোধহয় আক্রমণ চালিয়েছে। জলদস্যু কের কারাইয়ের স্কুনার এব্বার রহস্য কি তাহলে ফাঁস হয়ে গেছে? পিছু নিয়েছিল, তারপর কামান ছুঁড়ে গোটা দ্বীপটাই উড়িয়ে দিতে চাইছে কোন গোয়েন্দা জাহাজ?

তারপর ভাবলাম কের কারাইয়ের হাতে ফুলগুরেটর পড়ার চেয়ে ব্যাকাপ ধ্বংস হয়ে যাওয়া অনেক ভাল, দুনিয়ার মানুষ একটা মহাবিপদ থেকে রক্ষা পাবে। তাতে টমাস রস এবং আমি যদি মারাও যাই, আমার কোন দুঃখ থাকবে না।

প্রায় সারারাতই থেমে থেমে বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল। ভোরের আলো ফুটতেই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম আমি। কিন্তু মৌচাকের পরিবেশ আগের মতই শান্ত দেখলাম। জলদস্যুরা যে-যার কাজ নিয়ম ধরে করে যাচ্ছে।

জেটিতে বাঁধা রয়েছে ডুবোজাহাজ। টমাস রসকে ল্যাবে ঢুকতে দেখলাম। হ্রদের পাশে দাঁড়িয়ে কের কারাইয়ে ও সেরকো কি যেন দেখছে। না, কাল রাতে দ্বীপে কেউ হামলা চালায়নি। তাহলে ভোর হবার আগে পর্যন্ত যে বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনলাম, তার রহস্যটা কি?

কের কারাইয়ে নিজের আস্তানার দিকে চলে গেল। অলস পায়ে আমার দিকে এগিয়ে এল এঞ্জিনিয়ার সেরকো। তার মুখে হাসি থাকলেও, হাসির সঙ্গে শ্লেষের মিশেল আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। 'তো মঁশিয়ে সিমোন আর্‌ৎ, এখানকার নিরিবিলি পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে আপনি বেশ ভালই খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন, কি বলেন? আশা করি এখান থেকে চলে যাবার ইচ্ছাটা ইতিমধ্যে মরে গেছে?'

আমি উত্তেজিত হলাম না। 'না, ইচ্ছাটা আছে। আমার ধারণা, খুব তাড়াতাড়িই মুক্তি পাব।'

'সেকি! আপনি একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, আপনার সঙ্গ থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন? আপনি চলে গেলে টমাস রসের কাছ থেকে পাওয়া সূত্রগুলো নিয়ে কার সঙ্গে আলাপ করব আমি? দূর, আপনি আসলে আমার সঙ্গে কৌতুক করছেন, তাই না?'

ওরা ভাবছে টমাস রসের আবিষ্কার সম্পর্কে অনেক কিছু জানি আমি। সে-সব কথা আদায় করার জন্যেই রসের সঙ্গে আমাকেও অপহরণ করা হয়েছে। এখনও আমাকে বাঁচিয়ে রাখারও সেটাই কারণ। আরেকটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝলাম, টমাস রস নিজের আবিষ্কার সম্পর্কে সব কথা ওদেরকে বলেননি। সেরকোর প্রশ্নের উত্তরে আমি শুধু বললাম, 'না, আমি মোটেও কৌতুক করছি না।'

'আপনার জায়গায় আমি হলে কিন্তু এই জায়গা ছেড়ে পালাবার চিন্তা করতাম না, মঁশিয়ে সিমোন আর্‌ৎ...'

আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইলাম, 'আমি গেডন নই, সিমোন আর্‌ৎ, এটা তোমরা জানলে কিভাবে?'

'জেনেছি বলতে পারেন ভাগ্যগুণে। আপনি আগে যে কোম্পানিতে চাকরি করছিলেন, সেই কোম্পানির সঙ্গে আমাদের একবার ব্যবসা করতে হয়েছিল। ওখানেই আপনাকে দেখি প্রথমবার। পরে আবার যখন হেলথফুল হাউসে দেখলাম, চিনতে কোন অসুবিধে হয়নি আমার। তখনই সিদ্ধান্ত নিই, এব্বায় আপনাকে সহযাত্রী হিসেবে পেতেই হবে।'

প্রসঙ্গ পাল্টে প্রশ্ন করলাম, 'টমাস রস এখন তাহলে তোমাদের হাতের পুতুল, তাই না? তার ফুলগুরেটর রহস্য সবই তোমরা জেনে ফেলেছ?'

'জেনেছি তো বটেই, তবে কয়েক কোটি ডলারের বিনিময়ে। অবশ্য ডলার

আমাদের জন্যে কোন সমস্যা নয়। ইচ্ছা করলেই যত খুশি নিয়ে আসতে পারি আমরা। আপনি তো জেনেই ফেলেছেন যে কের কারাইয়ে দস্যু সর্দার, আর আমরা তাঁর শিষ্য জলদস্যু। কাজেই উনি যে দাম চেয়েছেন আমরা তাতেই রাজি হয়ে গেছি।'

'বেশ, টমাস রস ফুলগুরেটরের উপযুক্ত দাম পেলেন। কিন্তু টাকাটা ওনার কি কাজে লাগবে? খরচ করতে না পারলে ওই টাকার মূল্য কি?'

'এ প্রসঙ্গটা তাঁর মাথায় আসেইনি। রস আসলে এই মুহূর্তে, অর্থাৎ বর্তমান ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে উদ্বিগ্ন নন। আমেরিকার কারখানায় ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি হচ্ছে, আর এখানে উনি রাসায়নিক উপকরণ মিশিয়ে বিস্ফোরক বানাচ্ছেন। ভাই রে, কি একখানা মারণাস্ত্র আবিষ্কার করেছেন ভদ্রলোক! পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয়, গতি কি হবে তাও ঠিক করে নিতে পারে, টার্গেটের যত কাছাকাছি পৌঁছাবে গতিও তত বাড়তে থাকবে। যে ফুয়েল বা জ্বালানি তিনি আবিষ্কার করেছেন, সেটা যত পুড়বে তত বেশি করে জ্বলবে। কোন সন্দেহ নেই যে সমরবিদ্যায় এটা একটা যুগান্তর...'

'কিন্তু ওটার রহস্য টমাস রস কাউকে কোনদিন বলেননি।'

'না, কাউকে বলেননি। শুধু আমাদেরকে বলেছেন।' সেরকো হাসল। 'তবে শুধু যে টাকা দিয়ে তাঁকে আমরা দলে টেনেছি, তা কিন্তু নয়। তিনি স্পর্শকাতর মানুষ, আমরা তাঁর ভেতর প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি।'

'প্রতিশোধের আগুন?' আমি হতভম্ব। 'মানে?'

'যারা তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে, যাদের কারণে তাঁকে ভিখিরির মত দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিশোধ নেবেন না? এক সময় নিজের দেশকে তিনি ভালবাসতেন, কিন্তু এখন দেশপ্রেমের ছিটেফোঁটাও তাঁর ভেতর অবশিষ্ট নেই। এই মুহূর্তে তার একটাই লক্ষ্য—দুনিয়াটাকে শত্রু জ্ঞান করে প্রতিশোধ গ্রহণ। সত্যি কথা বলতে কি, মঁশিয়ে সিমোন আর্‌ৎ, আমেরিকা ও ইউরোপের সরকারগুলো ফুলগুরেটর না কিনে অক্ষমনীয় বোকামির পরিচয় দিয়েছে।' এরপর ফুলগুরেটর সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল সেরকো। সবশেষে বলল, 'সত্যি, মঁশিয়ে আর্‌ৎ, ধ্বংস করার এমন প্রচণ্ড ক্ষমতা আর কোন অস্ত্রের নেই। দুনিয়ার যেখানে যত গোলা-বারুদ আছে তারচেয়ে হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী এই ফুলগুরেটর। নিক্ষেপ করার জন্যে আলাদা কিছুরও দরকার হয় না, অস্ত্রটা নিজের ডানার ওপর ভর করেই আকাশে উঠে যেতে পারে।'

ইচ্ছা করেই আমি চুপ করে আছি। মনে আশা ফুলগুরেটর বানাবার সূত্রটা সেরকো হয়তো বলে ফেলবে। কিন্তু আমারই ভুল, অত বোকা নয় সে।

সারাক্ষণ বকবক করলেও আসল কথার ধার দিয়েও গেল না।

অগত্যা আমাকে জিজ্ঞেস করতে হলো, 'টমাস রস কি বিস্ফোরকের উপাদান আর মাত্রা সম্পর্কে তোমাদের জানিয়েছেন?'

'বলেছেন বৈকি। উপাদানগুলো কেনাও হয়েছে বেশি করে। সব আমরা গুদামে রেখে দিয়েছি।'

'এত বিস্ফোরক এক জায়গায় রাখছেন? দুর্ঘটনা ঘটলে তো···'

সেরকো বলল, 'না-না, চিন্তার কিছু নেই। বিশেষ ধরনের ডেটোনেইটর ছাড়া কিছুই ফাটবে না। এমনকি সংঘর্ষ বা আগুনও বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে না।'

'টমাস রস কি তাহলে ডেটোনেইটরের সূত্রও বিক্রি করে দিয়েছেন?'

'না করলেও করবেন!' সেরকোর ঠোঁটে আবার সেই শ্লেষমেশানো হাসিটা ফিরে এল। 'তবে, কোন ভয় নেই, মঁশিয়ে আর্‌ৎ। আমরাও চাই না গহ্বরসহ সবাই বিস্ফোরণে উড়ে যাই। এখনও প্রচুর টাকা-কড়ি লুঠপাট করা বাকি আছে কিনা। আরও কয়েকটা বছর কাটুক, তারপর জমানো টাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেব—সবাই বিপুল বিত্তের মালিক হবে, যার যেমন খুশি জীবনটাকে উপভোগ করতে পারবে। ভাগ-বাঁটোয়ারার ঠিক আগে কের কারাইয়ে অ্যান্ড কোম্পানির কোন অস্তিত্ব থাকবে না। অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা হবে, কেউ যাতে আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করতে না পারে। অবশ্য এক আপনিই শুধু অভিযোগ করতে পারেন, কারণ আমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে আপনি ছাড়া আর কেউ কিছু জানে না। আপনাকে নিয়ে কি করা হবে, সেটা ওই ভাগ-বাঁটোয়ারার সময়ই চিন্তা করে দেখব আমরা।'

সেরকো বলতে চাইছে, আমাকে ওরা বছরের পর বছর এখানে আটকে রাখবে। অবশ্য এটা নিয়ে পরে দুশ্চিন্তা করলেও চলবে। এই মুহূর্তে যা বোঝা যাচ্ছে, টমাস রস তাঁর আবিষ্কৃত বিস্ফোরক কের কারাইয়ে অ্যান্ড কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দিলেও ডেটোনেইটরের সূত্র এখনও গোপন রেখেছেন। আর ডেটোনেইটর ছাড়া ওই বিস্ফোরকের কোন মূল্যই নেই।

সেরকোকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি কিনেছ সেটা কি যাচাই করে দেখেছ? টমাস রস তোমাদেরকে বোকা বাননি তো?'

'আমাদের স্বার্থ সম্পর্কে আগ্রহ দেখাচ্ছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ, মঁশিয়ে আর্‌ৎ। তবে না, আমাদেরকে কেউ বোকা বানাতে পারবে না। কি কিনেছি তার পরীক্ষা অবশ্যই করা হয়েছে। কেন, কাল রাতে আপনি শব্দ পাননি? একবার নয়, কয়েকবার পরীক্ষা চালানো হয়েছে। মঁশিয়ে রস যে বিস্ফোরক আবিষ্কার করেছেন তার ছোট্ট কয়েকটা দানা ফাটাতেই ভোজবাজির মত প্রকাণ্ড সব পাথর

একেবারে পাউডার হয়ে গেল।'

রহস্যটা এতক্ষণে পরিষ্কার হলো।

'এই বিস্ফোরকের যে কি ক্ষমতা, সে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, মঁশিয়ে আর্‌ৎ। অতি ক্ষুদ্র একটা দানার যদি এত শক্তি হয়, কয়েক টন ওজনের একটা বিস্ফোরক ফাটালে কি ঘটবে? আমার স্থির বিশ্বাস, এই গ্রহ ধুলো হয়ে মহাশূন্যে উড়ে যাবে। যে অস্ত্র পৃথিবীটাকেই উড়িয়ে দিতে পারে, সেই অস্ত্র দিয়ে যে দূরের জাহাজ ধ্বংস করতে পারব এ কি আর বলার অপেক্ষা রাখে। তবে এই আবিষ্কারের একটা দুর্বল দিকও আছে। সেটা হলো লক্ষ্যভেদ।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'অনেক চেষ্টা করেও তাগ ঠিক করা যাচ্ছে না,' বলল সেরকো। 'তবে এ নিয়ে আমরা খুব যে দুশ্চিন্তায় আছি, তা নয়। ত্রুটি যখন আছে, সেটা দূর করার উপায়ও নিশ্চয় পাওয়া যাবে।' হঠাৎই খেয়াল হয়েছে তার, বেশি কথা বলে গোপন একটা তথ্য ফাঁস করা হয়ে গেছে, কাজেই চুপ করে গেল সে। একটু পর প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'তো যে কথা আগেও একবার বলেছি, মঁশিয়ে আর্‌ৎ—নিজের নিয়তির সঙ্গে লড়বেন না। মনে কোন ক্ষোভ পুষে না রেখে এখানকার পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিন। তাতেই আপনার মঙ্গল। ইচ্ছা করলেই পাতালপুরীর এই নিরিবিলি জীবন আপনি উপভোগ করতে পারেন। এ এমন এক পরিবেশ, স্বাস্থ্যবানরা আরও শক্তি পায়, দুর্বলরা নতুন করে সতেজ হয়ে ওঠে। আপনার শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী টমাস রসের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে। মেনে নিন, ভাগ্যকে মেনে নিন, সেটাই আপনার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

আমার প্রতি সেরকোর এই বিদ্রূপ আর তাচ্ছিল্য কোনদিন আমি ভুলব না। বিদায় নেয়ার আগে যে হাসিটা সে হাসল, চতুর শিয়ালের মত লাগল তাকে, রাগে যেন আগুন ধরে গেল আমার শরীরে। ভাবলাম, সুযোগ আসুক, এঁর প্রতিদান ঠিকই তাকে বুঝিয়ে দেয়া হবে। তবে তার সঙ্গে কথা বলে আমারই লাভ হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য জানা গেছে। তা হলো, টমাস রসের অস্ত্র লক্ষ্যভেদে নিখুঁত নয়। অন্তত এখনও নয়।

**আজ অগাস্টের বিশ।**

গত দু'দিন গুরুত্বপূর্ণ কিছুই তেমন ঘটেনি। রোজকার হাঁটার সীমা বাড়িয়েছি আমি, এখন প্রতিবার ব্যাকাপের সেই একেবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলে যাই। রাতে পিলার বা থামগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বৈদ্যুতিক আলো জ্বললে তার আলোয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে পড়ি। হই

আমি বন্দী, তবু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমার মনে ঐশ্বরিক অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। এখনও যে আমি বেঁচে আছি, সেজন্যে ঈশ্বরের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তবে হাঁটার সময় রোজই খুঁজে দেখি কোথাও কোন ফাঁক-ফোকর আছে কিনা। একটা ফাটল আছে, সেই ফাটল দিয়ে এই ভূগর্ভের কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া যায়, এমনটা কি হতে পারে না? মাঝেমধ্যেই ভাবি, এখান থেকে পালিয়ে যাবার পর কি করব আমি।

এখান থেকে পালাতে পারলেও, তীরে কোথাও বসে কোন জাহাজের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। ওদিকে আমি অপেক্ষা করব, আর এদিকে এরা জেনে যাবে যে আমি পালিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে আমার খোঁজে ছুটবে ওরা।

না, পালাতে হলে এব্বার একটা নৌকা নিয়ে পালাতে হবে। নৌকার সুবিধে হলো ওটা আমাকে খোলা সাগরে নিয়ে যেতে পারবে। খোলা সাগরে কাউকে খুঁজতে হলে সময় লাগবে। ততক্ষণে চ্যানেল পেরিয়ে আমি যদি বারমুডায় পৌঁছাতে পারি···

রাত তখন ন'টা, একটা পিলারের পাশে বালির ওপর শুয়ে আছি। এটা হ্রদের পুব দিক, মৌচাক থেকে প্রায় দুশো হাত দূরে। হঠাৎ কানে এল পায়ের শব্দ, সেই সঙ্গে কথা বলার আওয়াজ। তাড়াতাড়ি আড়াল নিয়ে কান পাতলাম।

গলার আওয়াজই বলে দিল দু'জন লোক কথা বলছে। একজন কের কারাইয়ে, আরেকজন সেরকো। ব্যাকাপে ইংরেজিই বেশি চলে, ওরাও এই মুহূর্তে ইংরেজিতে কথা বলছে। একটু মনোযোগ দিতেই বুঝতে পারলাম ওদের আলাপের বিষয় রস আর তাঁর ফুলগুরেটর। তবে লক্ষ করলাম, প্রসঙ্গ থেকে বারবার সরেও যাচ্ছে।

'আর খুব বেশি হলে আটদিনের মধ্যেই এব্বা নিয়ে রওনা হব,' বলল কের কারাইয়ে। 'ইতিমধ্যে আশা করি ভার্জিনিয়ার কারখানায় আমাদের জিনিসগুলো তৈরি হয়ে যাবে।'

'আনুষঙ্গিক টুকিটাকি জিনিসগুলো হাতে আসুক, জোড়া লাগাতে খুব বেশি সময় লাগবে না,' সেরকোর কণ্ঠস্বর। 'তারপর বাকি থাকবে একটা লঞ্চিং প্যাড তৈরি করা—ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার একটা মঞ্চ আর কি। তবে তার আগে আরও একটা কাজ আছে।'

'কি কাজ?'

'পাঁচিলে, দ্বীপের পাঁচিলে একটা টানেল বানাতে হবে।'

'পাঁচিলের গোড়ায় টানেল?'

'এই টানেল বা সুড়ঙ্গ খুব সরু আর ছোট হবে, প্রতিবার যাতে মাত্র একজন ঢুকতে পারে। বাইরের দিকের মুখে পাথর চাপা দিতে হবে, তাহলেই কেউ আর

দেখতে পাবে না।'

'কিন্তু ওই টানেল আমাদের কি কাজে লাগবে, সেরকো?' অবাক হয়ে জানতে চাইল কের কারাইয়ে।

'এ হলো যাকে বলে সাবধানের মার নেই,' জবাব দিল সেরকো। 'পানির নিচে ওই একটাই তো টানেল, তাই না? পানির ওপরও একটা থাকা দরকার। কখন কি হয়।'

কের কারাইয়ে বলল, 'কিন্তু পাঁচিলগুলো পাথর দিয়ে তৈরি, সেরকো। অসম্ভব পুরু আর শক্ত।'

সেরকো হাসল। 'হোক না পুরু আর শক্ত, আমাদের হাতে রসের আবিষ্কার বিস্ফোরকের দানা রয়েছে কি করতে! দু'একটা দানা ফাটালেই টানেল তৈরি হয়ে যাবে।'

সেরকোর কথা শুনে আমার মন আনন্দে নেচে উঠল। কে জানে, নিজেদের অজান্তে ওরা হয়তো আমাকে পালাবার পথ করে দিচ্ছে।

কের কারাইয়ে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ, হোক একটা টানেল। কোন জাহাজ হামলা করলে কাজে লাগবে। তবে হামলা করার আগে তো ওদেরকে জানতে হবে যে আমাদের এই আস্তানাটা কোথায়।'

'কেউ জানিয়ে দিতে পারে।'

'কি বলছ তুমি, সেরকো! দলে এমন লোক একজনও নেই যে আমার সঙ্গে বেঈমানী করবে। তবে সিমোন আর্‌ৎ, এই লোকটা···'

'সিমোন আর্‌ৎ কাউকে কিছু জানাবে কিভাবে? তার আগে এখান থেকে তো তাকে বেরুতে হবে। লোকটাকে কিন্তু আমার খারাপ লাগে না। সে-ও এঞ্জিনিয়ার, আমিও এঞ্জিনিয়ার। আরও দু'একবার কথা বলে দেখি, তার সঙ্গে হয়তো একটা সমঝোতায় আসতে পারব। তখন পেটের কথা আদায় করতে কোন সমস্যা হবে না।'

'হ্যাঁ, জানার চেষ্টা করো কতটুকু কি গোপন তথ্য জানে সে,' বলল কাউন্ট দার্তিগাস ওরফে দস্যুসর্দার কের কারাইয়ে। 'তারপর, সব কথা জেনে নিয়ে, ব্যাটাকে খতম করে দাও।'

'এ-সব নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না,' সর্দারকে আশ্বস্ত করল সেরকো। 'সময়মত যা করার দরকার আমিই করব।'

'সেরকো, এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ,' ভারী গলায় বলল কের কারাইয়ে। 'বিস্ফোরক কি করে বানাতে হয় তা তো আমরা এখন জানি, বাকি শুধু কি করে ডেটোনেইটর বানাতে হয় সেটা জানা। এটা জানতে পারলেই কেল্লা ফতে। যত দাম দিতে হয় দেব···'

সায় দিয়ে সেরকো বলল, 'হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে জরুরী। বহু চেষ্টা করেছি, কোন লাভ হয়নি। রস ভুলেও এ-প্রসঙ্গে কিছু বলে না। তবে টেস্ট করার জন্যে কয়েকটা ডেটোনেইটর বানিয়ে দিয়েছিল। টানেল বানাবার জন্যে চাইলে নিশ্চয়ই আরও কয়েকটা বানিয়ে দেবে।'

'কিন্তু আমাদের অভিযানের কি হবে?' জানতে চাইল কের কারাইয়ে।

'ধৈর্য ধরুন। আগে আমরা নিজেরা রস্-ফুলগুরেটর বানাতে শিখে নিই।'

আলাপ শেষ করে চলে গেল ওরা।

**আজ অগাস্টের একুশ।**

সকালবেলাই টের পেলাম, টানেলের জন্যে জায়গা নির্বাচন করতে গেল সেরকো। তার পিছু নিয়ে দেখে এলাম জায়গাটা। মৌচাকের উত্তর দিকের দেয়ালটাই পছন্দ করল সে।

**আজ অগাস্টের উনত্রিশ।**

সকালে আমার সামনেই রওনা হলো ডুবোজাহাজ। সন্দেহ নেই আমেরিকার উপকূল থেকে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো আনতে যাচ্ছে। যাবার আগে বেশ কিছুক্ষণ সেরকোর সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করল কের কারাইয়ে। হয়তো আমার সম্পর্কেই কিছু নির্দেশ দিয়ে গেল। সেরকো যাচ্ছে না, তবে ক্যাপটেন স্পেড আর এব্বার মাল্লাদেরকে সঙ্গে নিল কের কারাইয়ে।

বেলা গড়িয়ে বিকেল হলো, কিন্তু ডুবোজাহাজটা এখনও ফিরল না। এবার বোধহয় এব্বার সঙ্গেই গেছে ওটা। কে জানে, এ-যাত্রায় হয়তো লুঠপাটও চালাবে ওরা।

## তেরো

তেরো দিন পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ এব্বা ফিরছে না। আমার মনে সংশয় জাগছে। এব্বা ব্যাকাপের কাছাকাছি কোথাও লুঠতরাজে ব্যস্ত নয় তো? দূর, না, তা কি করে হয়! ভার্জিনিয়ার কারখানায় কয়েকদিন আগেই ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি হয়ে গেছে, কাজেই প্রথমে সেগুলোই আনতে যাবে কের কারাইয়ে। কিন্তু তাহলে ফিরতে তার এত দেরি হবে কেন?

এ-ব্যাপারে সেরকোর যেন কোন মাথাব্যথা নেই। তার মুখে হাসিটি

লেগেই আছে, আমাকে দেখে আরও যেন খুশি হয়ে ওঠে। তবে আমি তার গায়ে পড়া ভাবটাকে ভাল চোখে দেখছি না। দেখা হলেই অভিবাদন জানায়, সবিনয়ে কুশল জিজ্ঞেস করে। পরামর্শ দিয়ে বলে, নিজেকে আমি যেন এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিই। আজকাল আমাকে 'আলিবাবা' বলে ডাকছে। কৌতুকেরও একটা সীমা থাকা দরকার! তার বক্তব্য হলো, 'আরব্য রজনী' ছাড়া আর কোথাও নাকি এখানকার মত রহস্যময় গুহা নেই। তার আরও বক্তব্য—আমি নাকি এখানে মোনাকোর যুবরাজের চেয়েও সুখে আছি। খাচ্ছি-দাচ্ছি, গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোন খরচ নেই, কোন পরিশ্রম নেই, কাউকে ট্যাক্স দিতে হয় না—এরচেয়ে মজার জীবন আর কি হতে পারে!

রাগ চেপে চুপ করে শুনি আমি। হয়তো একটু কাঁধ ঝাঁকাই। কিন্তু তর্ক বা প্রতিবাদ করি না।

এব্বা রওনা হবার পর প্রথম ক'দিন টমাস রসকে দেখতে পাইনি। ল্যাব থেকে বেরুলে তো দেখব। ওখানে তিনি প্রচণ্ড পরিশ্রম করছেন, তা বেশ বোঝা যায়। তাঁর কাছ থেকে আমি একটা জিনিসই আশা করি–যত লোভই দেখানো হোক, ডেটোনেইটর বানাবার কৌশলটা তিনি জলদস্যুদের বলবেন না। কে জানে আমার এই আশা পূরণ হবে কি না।

সেপ্টেম্বরের আজ তেরো তারিখ। রসের আবিস্কৃত বিস্ফোরক কতটা শক্তিশালী নিজের চোখেই দেখার সুযোগ হলো। ডেটোনেইটর জিনিসটা কি, কিভাবে সেটা কাজ করে, তাও দেখলাম।

সেরকোর নির্দেশে তার লোকজন সকালবেলাই টানেল বানাবার কাজে হাত দিল। শ্রমিকরা কাজ শুরু করল পাঁচিলের নিচের দিকে। ওখানকার চুনাপাথর এত নিরেট আর শক্ত যে গ্র্যানিট পাথর বলে মনে হলো। প্রথমে চালানো হলো শাবল। তবে পুরো কাজটা ওই শাবল দিয়ে সারতে চাইলে অমানুষিক পরিশ্রমই সার হত, কাজের কাজ কিছু হত না। তাতে পাথর ভাঙার কাজ এত ধীরগতিতে এগোত যে বাধ্য হয়ে হাল ছেড়ে দিত শ্রমিকরা। কারণ হলো, ভিতের কাছে ওই নিরেট পাথর চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত পুরু।

শাবল দিয়ে যে কাজটা করতে দিনের পর দিন লাগত, রসের বিস্ফোরকের সাহায্যে তা ওরা সেরে ফেলল চোখের পলকে। অতি সামান্য বিস্ফোরক ব্যবহার করা হলো, তাতেই পাথর একেবারে গুঁড়ো করে ফেলা হলো—এত গুঁড়ো, যেন ফুঁ দিলে উড়ে যাবে। এক কথায়, অবিশ্বাস্য ব্যাপার। বিস্ফোরকের মাত্র ছ'টা দানার এত শক্তি দেখে আমি বিস্ময়ে একেবারে পাথর হয়ে গেলাম। হঠাৎ স্থানচ্যুত হলো বাতাস, তারপরই শোনা গেল গুলি ছোঁড়ার মত একটা আওয়াজ,

বেশ খানিকটা ধুলো উড়ল, সেই ধুলো সরে যেতে দেখি এক ঘন গজ একটা ফাটল তৈরি হয়েছে। বিস্ফোরকের প্রথম দানাটা ব্যবহার করার সময় কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল কয়েকজন শ্রমিক, বিস্ফোরণের আওয়াজের সঙ্গে ছিটকে পড়ল তারা, একেবারে পপাত ধরণীতল। তাদের মধ্যে দু'জনের জখম গুরুতর। ছিটকে পড়েছে সেরকোও, তার গায়ের চামড়া বেশ কয়েক জায়গায় কেটে গেছে।

এরপর টমাস রস নিজেই এগিয়ে এলেন। ছোট্ট একটা কাঁচের টিউব দেখলাম তাঁর হাতে, ভেতরে তেলের মত নীল রঙের তরল পদার্থ। জিনিসটা কি জানি না, তবে বলা হলো বাতাসের সংস্পর্শে এলেই ওটা জমে যাবে। সদ্য তৈরি গর্তের মুখে ওই নীল তরল পদার্থ কয়েক ফোঁটা ঢাললেন তিনি, তারপর শান্ত ভঙ্গিতে পিছিয়ে এলেন। লক্ষ করলাম, বিস্ফোরকের সঙ্গে জিনিসটা মিশতে পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড সময় লাগল। কিন্তু ওই সময়টা পার হবার পর যে বিস্ফোরণটা ঘটল, তার বিধ্বংসী ক্ষমতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি। আমার আর কোন সন্দেহ থাকল না যে প্রচলিত সমস্ত বিস্ফোরকের চেয়ে টমাস রসের আবিস্কৃত বিস্ফোরক হাজার হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী।

এই নতুন বিস্ফোরকের মাত্র কয়েকটা দানা দিয়ে, যে দানা গমের চেয়ে আকারে বড় নয়, টানেলটা তৈরি করতে খুব বেশি হলে এক হপ্তা লাগবে। কিন্তু শাবল দিয়ে এই একই কাজ করতে কতদিন লাগত কে বলবে!

**উনিশ সেপ্টেম্বর।**

বেশ কিছুদিন ধরে খেয়াল করছি, জোয়ার ও ভাঁটার সময় টানেলের ভেতর পানি এত দ্রুত ঢুকতে বা বেরুতে চায়, বিপরীত দিকে চব্বিশ ঘণ্টায় দু'বার প্রবল আলোড়ন ওঠে। এ থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না ভাঁটার সময় পানিতে যদি কিছু ভেসে থাকে সেটা টানেল হয়ে সমুদ্রে বেরিয়ে যাবে। তবে টানেলের মুখের ওপরের অংশ ভেসে উঠলেই এটা সম্ভব। দু'দিন পর ক্রান্তিলগ্ন, ভাটার টান অন্যান্যবারের চেয়ে বেশি থাকবে। সেদিন দেখতে হবে মুখটা বেরিয়ে পড়ে কি না।

ওই সুড়ঙ্গ বা টানেল দিয়ে আমার হয়তো পালানো সম্ভব নয়, কিন্তু ভাঁটার সময় পানিতে একটা বোতল ফেললে সেটা নিশ্চয়ই টানেল হয়ে খোলা সাগরে চলে যাবে। তখন সেটা কোন জাহাজ থেকে দেখা যেতে পারে। দেখতে পেলে জাহাজের লোকেরা কি আর সেটা তুলবে না! আর আমি যদি একটা কাগজে নিজের অবস্থার কথা জানিয়ে কিছু লিখে কাগজটা বোতলে ভরে দিই···

তবে কিছু সমস্যাও আছে। টানেল দিয়ে যাবার সময় পাথরে বাড়ি খেয়ে

বোতলটা ভেঙেও যেতে পারে। বোতল ভাঙতে পারে, কিন্তু পিপে? পিপের মুখটা শক্ত ভাবে বন্ধ করে ভাসিয়ে দিলে আর কোন সমস্যা নেই।

**সেপ্টেম্বরের বিশ তারিখ।**

সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে গুদাম ঘরে ঢুকেছিলাম আজ। এই স্টোররুমেই ওদের সব লুঠের মাল রাখা হয়। এদিক ওদিক তাকাতেই কাঠের ছোট্ট একটা বাক্স পেলাম। শার্টের তলায় লুকিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে এলাম ওটা।

কাগজ-কলম বা কালির কোন অভাব নেই আমার। গত তিন মাস ধরে যা কিছু ঘটছে সবই তো প্রতিদিন একটু একটু করে লিখে রাখছি। একটা কাগজ টেনে নিয়ে খসখস করে দ্রুত লিখতে শুরু করলাম—

'পনেরো জুন রাতে বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী টমাস রস আর তাঁর শুশ্রূষাকারী গেডন ওরফে সিমোন আর্‌ৎকে অপহরণ করা হয়েছে। সে-সময় ওঁরা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-ক্যারলিনের নিউবার্নে, স্যানাটরিয়াম হেলথফুল হাউসে ছিলেন। অপহরণ করার পর ওঁদেরকে কাউন্ট দার্তিগাসের ইয়ট এব্বায় তোলা হয়। বর্তমানে ওঁরা তথাকথিত ওই কাউন্টের হাতে বন্দী জীবনযাপন করছেন। কাউন্ট দার্তিগাস আসলে একজন জলদস্যু, তার আসল নাম কের কারাইয়ে, সে আর তার দলের দস্যুরা পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর জুড়ে জাহাজ লুঠ করে বেড়ায়। একটা দ্বীপের ভেতর বিশাল গহ্বর এই জলদস্যুদের গোপন আস্তানা। বিপদের কথা হলো, টমাস রসের আবিস্কৃত ভয়ানক মারণাস্ত্র ফুলগুরেটর হাতে পেলে কের কারাইয়ে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে, সেই সঙ্গে তার মনে জেগে উঠবে সাত সমুদ্র নিয়ন্ত্রণ করার বাসনা। কাজেই, যে-সব দেশের স্বার্থে কের কারাইয়ে আঘাত হানতে পারে তাদের কর্তব্য হলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার গোপন আস্তানাটা ধ্বংস করা। গোপন আস্তানটা ব্যাকাপ দ্বীপের একেবারে মাঝখানে, কৃত্রিম ধোঁয়া আর আওয়াজ শুনে অনেকেই সেটাকে সুপ্তোত্থিত আগ্নেয়গিরি বলে ভুল করে। দ্বীপটা বারমুডার পশ্চিম প্রান্তের শেষ সীমায় অবস্থিত। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক পুরোপুরি খোলা, শুধু পুবদিকে পাথুরে পাঁচিল আছে।

গহ্বরের ভেতর ঢোকার মাধ্যম হলো একটা আন্ডারওয়াটার টানেল। পানির সারফেস থেকে কয়েক গজ নিচেই টানেলটার মুখ। ব্যাকাপের ভেতর ঢুকতে হলে অবশ্যই একটা ডুবোজাহাজ দরকার হবে। তবে উত্তর পশ্চিম দিকের পাঁচিল ভেঙে নতুন আরেকটা টানেল তৈরি করা হচ্ছে।

তথাকথিত কাউন্ট একটা ডুবোজাহাজ বানিয়েছিল। রটিয়ে দেয়া হয় পরীক্ষা করার সময় চার্লসটন উপসাগরে ডুবে গেছে সেটা। কাউন্ট, অর্থাৎ

জলদস্যু কের কারাইয়ে, এই মুহূর্তে সেই ডুবোজাহাজে আছে। এটার সাহায্যেই তারা টানেলে ঢোকে ও টানেল থেকে বেরোয়। স্কুনার এব্বাকেও ওটা সমুদ্রের এদিক ওদিক টেনে নিয়ে যায়। ব্যাকাপ দ্বীপেই একটা খাঁড়িতে, বিরাট পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয় এব্বাকে।

ব্যাকাপে নামতে হলে পশ্চিম দিকটাই ভাল, যেদিকটায় একসময় বারমুডার জেলেরা বসবাস করত। ভেতরে ঢোকার জন্যে ডিনামাইট ফাটিয়ে পাথর ভেঙে পথ করে নিতে হবে। তবে এ-কথাও মনে রাখা দরকার যে অকস্মাৎ হামলা করা হয়েছে দেখে কের কারাইয়ে টমাস রসের আবিষ্কৃত বিস্ফোরক ব্যবহার করে বাধা দিতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি, ফুলগুরেটরের ধ্বংস করার ক্ষমতা যে কোন প্রচলিত বিস্ফোরকের চেয়ে অন্তত হাজার গুণ বেশি। তবে এর প্রভাব খুব বেশি হলে মাইলখানেক পর্যন্ত। সতেরোশো গজের বাইরে এটার প্রভাব খুব একটা টের পাওয়া যাবে না। আজ সেপ্টেম্বর মাসের বিশ তারিখ, জরুরী বার্তাটি লিখে আমি নিজের নাম সই করছি। সিমোন আর্‌ৎ, এঞ্জিনিয়ার।'

বার্তার সঙ্গে একটা নকশাও এঁকে দিলাম, তাতে গহ্বর, হ্রদ, মৌচাক, কের কারাইয়ের বাসস্থান, টমাস রসের ল্যাবরেটরি, আমার ঘর ইত্যাদি সবই থাকল।

রেশমি কাপড়ে জড়িয়ে কাগজটা বাক্সে রাখলাম। ছোট্ট বাক্স, মাত্র ছ'ইঞ্চি লম্বা আর তিন ইঞ্চি চওড়া, ঢাকনির কিনারায় লোহার কব্জা বসানো আছে। বাক্সটা ওয়াটারপ্রুফ, বেশ মজবুতও।

রাত ধীরে ধীরে বাড়ছে। সোয়া ন'টায় ভাঁটা, তাই সাড়ে আটটায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। তীরে কাউকে দেখলাম না। টানেল যেখানে শুরু, সেই পাথরটা লক্ষ্য করে এগোলাম। সারির শেষ বৈদ্যুতিক আলোয় দেখলাম টানেলের খিলান আকৃতির মুখ পানির ওপর ভেসে উঠেছে। মুখ দিয়ে সবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে পানি। বাক্সটা সেই পানিতে ছেড়ে দিলাম। আমার একমাত্র আশাকে নিয়ে হ্রদের পানি টানেল দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল ওটা।

## চোদ্দ

আজ সেপ্টেম্বরের পঁচিশ।

সকালে হঠাৎ হ্রদের পানিতে ভেসে উঠল ডুবোজাহাজটা। জেটিতে সদলবলে উদয় হলো জলদস্যু কের কারাইয়ে। এব্বা প্রচুর মালপত্র নিয়ে এসেছে, মাল্লারা সে-সব খালাস করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। মালপত্রের মধ্যে

রয়েছে কয়েক বস্তা খাদ্যদ্রব্য, কয়েক বাক্স মাংস, মদ ভর্তি বেশ কিছু পিপে আর বিজ্ঞানী রসের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস ভর্তি পাঁচ-সাতটা বাক্স। সবশেষে মাল্লারা ক্ষেপণাস্ত্রের আলগা কিছু কলকব্জা নামাল, সেগুলো দেখতে থালা আকৃতির।

ক্ষেপণাস্ত্রের কলকব্জা নামাবার সময় টমাস রস নিজে জেটির একপাশে উপস্থিত থাকলেন। দেখে মনে হলো তাঁর চোখ দুটো যেন জ্বলছে। একটা যন্ত্র হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরখ করলেন। মাথা ঝাঁকানোর ভঙ্গি দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না যে তিনি সন্তুষ্ট। আমি লক্ষ করলাম, তাঁর হাবভাবে মানসিক অসুস্থতার এখন আর কোন চিহ্নই নেই। তাঁর রোগটা সম্ভবত পুরোপুরিই সেরে গেছে।

সন্তুষ্টচিত্তে নৌকায় উঠে বসলেন রস। সেরকো তাঁকে ল্যাবরেটরি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গেল।

ফেরার পর সেরকোর সঙ্গে কথা বলার তেমন সময় পায়নি কের কারাইয়ে, সেটা পুষিয়ে নিল বিকেলে মৌচাকের সামনে পায়চারি করার সময়। ইতিমধ্যে নতুন টানেলটা তৈরি হয়ে গেছে, সেরকো তাকে সেটা দেখাতে নিয়ে গেল। ওদের সঙ্গে এবার ক্যাপটেন স্পেডও এসে জুটল। আমি ভাবলাম, ওদের পিছু নিয়ে যাব নাকি? গেলে অন্তত আটলান্টিকের তাজা বাতাসে বুকটা ভরে তো নিতে পারব, পালাতে না হয় নাই পারলাম।

**সেপ্টেম্বর ছাব্বিশ থেকে অক্টোবর দশ।**

টমাস রসের তত্ত্বাবধানে জোড়া লাগানো হলো ক্ষেপণাস্ত্রের কলকব্জাগুলো। তারপর সেরকোর নির্দেশে শুরু হয়েছে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের জন্যে লঞ্চিং প্যাড তৈরির কাজ। কয়েকটা ঢালু কাঠামোর সমষ্টি ওটা, ইচ্ছেমত ঘোরানো-ফেরানো যায়। এব্বার ডেকে, এবং ডুবোজাহাজ পানির সারফেসে থাকলে তার পাটাতনেও বসাতে কোন সমস্যা হবে না।

এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে জলদস্যু কের কারাইয়ে সাত সাগরের সম্রাট হতে চলেছে। ফুলগুরেটর তার হাতের মুঠোয় আগেই এসেছে, এবার তৈরি হচ্ছে ওই ভয়ংকর অস্ত্র নিক্ষেপ করার যন্ত্র। তাকে এখন আর পায় কে!

ভাবছি, আমার বার্তাটি কি কারও হাতে পড়েনি? কেউ জানে না ব্যাকাপে একদল জলদস্যু আস্তানা গেড়েছে?

**বিশ অক্টোবর।**

সকালে জেটিতে ডুবোজাহাজ নেই দেখে অবাক হলাম। কাল রাতে ব্যাটারি চার্জ

করা হয়েছে জানি, তখন ভেবেছিলাম স্রেফ তৈরি অবস্থায় থাকার জন্যেই কাজটা করছে।

এখন ডাঙার ওপরও আরেকটা টানেল আছে, কাজেই ডুবো-জাহাজ গায়েব হয়ে যাবার একটাই মানে—সাগর পাড়ি দেয়ার কোন অভিযানেই বেরিয়েছে ওটা।

বারমুডার চারপাশে এখন এটা ঝড়-ঝঞ্ঝার মরশুম। গহ্বরের ভেতর বন্দী থাকলেও, পাহাড়ের চূড়ার দিক থেকে বাতাসের তীব্র ঝাপটা এসে গায়ে লাগলে বুঝতে পারি বাইরে প্রলয়কাণ্ড ঘটছে। এরকম বিপজ্জনক সময়ে স্কুনার কি খাঁড়ি ছেড়ে বেরুবে? এরকম খারাপ আবহাওয়ায় এমনকি ডুবোজাহাজের সাহায্য নিয়েও সাগর পাড়ি দেয়া এব্বার জন্যে ঝুঁকিবহুল। কিংবা কে জানে, ডুবোজাহাজ হয়তো এব্বাকে সঙ্গে নেয়নি, একাই সাগর পাড়ি দিতে গেছে। সমুদ্রের গভীরে তো ঝড়ের তেমন কোন প্রভাব থাকে না।

সেরকো এবারও যায়নি, ব্যাকাপে রয়েছে। বাকিরা কেউ নেই—কের কারাইয়ে, স্পেড, এব্বা ও ডুবোজাহাজের মাল্লারা, সবাই দ্বীপ ছেড়ে চলে গেছে।

দিনগুলো বড় একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। নিজের ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আকাশ-পাতাল কত কি ভাবি। আমার বার্তা সহ ছোট্ট বাক্সটার কি গতি হলো কল্পনা করতে চেষ্টা করি।

টমাস রসও সারাদিন তাঁর ল্যাব ছেড়ে বেরোন না, বসে বসে ডেটোনেইটর বানান। আমার খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে যে সাত রাজার ধন সাধলেও ডেটোনেটর বানাবার কৌশলটা কাউকে তিনি শেখাবেন না। তবে তা যদি নাও শেখান, এটা প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া চলে যে নিজের আবিষ্কার তিনি কের কারাইয়েকে ব্যবহার করতে দিতে মোটেও আপত্তি করবেন না।

মৌচাকের দিকে হাঁটতে গেলে দু'একবার সেরকোর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আমাকে দেখলেই হাসি পায় তার, মুখে খই ফুটতে শুরু করে।

**আজ বাইশ অক্টোবর।**

কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে সেরকোকে আজ জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের স্কুনার কি ডুবোজাহাজের সঙ্গে গেছে?'

সে জবাব দিল, 'গেছে, মঁশিয়ে আর্‌ৎ। বাইরে আবহাওয়া সুবিধের না হলেও এব্বার জন্যে তা বিপজ্জনক নয়।'

'ওদের ফিরতে বোধহয় দেরি হবে?'

'না, ফিরে আসার সময় হয়ে গেছে। আর খুব বেশি হলে আটচল্লিশ ঘণ্টার

মধ্যে ফিরবে বলে আশা করছি। এটাই শেষ, পুরো শীতকালটা কাউন্ট দার্তিগাস ব্যাকাপ ছেড়ে কোথাও যাবেন না।'

'বেড়াতে বেরিয়েছে? নাকি কোন কাজে গেছে?'

'আমরা কাজ পাগল মানুষ, মঁশিয়ে আর্‌ৎ,' বলে ঠোঁট মুড়ে একটু হাসল সেরকো। 'ক্ষেপণাস্ত্র তো তৈরিই, এখন শুধু আবহাওয়া একটু ভাল পেলেই হয়—ব্যস, গুড়ুম!'

'যত সহজ ভাবছেন এত সহজে লুঠপাট করা সম্ভব বলে মনে করি না।'

'আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, মঁশিয়ে আর্‌ৎ, আমাদের ওপর হামলা করার জন্যে কেউ আসছে না। আমাদের এই আস্তানা খুঁজে বার করাই তো সম্ভব নয়। তার ওপর হাতে রয়েছে ক্ষেপণাস্ত্র—কোন জাহাজকে দ্বীপের কাছাকাছি আসতে ওগুলোই বাধা দেবে।'

'তা হয়তো দেবে, টমাস রস্ যদি ডেটোনেইটর বানাবার কৌশলটাও ফাঁস করে দেন।'

'আপনার কি ধারণা কৌশলটা এখনও তিনি আমাদেরকে বলেননি?' গলা ছেড়ে হেসে উঠল সেরকো।

তার হাসি আমার কানে কেমন যেন বেসুরো শোনাল, বুঝলাম তার দাবি সত্যি নয়।

**পঁচিশ অক্টোবর।**

পৈত্রিক প্রাণটা একটুর জন্যে রক্ষা পেয়েছে। ভয়ানক উত্তেজনাকর একটা ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি। আটচল্লিশ ঘণ্টা পর আবার আমি ডায়েরী লিখতে বসতে পেরেছি, এটা বিশ্বাস করতে আমার নিজেরই কষ্ট হচ্ছে। তবে এও বলে রাখি, ভাগ্য আরেকটু প্রসন্ন হলে বন্দীদশা থেকে মুক্তিও পেয়ে যেতাম। মুক্তি পেলে এতক্ষণে আমি বারমুডার কোন বন্দরে থাকতাম, ব্যাকাপ সমস্যার সমাধানও হয়ে যেত।

তাহলে খুলেই বলি কি ঘটেছিল।

কেন বলতে পারব না, তেইশ তারিখ রাতে আমার মনটা খুব অস্থির হয়ে উঠেছিল। টিকতে না পেরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার মন হয়তো আগেই টের পেয়েছিল গুরুতর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।

গহ্বরের ভেতর বাতাসের তীব্র ঝাপটা দেখে বুঝতে পারলাম, বাইরে জোরাল ঝড় বইছে। হ্রদের পানি ফুলেফেঁপে উঠছিল। কেউ কোথাও নেই, মৌচাকের পাশ ঘেঁষে হ্রদের কিনারা ধরে হাঁটছি। খুব শীত, কাজেই মৌচাক থেকে জলদস্যুরা কেউ বেরোয়নি। নতুন টানেলটার মুখের কাছে মাত্র একজন

লোক পাহারায় বসে ঘুমে ঢুলছে। সে যেখানে বসে আছে সেখান থেকে হ্রদের তীর দেখা যায় না। বাতি বলতে দুই তীরে দুটো, বাকিগুলো সব নেভানো। বলা যায় চারদিকে অন্ধকারের রাজত্ব চলছে।

ঘন ছায়ার ভেতর যেই ঢুকেছি, অমনি স্যাঁৎ করে কে যেন আমাকে পাশ কাটিয়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে ভাল করে তাকাতে টমাস রসকে চিনতে পারলাম। আমাকে তিনি দেখতে পেয়েছেন বলে মনে হলো না। কি যেন ভাবছেন, পুরোপুরি বেখেয়াল। হঠাৎ ভাবলাম, তাঁর সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করার এই সুযোগ ছাড়া যায় না। কার খপ্পরে তিনি পড়েছেন, এটা তাঁকে জানানো দরকার। বলা দরকার, কের কারাইয়ে তাঁকে যত টাকার লোভই দেখাক, সেই টাকা খরচ করার কোন সুযোগই তিনি পাবেন না। এই সব ভাবছি, এমন সময় কোত্থেকে এসে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দু'জন লোক। ধস্তাধস্তি করছি, লাফ দিয়ে সামনে পড়ল আরও একজন। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুললাম, শুনতে পেলাম—

'কোন শব্দ নয়!' তৃতীয় লোকটা ইংরেজিতে বলল। 'আপনি সিমোন আর্‌ৎ, ঠিক?'

'আগে বলুন আপনি কে? আমার নাম জানলেন কিভাবে?'

'আপনি যে ঘর থেকে বেরুলেন ওই ঘরে সিমোন আর্‌ৎ থাকার কথা।'

'আর আপনার পরিচয়?' আবার জানতে চাইলাম আমি।

'আমি রয়্যাল নেভীর লেফটেন্যান্ট ডেভন। "স্ট্যান্ডার্ড" জাহাজের একজন অফিসার। বর্তমানে বারমুডায় আছি।'

বিস্ময় ও অবিশ্বাসে বোবা হয়ে গেলাম আমি।

'টমাস রস ও আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি আমরা,' লেফটেন্যান্ট ডেভন আবার বললেন। 'আপনার পাঠানো মেসেজটা একটা দ্বীপের সৈকতে পাওয়া গেছে।'

'ছোট্ট কাঠের একটা বাক্স?'

হ্যাঁ। বুদ্ধি করে দরকারী সমস্ত বিবরণ তাতে আপনি লিখেছিলেন—কাউন্ট দার্তিগাস আর জলদস্যু কের কারাইয়ে যে একই লোক, সে-ই আপনাদেরকে অপহরণ করেছে, এই দ্বীপটা তার আস্তানা…'

'ওহ্, লেফটেন্যান্ট!'

'কিন্তু আর তো সময় নষ্ট করা চলে না…'

'ব্যাকাপের ভেতর আপনারা ঢুকলেন কিভাবে?' বিস্ময়ের ধাক্কা এখনও আমি কাটিয়ে উঠতে পারছি না।

'ঢুকেছি সোর্ড নিয়ে। সোর্ড আমাদের ডুবোজাহাজ। প্রায় ছ'মাস হলো

বারমুডায়...'

'ডুবোহাজাজ!'

'হ্যাঁ, ডুবোজাহাজ। এই মুহূর্তে সেটা ওই যে, ওই পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছি। ভাল কথা, কের কারাইয়ের ডুবোজাহাজটা দেখছি না কেন?'

'সেটা তো নেই। তিন হপ্তা আগে কোথায় যেন গেছে।'

'কের কারাইয়ে তাহলে ব্যাকাপে নেই?'

'নেই, তবে তার ফেরার সময় হয়েছে।'

'তার কথা বাদ দিন। আমাদের দরকার টমাস রসকে। আপনাদের নিয়ে সোর্ড যদি ফিরতে ব্যর্থ হয়, বারমুডা ধরে নেবে আমার মিশন সফল হয়নি, তখন এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে অন্য একজনকে পাঠাবে ওরা।'

গোটা ব্যাপারটা হজম করতে সময় লাগছে আমার।

'টমাস রস কোথায়, আপনি জানেন?' লেফটেন্যান্ট ডেভন জানতে চাইলেন।

'এইমাত্র উনি ল্যাবরেটরির দিকে গেলেন। আসুন।'

হ্রদের পাশের রাস্তা ধরে এগোলাম আমরা, লেফটেন্যান্টের দুই সঙ্গী পিছু নিল। বিশ কদম যেতেই টমাস রসের দেখা মিলল। আমাকে হকচকিয়ে দিয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা তিনজন। রস বাধা দেয়ার বা চিৎকার করার কোন সুযোগই পেলেন না। দ্রুত বেঁধে ফেলা হলো তাঁকে, তারপর পাঁজাকোলা করে আনা হলো পাথরের আড়ালে অপেক্ষারত ডুবোজাহাজ সোর্ড-এর কাছে। সব মিলিয়ে এক মিনিটও লাগেনি।

সোর্ড একেবারে ছোট্ট ডুবোজাহাজ, ওজন মাত্র বারো টন। তবে যত ছোটই হোক, এই ডুবোজাহাজই আমাদেরকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে। আনন্দে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে। যাক, এতদিনে তাহলে বিজ্ঞানী টমাস রস সত্যি সত্যি মুক্তি পেতে যাচ্ছেন। তাঁর আবিষ্কারগুলো এখন আর কের কারাইয়ে কাজে লাগাতে পারবে না।

ডুবোজাহাজে উঠলাম আমরা। ওঠার সময় আশপাশে কাউকে দেখতে পেলাম না। পোর্টহোলের ঢাকনিগুলো বন্ধ করে দেয়া হলো। পানির চৌবাচ্চাগুলোও ভরা হলো দ্রুত। ডুবোজাহাজ ডুব দিল।

সোর্ডের ভেতরটা তিনভাগে ভাগ করা। প্রথম ভাগে ব্যাটারি আর নানা ধরনের কলকব্জা। জাহাজের ঠিক মাঝখানে বসে চালক, পেরিস্কোপটা বসানো হয়েছে তার পাশেই, দু'পাশে কাঁচ লাগানো বেশ কয়েকটা পোর্টহোল, ওগুলো দিয়ে বাইরের সব দৃশ্য দেখা যায়। তৃতীয় অংশটা পিছন দিকে, গলুই। আমাকে আর রসকে এখানেই রাখা হলো।

ইতিমধ্যে রসের মুখে গোঁজা কাপড় বের করা হয়েছে, তবে হাত ও পায়ের বাঁধন এখনও খোলা হয়নি। তাঁর মুখ দেখে মনে হলো, আচ্ছন্ন বোধ করছেন, যেন বুঝতেই পারছেন না কি ঘটছে।

ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি। লেফটেন্যান্ট ডেভন সারেঙের সঙ্গে কথা বলছেন। এগিয়ে গিয়ে আমি তাঁকে বললাম, 'টমাস রস একা থাকুন। কোন সমস্যা হবে না। আমি এলাম টানেলের মুখটা আপনাদের দেখাবার জন্যে।'

'ঠিক আছে, আমার পাশে দাঁড়ান।'

ঘড়িতে তখন আটটা সাঁইত্রিশ। পানিতে বৈদ্যুতিক আলো পড়ায় সামনেটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমরা। সোর্ড এমন জায়গায় নোঙর ফেলেছিল, রওনা হবার পর পুরো হ্রদটাই পেরুতে হলো আমাদের। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরা এখন পানির কতটা নিচে?'

'প্রায় আট হাত।'

'এরচেয়ে গভীরে নামার তাহলে আর দরকার নেই। ভাঁটার সময় টানেলের মুখ দেখে রেখেছি—এই মুহূর্তে সেটার সমান্তরালেই আছি।'

'ভেরি গুড।' লেফটেন্যান্ট ডেভন একদম শান্ত, এতটুকু অস্থির বা উত্তেজিত নন। 'টানেলের ভেতর দিয়ে ঢোকার সময় মনে হচ্ছিল লম্বায় ওটা আশি হাত হতে পারে, তার বেশি নয়।'

জাহাজ ছাড়ার হুকুম দেয়া হলো। খুব ধীরগতিতে এগোচ্ছে সোর্ড, যাতে কোন পাথরে ধাক্কা না খায়। মাঝে মধ্যে শ্যাওলা ধরা কালো পাঁচিল দেখা যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে চালক। দেখতে দেখতে পাঁচ মিনিট পার হয়ে গেল, কিন্তু টানেলের মুখটা খুঁজে পাওয়া গেল না।

'পানির ওপর ভেসে উঠলে হয় না? তাহলে হয়তো আন্দাজ করতে সুবিধে হবে।'

'আমিও সেটাই ভাবছি, মঁশিয়ে আর্‌ৎ,' বললেন লেফটেন্যান্ট ডেভন। 'টানেলের মুখটা ঠিক কোনদিকে জানেন তো?'

'জানি।'

সাবধানের মার নেই, তাই সব আলো নিভিয়ে দেয়া হলো। সরগুলো চৌবাচ্চা খালি করতেই আবার পানির ওপর মাথাচাড়া দিল সোর্ড। আমি ওখানেই দাঁড়িয়ে পেরিস্কোপে চোখ লাগিয়ে সব দেখছি। তীরের আলো দেখে বুঝলাম, মৌচাকের পাশে ভেসে উঠেছে সোর্ড। 'খুব বেশি উত্তরে সরে এসেছি,' লেফটেন্যান্টকে বললাম। 'টানেলের মুখ আসলে পশ্চিম দিকে।'

'তীরে কাউকে দেখতে পাচ্ছেন?'

'না।'

'গুড। তাহলে সারফেসেই থাকা যাক। আপনি যখন বলবেন টানেলের মুখের সামনে চলে এসেছি, তখন আবার ডুব দেব।'

ঘুরে গিয়ে বিশ হাত এগোল সোর্ড। আমার ইঙ্গিতে চৌবাচ্চাগুলো আবার পানিতে ভরা হলো। সোর্ড ডুবল আবার। সবগুলো আলো জ্বলে উঠল। সেই আলোয় গোলাকার একটা দরজা দেখতে পেলাম। 'ওই তো! ওটাই তো টানেলের মুখ!' মনটা আমার আরেকবার অপার আনন্দে নেচে উঠল। ওটাই তো আমার মুক্তির পথ, ওই টানেলের বাইরেই তো স্বাধীন জীবন—খোলা আকাশ, সীমাহীন সমুদ্র, মুক্ত বায়ু।

ধীরগতিতে গোল ওই দরজার দিকে এগোচ্ছে সোর্ড। হঠাৎ টানেলের ভেতর অস্পষ্ট আর ঝাপসা একটা আলো দেখা গেল, খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ হাত দূরে। আলোটা টানেলের মুখের দিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ ওখানে ওটা কিসের আলো? আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। তবে কি কের কারাইয়ে ফিরে আসছে, ওটা তার ডুবোজাহাজের আলো? আমি পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলাম, 'সর্বনাশ! সাবধান! জলদস্যুদের ডুবোজাহাজ ফিরে আসছে!'

লেফটেন্যান্ট ডেভন কোন রকম সংশয়ে ভুগলেন না, আমার চিৎকার থামতে না থামতে তিনিও চিৎকার করে নির্দেশ দিলেন, 'পিছিয়ে আনো! জাহাজ পিছিয়ে আনো!'

টানেলের ভেতর ঢুকতে গিয়েও ঢুকল না সোর্ড, পিছিয়ে আসতে শুরু করল।

পালাবার সুযোগ যদি নাও থাকে, ফাঁকি দেয়ার সুযোগ এখনও হয়তো আছে। দ্রুত সোর্ডের সমস্ত আলো নিভিয়ে ফেলা হলো। দুরু দুরু বুকে ভাবছি, ক্যাপটেন স্পেড কিংবা তার মাল্লারা আমাদেরকে দেখতে পায়নি। সোর্ড এখন যদি একপাশে সরে থাকে, পাশ কাটিয়ে সোজা জেটিতে গিয়ে নোঙর ফেলবে কের কারাইয়ের ডুবোজাহাজ, আমাদেরকে দেখতেই পাবে না।

সোর্ড থামল দক্ষিণ তীরের পাশে এসে।

কিন্তু কপাল মন্দ! ক্যাপটেন স্পেডের শ্যেনদৃষ্টিতে ঠিকই ধরা পড়ে গেছে সোর্ড। পালিয়ে এসে কোন লাভ হয়নি, দস্যুজাহাজটা হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি করছে—আবার দেখতে পাওয়া এখন স্রেফ সময়ের ব্যাপার মাত্র। এখন যদি দুটো ডুবোজাহাজের মধ্যে যুদ্ধ বাধে বা প্রতিযোগিতা শুরু হয়, ছোট ও দুর্বল সোর্ডেরই পরাজয় ঘটবে।

'আপনি তাড়াতাড়ি টমাস রসের কেবিনে চলে যান,' লেফটেন্যান্ট ডেভন বললেন আমাকে। 'ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করতে ভুলবেন না। আমি বাকি সব

কেবিনের দরজা-জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছি। কের কারাইয়ের ডুবোজাহাজ যদি সরাসরি এসে আমাদেরকে ধাক্কা মারে, তাহলে সোর্ডের খোলটাই শেষ পর্যন্ত আমাদের জন্যে পানির তলায় আশ্রয় হবে।' তাঁকে আগের মতই শান্ত ও অবিচলিত দেখলাম। তাঁর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে ছুটলাম আমি, টমাস রসের কেবিনে ঢুকে বন্ধ করে দিলাম দরজাটা।

অন্ধকার কেবিন থেকেই টের পেলাম কের কারাইয়ের ডুবোজাহাজের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে হ্রদের ভেতর এদিক ওদিক সরে যাবার চেষ্টা করছে সোর্ড—কখনও ভেসে উঠছে পানির সারফেসে, কখনও ডুব দিচ্ছে, এই ডানে ছুটছে তো পরক্ষণে দিক বদলে বাঁ দিকে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই, যাতে সংঘর্ষ না হয়।

রুদ্ধশ্বাস কয়েকটা মুহূর্ত পার হলো। কোন অঘটন ঘটছে না দেখে মনে আশা জাগল—টানেল হয়ে সমুদ্রে বেরিয়ে যাওয়া এখনও হয়তো সম্ভব। আর ঠিক এই সময় ধাক্কাটা লাগল।

খুব জোরাল সংঘর্ষ নয়, তবে ঝাঁকিটা অনুভব করলাম। সোর্ডের ইস্পাতের খোলে কি ফাটল ধরেছে? জানি না। বোধহয় সেরকম কিছু ঘটেনি, তা হলে তো বাঁধ ভাঙা বন্যার মত পানি ঢুকত ভেতরে। তারপর অনুভব করলাম দ্বিতীয় ধাক্কাটা। দস্যুজাহাজের চোখা গলুই সোর্ডকে যেন এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিল। কাত হয়ে গেল আমাদের ডুবোজাহাজ, বোধহয় একটা ডিগবাজিই খেলো পানির তলায়। এক কোণে ছিটকে পড়লাম আমি আর রস। তৃতীয় ও শেষ ধাক্কাটা যেন সোর্ডকে হ্রদের তলায় গেঁথে দিল। তীব্র ঝাঁকির সঙ্গে কাঁচ ভাঙার ঝন ঝন শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর স্থির হয়ে গেল সব। শুধু দ্রুতগতি পানির শব্দ ঢুকল কানে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলায় তাও আর শুনতে পাইনি। এরপর কি ঘটেছে কিছুই বলতে পারব না।

## পনেরো

জ্ঞান ফিরতে দেখি আমি নিজের ঘরে শুয়ে আছি। ঘড়ি দেখে আঁতকে উঠলাম। ইতিমধ্যে ত্রিশ ঘণ্টা কেটে গেছে। আওয়াজ শুনে পাশ ফিরতে দেখি ঘরে আমি একা নই, পাশে সেরকো বসে আছে। এতক্ষণ আমার এক-আধটু সেবা-শুশ্রূষাও করেছে সে, তবে জানা কথা এটা তার মহত্ত্বও নয়, আমি তার বন্ধু বলেও নয়, সযত্নে জ্ঞান ফিরিয়ে আনার কারণ হলো যা ঘটেছে তার একটা

সন্তোষজনক ব্যাখ্যা তার খুবই দরকার। ওদেরকে আমার চেনা আছে, প্রয়োজন ফুরালে খুন করতে এতটুকু দ্বিধা করবে না।

এত দুর্বল বোধ করছি যে সিধে হয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছি না। তার কারণও আছে—সোর্ডের সেই বন্ধ কেবিনের বাতাস নিশ্চয়ই একসময় দূষিত হয়ে পড়েছিল, ফুসফুসের জন্যে স্বাস্থ্যকর থাকেনি।

প্রথমেই টমাস রসের কথা ভাবলাম। কোথায় তিনি? সুস্থ আছেন তো? তারপরই মনে পড়ল লেফটেন্যান্ট ডেভনের কথা। নিজের লোকজনকে নিয়ে ভদ্রলোক কি পালাতে পেরেছেন? তারা বেঁচে আছেন, বাকি জলদস্যুদের হাতে খুন হয়ে গেছেন?

সেরকোর প্রথম প্রশ্ন, 'ঠিক কি ঘটেছিল, বলবেন আমাকে, মঁশিয়ে আর্‌ৎ?'

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'টমাস রস ভাল আছেন তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তাঁর কথা থাক। আপনি বলুন, ঘটনাটা কি?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'আগে তুমি বলো ওদের কি অবস্থা হয়েছে?'

'ওদের মানে কাদের কথা জানতে চাইছেন আপনি?' সেরকোর চেহারায় রাগ।

'একদল লোক রস আর আমার ওপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মুখে কাপড় গুঁজে দেয়, তারপর তুলে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে—কোথায় আটকে রেখেছিল কে জানে।' উপস্থিত বুদ্ধিতে যা বলা ভাল মনে হচ্ছে তাই বলছি। বেশি প্রশ্ন করলে বলব, সব ঘটনা মনে করতে পারছি না, হামলাকারীদের চিনতেও পারিনি।

'তাদের কি অবস্থা হয়েছে সময় মত জানতে পারবেন। তার আগে আমি আপনার মুখে শুনতে চাই, এ-সব ঘটল কিভাবে।'

সেরকোর প্রশ্নের সুরে প্রচ্ছন্ন হুমকি রয়েছে। আমার ওপর ওদের গভীর সন্দেহ জন্মেছে। তবে আমার বিরুদ্ধে ওদের হাতে এমন কোন প্রমাণ নেই যে সরাসরি অভিযোগ করতে পারবে। বার্তা সহ ছোট্ট বাক্সটা ওদের হাতে পড়লে সত্যি আমি ফেঁসে যেতাম।

সংক্ষেপে বললাম, লোকগুলোকে আমি চিনতে পারিনি, তবে ধরেই নিয়েছিলাম যে তারা এই ব্যাকাপেরই বাসিন্দা। আমাকে ধরেই মুখে কাপড় গুঁজে দেয়, তাই চিৎকার করতে পারিনি। কোথায় যেন টেনে নিয়ে গেল আমাকে, তারপর কিসের মধ্যে যেন নামানো হলো। এখানে গোঙানির শব্দ শুনি, শুনে মনে হলো টমাস রসকেও ধরে এনেছে। জায়গাটা নিশ্চয়ই কের কারাইয়ের ডুবোজাহাজ হবে, অন্তত সেই রকমই সন্দেহ হয়েছিল আমার। তারপর অনুভব করলাম ডুবোজাহাজটা পানির তলায় ডুব দিল। একটু পরই

একের পর এক ধাক্কা আর ঝাঁকি অনুভব করলাম। একসময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। ব্যস, এর বেশি আমি কিছু জানি না।

বাধা না দিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমার কথা শুনল সেরকো। চোখে কঠিন দৃষ্টি, কপালের চামড়া কুঁচকে আছে। আমি সত্যি বলছি না মিথ্যে, এটা বোঝার কোন উপায়ই তার নেই। জিজ্ঞেস করল, 'তিনজন লোক? হঠাৎ আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল?'

'হ্যাঁ। অন্ধকারে চিনতে পারিনি। আমার ধারণা তারা তোমাদেরই লোক। নয়?'

'না, তারা আমাদের লোক নয়,' অবশেষে বলল সেরকো। 'আপনি সত্যি তাদের চিনতে পারেননি?'

'অন্ধকারে দেখতেই পাইনি তো চিনব কিভাবে!'

'কথা শুনেও বুঝতে পারলেন না তারা কোন দেশের লোক?'

'কই, মনে পড়ছে না–না, তাদেরকে আমি কথা বলতে শুনিনি।'

'যা ঘটে গেল, এ থেকে আপনার কি মনে হচ্ছে? গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া তো হয়েছে? সেটাই বলুন।'

'সত্যি কথা বলব? কিছু মনে করবে না তো আবার? তাহলে শোনো। আমার মনে হয়েছিল, কাউন্ট দার্তিগাস তার লোকজনকে নির্দেশ দিয়েছে আমাকে ধরে যেন পানিতে ফেলে দেয়া হয়। এ-ও মনে হয়েছিল, একই পদ্ধতিতে টমাস রসকেও পানিতে ডুবিয়ে খুন করা হবে। তাঁর আবিষ্কারের সব গোপন তথ্য তো তোমরা জেনেই ফেলেছ, কাজেই তাঁকে আর বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি!'

'আপনি আমাকে অবাক করলেন, মঁশিয়ে আর্‌ৎ। এরকম একটা ধারণা আপনার মাথায় ঢুকল কিভাবে!'

'আমার জায়গায় আপনি হলে আমি যা ভেবেছি আপনিও তাই ভাবতেন। চোখের পট্টি খুলে দিতেই দেখতে পেলাম লোকগুলো আমাকে ডুবোজাহাজের একটা কেবিনে নামাচ্ছে।'

'ওটা আমাদের নয়। অন্য কারও। টানেলের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়েছিল।'

'অন্য কারও ডুবোজাহাজ? মানে?' ভান করলাম কিছুই বুঝতে পারছি না।

'ওই ডুবোজাহাজের উদ্দেশ্য ছিল টমাস রস আর আপনাকে অপহরণ করা।'

'এ-সব কি বলছ তুমি!' আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

'সেজন্যেই আমি জিজ্ঞেস করছি, গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?'

'আমার ধারণা? এ তো একরকম পরিষ্কারই। এই আস্তানার কথা বাইরের কেউ জানে না, জানার কোন উপায়ও নেই। অন্য কোন ডুবোজাহাজ যদি টানেল দিয়ে ভেতরে ঢুকে থাকে, সেটাকে অবশ্যই কাকতালীয় একটা দুর্ঘটনা বলতে হবে। তারপর মাঝি মাল্লারা গহ্বরের ভেতর লোকজন দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ে, হাতের কাছে যাকে পায় তাকেই ধরে—মানে আমাকে আর টমাস রসকে। কি জানি, আরও কাউকে হয়তো ধরেছে…'

সেরকো আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। আমি যে ব্যাখ্যা দিলাম, তার ফাঁক-ফোকরগুলো কি সে দেখতে পাচ্ছে? কিন্তু ফাঁক যতই থাকুক, এই ব্যাখ্যা অন্তত আপাতত গ্রহণ করতে হবে তাকে। অবশেষে তাকে বলতে হলো, 'হয়তো আপনার কথাই ঠিক। হঠাৎ ওটা ঢুকে পড়ে আমাদের আস্তানায়। তারপর বেরিয়ে যাবার সময় আমাদের ডুবোজাহাজের সামনে পড়ে যায়। ফলে সংঘর্ষ ঘটে। ধাক্কা খেয়ে ওদের ডুবোজাহাজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই, সেজন্যে তো আর কিছু মানুষকে ডুবে মরতে দেয়া যায় না। তাছাড়া, ততক্ষণে আমরা জেনে গেছি যে টমাস রস আর আপনি ওই বিধ্বস্ত ডুবোজাহাজে আছেন। কাজেই উদ্ধারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমরা। আমাদের দলে ওস্তাদ ডুবুরির অভাব নেই, তারা সোর্ডের হালের ভেতর দিয়ে রশি ঢুকিয়ে দিল…'

'সোর্ড?' না বোঝার ভান করলাম। 'তরোয়াল?'

'ওই ডুবোজাহাজ পানির ওপর তোলা হলো। দেখলাম খোলে নাম লেখা রয়েছে—সোর্ড। আপনাদের ফিরে পেয়ে কি যে আনন্দ পেলাম! অবশ্য তখনও আপনাদের জ্ঞান ফেরেনি। তবে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এত চেষ্টা করেও সোর্ডের একজন লোককেও আমরা বাঁচাতে পারলাম না। তারা সবাই একটা কেবিনে ছিল, আর ধাক্কাটা সরাসরি ওই কেবিনেই লাগে। পাপ করলে তার শাস্তি তো পেতেই হয়, এ ছাড়া আর কি বলতে পারি বলুন। না আমাদের আস্তানাটা কাকতালীয়ভাবে দেখে ফেলে, না বেঘোরে প্রাণ হারাতে হয়। এই দেখে ফেলাটাই ওদের কাল হয়েছে। এটাকেই আমি পাপ বলছি।'

লেফটেন্যান্ট ডেভন আর তাঁর সঙ্গীদের মৃত্যুসংবাদ শুনে বুকটা আমার শোকে ভেঙে যেতে চাইল। কিন্তু নিজেকে সামলে রাখলাম। জানি, সেরকোর সামনে আমার কাতর হওয়া চলবে না।

ভাগ্য বিরূপ, তাই মুক্তি পেতে পেতেও পেলাম না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, এরপর কি ঘটবে? আমার বার্তা কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছেছে, কাজেই কের কারাইয়ে সম্পর্কে লোকে এখন সব জানে। সোর্ড বারমুডায় না ফিরলে কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই ব্যাকাপের বিরুদ্ধে নতুন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

তবে যা ঘটে গেল, এরপর থেকে জনলদস্যুরা অত্যন্ত সজাগ থাকবে। চেষ্টা করলেও সহজে কেউ আর ব্যাকাপে ঢুকতে পারবে না।

আবার শুরু হলো সেই নীরস একঘেয়ে জীবন। তবে ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে যে আমাকে সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ খুঁজে না পাওয়ায় ওরা আমার চলাফেরার ওপর কোন রকম বিধিনিষেধ আরোপ করেনি, তাই আমি আগের মতই গহ্বরের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে পারছি।

আমার মত টমাস রসকেও ওরা সেবা-যত্ন করে সুস্থ করে তুলেছে। তবে এই ঘটনার কোন প্রভাবই তাঁর ওপর পড়েছে বলে মনে হলো না। সেই আগের মতই আবার তিনি নিজের গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বলা যায় রাতদিন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই ল্যাবরেটরিতে থাকেন।

এবার ফেরার সময় প্রচুর মালপত্র নিয়ে এসেছে এব্বা, আমার ধারণা বেশ অনেকগুলো জাহাজে লুঠপাট চালিয়েছে জলদস্যুরা।

নিক্ষেপক মঞ্চ তৈরির কাজ আগের মতই চলছে। সব মিলিয়ে তৈরি ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা ইতিমধ্যে পঞ্চাশে দাঁড়িয়েছে। হামলা হলে তা ঠেকানোর জন্যে অবশ্য কের কারাইয়ের তিনি-চারটের বেশি দরকার হবে না।

আমার ধারণাই ঠিক, আস্তানার নিরাপত্তা রক্ষায় জলদস্যুরা কড়া পাহারার ব্যবস্থা করল। দ্বিতীয় টানেল দিয়ে রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখছে তারা বাইরের খোলা সমুদ্রে। বাইরে, সৈকতেও লোক রাখা হয়েছে। পাথরের আড়ালে লুকিয়ে আছে তারা। বারো ঘণ্টা পর পর প্রহরী বদল। দূরে কোন জাহাজ দেখা গেলেই পাগলা ঘণ্টা বাজাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রায়ই দেখি ক্যাপটেন স্পেড আর এঞ্জিনিয়ার সেরকো কি নিয়ে যেন কের কারাইয়ের সঙ্গে নিচু গলায় আলাপ করছে। ওরা হয়তো দ্বীপ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত কি না তাই ভাবছে। সোর্ডের আকস্মিক আগমনটাকে তারা স্রেফ দুর্ঘটনা বলে গ্রহণ করতে পারছে না। ব্যাকাপ যতই সুরক্ষিত আস্তানা হোক, কর্তৃপক্ষ এব্বার অস্তিত্ব জেনে ফেললে আক্রমণ করে যদি সুবিধে করতে নাও পারে, না খাইয়ে মেরে ফেলার ব্যবস্থা ঠিকই করতে পারবে।

ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রায় রোজকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। চূড়ার ফোকর থেকে ভেসে আসে খেপে ওঠা বাতাসের একটানা গর্জন। গাংচিলেরা পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে গহ্বরের ভেতর।

এরকম বিপজ্জনক আবহাওয়ায় এব্বা আর সাগর পাড়ি দিতে বেরোয় কিভাবে। তবে আবহাওয়া ভাল থাকলেও কের কারাইয়ে অভিযানে বেরুত কিনা সন্দেহ আছে আমার। এখন আর মার্কিন উপকূল এব্বার জন্যে আগের মত নিরাপদ নয়, এটা বোঝার মত বুদ্ধি নিশ্চয়ই ওদের আছে।

সেরকোর সঙ্গে ল্যাবরেটরির পাশে একদিন দেখা হলো। কথায় কথায় সে-ই সোর্ডের প্রসঙ্গটা তুলল। এখন তার ধারণা সোর্ডের অপ্রত্যাশিত আগমনটা কোন দুর্ঘটনা ছিল না, ওটা ছিল ব্যাকাপের বিরুদ্ধে একটা আক্রমণ।

'আমি তোমার সঙ্গে একমত নই।'

'কেন?'

বললাম, 'একটা আক্রমণ ব্যর্থ হলে আরেকটা আক্রমণ হত। গহ্বরে ঢোকার চেষ্টা হয়তো করত না, তবে বোমা মেরে দ্বীপটাকে উড়িয়ে দিতে চাইত।'

'বোমা মেরে কি করবে? দ্বীপ উড়িয়ে দেবে?' সেরকো একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। 'অসম্ভব! আমাদের এই আস্তানা এত সুরক্ষিত যে…'

তাকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইলাম, 'তারা কি তা জানে?' সেরকো কিছু বলছে না দেখে আবার বললাম, 'তারা এমনকি এ-ও জানে না যে তোমরা টমাস রসকে অপহরণ করে নিয়ে এসে এখানে আটতে রেখেছ।'

'জানুক বা না জানুক,' জেদের সুরে বলল সেরকো, 'কোন যুদ্ধজাহাজ দ্বীপের চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে এলে সেটাকে আমার ফুলগুরেটর দিয়ে স্রেফ উড়িয়ে দেব।'

'তা উড়িয়ে দিন। কিন্তু তারপর?'

'তারপর আর কারও সাহসই হবে না এই দ্বীপের দিকে এগোবার।'

'তোমার কথাই ঠিক, কাছে আসার সাহস হবে না কারও,' বললাম আমি। 'কিন্তু কাছে না এসেও দ্বীপটাকে ঘিরে রাখতে পারবে। এব্বাকে নিয়ে কোন দ্বীপে ভেড়ার আশা কের কারাইয়েকে ত্যাগ করতে হবে। তখন এত লোকজনকে তোমরা খাওয়ারেই বা কি? রসদ পাবে কোথায়?'

সেরকো জবাব দিল, 'কেন, আমাদের ডুবোজাহাজ নেই?'

'আছে,' আমি বললাম। 'কিন্তু তোমাদের সব কথা যদি কেউ জেনে ফেলে থাকে তাহলে ডুবোজাহাজের কথাও কি জানে না?'

সেরকোর চোখে সন্দেহ ফুটল। 'মঁশিয়ে আর্‌ৎ, আপনি দেখছি অনেক বেশি কল্পনা করে ফেলেছেন। এত কিছু কল্পনা করলেন কিসের ওপর ভিত্তি করে? আপনার ভাবভঙ্গি কিন্তু একজন সবজান্তার।'

বেশি কথা বলে ফেলে আমি একেবারে চুপসে গেলাম। সেরকো আমার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। তবে উপস্থিত বুদ্ধি হারাইনি, মাথা ঠাণ্ডা রেখে বললাম, 'দেখো সেরকো, আমি যুক্তিবাদী মানুষ। যুক্তি দিয়ে মিলিয়ে দেখে আমি যা বুঝেছি, তাই বলেছি। এখন তুমি যদি এর অন্য কোন অর্থ বের করতে চাও, আমার কিছু করার নেই।'

আর একটা কথাও না বলে চলে গেল সেরকো। ঠিক বুঝতে পারলাম না আমাকে সে কতটা সন্দেহ করেছে। যদি ভেবে থাকে গোটা ব্যাপারটায় আমার হাত আছে তাহলে তো সর্বনাশের আর কিছু বাকি নেই।

**আজ সতেরো নভেম্বর।**

বিকেলের দিকে মৌচাকে যেন ঢিল পড়ল। অকস্মাৎ শুরু হলো চিৎকার আর ছুটোছুটি। লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি জলদস্যুরা দ্বিতীয় টানেলের দিকে দৌড়াচ্ছে। তাদের সঙ্গে আমিও ছুটলাম। টানেলের কাছে এসে দেখলাম কের কারাইয়ে, সেরকো, স্পেড, গিবসন, এফরনডাট, প্রকাণ্ডদেহী সেই মালয়ী, সবাই এক জায়গায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। সবার চোখেমুখে প্রবল উত্তেজনা। কি ব্যাপার?

ব্যাপার হলো, পাগলা ঘণ্টা বেজেছে।

এর মানে হলো, সৈকতে যারা পাহারা দিচ্ছিল তারা বিপদের সঙ্কেত পাঠিয়েছে। কি বিপদ?

বিপদ হলো যুদ্ধজাহাজ। উত্তর-পশ্চিম দিকে দেখা গেছে ওগুলোকে। সংখ্যায় নাকি বেশ কয়েকটা। অর্থাৎ যুদ্ধজাহাজের একটা বহর দ্রুত গতিতে ব্যাকাপের দিকে ছুটে আসছে।

# ষোলো

খবরটা আমার দেহমনে আশ্চর্য একটা পুলক জাগিয়ে তুলল। নিজেকে সাবধান করে দিলাম—খবরদার, তোমার হাসি ওরা যেন দেখতে না পায়!

এতদিন ডায়েরী লিখেছি, এখন কখন কি ঘটছে তার বিবরণ লিখতে হবে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। একেবারে এই শেষ মুহূর্তে নাটকীয় অনেক কিছুই ঘটবে বলে আশা করি, এমনকি টমাস রসের আবিষ্কৃত ফুলগুরেটরে সূত্রও হয়তো জানার সুযোগ পাব। যা কিছু জানব, যা কিছু ঘটবে, সব আমাকে লিখে রাখতে হবে। যুদ্ধ তো একটা বাধছেই, তাতে যদি আমার মৃত্যু হয়, তারপরও দুনিয়ার মানুষ গত পাঁচ মাসের বিশদ বিবরণ পেয়ে যাবে আমার এই লেখা থেকে। কাজেই সব কিছু লিখে রাখাটা খুব জরুরী।

দলবল নিয়ে বাইরের সৈকতে বেরিয়ে গেল কের কারাইয়ে। পিছু নেব কিনা ভাবছি, আবার তারা মৌচাকে ফিরে এল। ওদের কথা শুনে বুঝলাম তীরে

বিশজন দস্যুকে পাহারায় রেখে এসেছে। ইতোমধ্যে সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে, তাই সবার ধারণা আজ আর হামলা হবে না। যাই ঘটুক, কাল সকালে ঘটবে। প্রতিপক্ষ নিশ্চয়ই জানে যে ব্যাকাপ কি রকম সুরক্ষিত, কাজেই রাতের অন্ধকারে তারা হামলা করবে না।

সন্ধের খানিক পরই সৈকতের দু'জায়গায় লঞ্চিং প্যাড তৈরির কাজ শেষ। স্থান নির্বাচনের কাজটা তারা আসলে আগেই সেরে রেখেছিল।

লঞ্চিং প্যাড তৈরি, এ-খবর পেয়েই টমাস রসের ল্যাবরেটরিতে চলে গেল সেরকো। কি ঘটছে ও ঘটতে পারে তাই হয়তো ব্যাখ্যা করতে গেল সে। পরিস্থিতি জানাবার পর রসের কাছে ফুলগুরেটর চাইবে।

মনে পড়ল, ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা পঞ্চাশ। প্রতিটিতে কয়েক পাউন্ড করে বিস্ফোরক ভরা আছে। ক্ষেপণাস্ত্রের আকৃতি চাকতির মত, নিজস্ব শক্তিতে ছুটতে পারার ক্ষমতা থাকায় অন্যান্য যে-কোন গোলাগুলির চেয়ে রেঞ্জ বা পাল্লা অনেক বেশি, এবং টার্গেটে বা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাবার পর ঠিক বুমেরাঙের মত একটা পাক খেয়েই তা বিস্ফোরিত হয়।

ক্ষেপণাস্ত্র ও বিস্ফোরক, দুটোই তৈরি। আমি এ-ও জানি যে নল ভর্তি বেশ কয়েকটা ডেটোনেইটরও বানিয়েছেন রস। তিনি যে এই বিপদের সময় দস্যুসর্দার কেঁর কারাইয়েকে সাহায্য করবেন, তাতেও আমার কোন সন্দেহ নেই।

ব্যাকাপের ভেতর সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। ক্রমে রাত গভীর হলো। উদ্বেগ আর উত্তেজনা কমাবার জন্যে নিজের ঘরে ফিরে এলাম আমি। সবার চোখের আড়ালে থাকাও একটা উদ্দেশ্য।

বিছানায় বসে ভাবছি। যুদ্ধজাহাজ আসছে। কিন্তু এগুলো কাদের জাহাজ? সোর্ড ছিল ইংরেজদের ডুবোজাহাজ। এগুলোও কি তাই? জানার কোন উপায় নেই। আসলে জানার দরকারও নেই। দস্যুদের আস্তানাটা ওরা ধ্বংস করতে পারলেই আমি খুশি।

কিন্তু ঘরের ভেতর বেশিক্ষণ টিকতে পারলাম না। রাত ন'টায় আবার বেরুলাম।

হ্রদের পাশে কাউকে দেখলাম না, শুধু সেই মালয়ী লোকটা টানেলের মুখে পাহারায় দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে না গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ল্যাবরেটরির সামনে চলে এলাম। ভাবছি, টমাস রসকে বোঝালে হয় না? ভদ্রলোক কি জানেন কাদেরকে তিনি সাহায্য করছেন? কাউন্ট দার্তিগাস আসলে দস্যুসর্দার, এ-কথা বললে তাঁর হয়তো বোধোদয় ঘটবে। অন্তত একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত তাঁর মনে দেশপ্রেম জাগানো যায় কি না।

স্যাঁৎ করে, নিঃশব্দ পায়ে, ল্যাবরেটরিতে ঢুকে পড়লাম। ভেতরে দেখি একাই কাজ করছেন টমাস রস। এই রস স্যানাটরিয়াম হেলথফুল হাউসের মানসিক রোগী নন। এখানে তিনি প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, একজন উদ্ভাবক। হাতে নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন একজোড়া কাঁচের নল, টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। অন্য একটা কাঁচের নল আলোর বিপরীতে ধরলেন। নলটার ভেতর নীল তরল পদার্থ দেখে আশঙ্কায় শিউরে উঠলাম আমি। মৃদু গলায় ডাকলাম তাঁকে, 'মঁশিয়ে রস?'

প্রথমে মাথা তুললেন, তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন, আমাকে দেখে বললেন, 'ওহ্, তুমি! সিমোন আর্ৎ!' বলার সুরে চরম তাচ্ছিল্য আর অসন্তোষ।

উনি আমার নাম জানলেন কিভাবে? নিশ্চয়ই সেরকো বলেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি আমাকে চেনেন?'

'চিনব না আবার। তুমিই তো আমার দেখাশোনা করতে। কেন করতে তাও জানি। তোমার গোপন মতলব ছিল আমার আবিষ্কারের সূত্রগুলো জেনে নেয়া। কিন্তু তুমি সুবিধে করতে পারোনি। সূত্র সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না, কোনদিন জানতেও দেব না।'

তারমানে ডেটোনেইটর বানাবার কৌশল এখনও কাউকে শেখাননি রস। পরম স্বস্তি বোধ করলাম। বললাম, 'আমার সম্পর্কে জানেন, শুনে খুশি হলাম। কিন্তু আপনি কোথায় কার কাছে আছেন তা কি জানেন?'

'কেন জানব না! এটা আমার নিজের বাড়ি।'

বুঝলাম, এটা কের কারাইয়ে তাঁর মাথায় ঢুকিয়েছে। রস ব্যাকাপকে নিজের বাড়ি বলে ধরে নিয়েছে। এখানে যে সাতরাজার ধন জড়ো করা হয়েছে, সবই নিজের বলে ভাবছেন তিনি। ব্যাকাপে কেউ হামলা চালালে এই বিপুল ধন-সম্পদ কেড়ে নেয়ার জন্যেই চালাবে। কাজেই আত্মরক্ষার চেষ্টা করাটা তাঁর জন্যে অনুচিত কাজ হবে না। 'টমাস রস, আমি চাই আমার কয়েকটা কথা আপনি মন দিয়ে শুনবেন।'

'আমার এমন কি দায় পড়েছে যে তোমার কথা শুনতে যাব?'

'তর্ক না করে কি বলি শুনুন। আমাকে আর আপনাকে জোর করে তুলে আনা হয়েছে এখানে। এটা জলদস্যুদের একটা আস্তানা।'

হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিয়ে রস বললেন, 'আরে রাখো, আমি কেন তোমার কথা শুনতে যাব, তুমিই বরং আমার কথা শোনো। এই যে এখানে বস্তা বস্তা সোনা দেখছ, বিভিন্ন দেশের লাখ লাখ মুদ্রা দেখছ, এ-সবই আমার। ফুলগুরেটরের বিনিময়ে একটা দাম চেয়েছিলাম আমি, কিন্তু কেউ সে দাম দিতে রাজি হয়নি, এমনকি আমার নিজের দেশও নয়—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার চাওয়া দামেই ওটা আমি বিক্রি করতে সফল হয়েছি এই বিপুল ধন আমার। আমার

এই ঐশ্বর্যে আমি কাউকে ভাগ বসাতে দেব না।'

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'স্যানাটরিয়ামের কথা মনে আছে আপনার? হেলথফুল হাউসের কথা?'

'কেন মনে থাকবে না! ওখানেই তো আমাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। ওখানেই তো গেডন এসে আমার আবিষ্কার মেরে দেয়ার চেষ্টা করেছিল।'

'আপনি ভুল জানেন, মঁশিয়ে রস। তখন যদি আবিষ্কারের সূত্রগুলো আমাকে বলতেন, আপনার সম্মান হাজার গুণ বেড়ে যেত, সেই সঙ্গে আরও বেশি ধন-সম্পদের মালিক হতে পারতেন আপনি। আমাকে চিনতে আপনার ভুল হয়েছে। বিশ্বাস করুন, আমার নিজের কোন স্বার্থ নেই।'

'তোমাকে চিনতে আমি ভুল করেছি? হাহ্-হাহ্-হাহ্-হাহ্! সত্যি, তুমি আমাকে হাসালে, সিমোন আর্ৎ।'

'আপনার মনে থাকার কথা নয়, তবে বাস্তব সত্য হলো হেলথফুল হাউসে আপনি অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন, আপনার মানসিক অবস্থা ভাল ছিল না।'

'কে বলল আমার মনে নেই? ওখানে আমাকে তোমরা মিছিমিছি পাগল বানিয়ে রেখেছিলে, কিন্তু আসলে পাগল আমি কোনদিনই ছিলাম না। পাগল হলে কি মুক্তি পাবার পরপরই এই জিনিস বানাতে পারতাম?'

'মুক্তি? নিজেকে আপনি মুক্ত ভাবছেন? এই গর্তের ভেতর?'

'এটা আমার বাড়ি, সমস্ত সুযোগ-সুবিধে সহ এটা আমাকে কাউন্ট দার্তিগাস দান করেছেন। এখানে সবাই আমার হুকুম মত কাজ করার জন্যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। হামলা? কেউ একবার হামলা চালিয়ে দেখুকই না, কাতারে কাতারে মারা পড়বে। এই যে আমার হাতে টিউবটা দেখছ, এটাই শত্রুদের ধ্বংস করে দেবে।'

'কাউন্ট দার্তিগাস আপনাকে বোকা বানিয়েছে। তার আসল পরিচয় আপনি জানেন? সে কের কারাইয়ে, কুখ্যাত জলদস্যু।'

নামটা শুনে রস বিচলিত হলেন কি না বোঝা গেল না। তাঁকে নির্লিপ্ত ও নির্বিকার দেখাল। বললেন, 'কের কারাইয়েকে আমি চিনি না। আমি শুধু কাউন্ট দার্তিগাসকে চিনি।'

শেষ একটা চেষ্টা করে দেখলাম আমি। 'মঁশিয়ে রস, অন্তত আমার কথা বিশ্বাস করুন। বিশ্বাস করুন, আমি আপনার শুভানুধ্যায়ী। শুনুন, কের কারাইয়ে আর কাউন্ট দার্তিগাস একই লোক। সে জলদস্যুদের সর্দার। লুঠপাট করতে সুবিধে হবে, এ-কথা ভেবেই আপনার ফুলগুরেটর কিনেছে…'

'দূর, দূর! আমাকে বোকা বানাতে পারবেন না!' রেগে উঠলেন রস। 'দস্যু তো সোর্ডের লোকগুলো, যারা আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছিল। সেরকো সব

আমাকে ব্যাখ্যা করেছে…'

'না, মঁশিয়ে রস, সেরকো আপনাকে সত্যি কথা বলেনি। ওরা জলদস্যু, আর ওদের হাতে আমরা বন্দী। আপনি ফুলগুরেটর দিয়ে একদল জলদস্যুকে সাহায্য করতে যাচ্ছেন। আপনার আবিষ্কারের সূত্র জেনে ফেলুক, তারপর দেখবেন ওরা আপনার কি অবস্থা করে।'

প্রবল বেগে মাথা নাড়লেন রস। আমার কথা মন দিয়ে শুনতে পর্যন্ত রাজি নন তিনি। 'এরা আমার সঙ্গে অত্যন্ত ভাল আচরণ করছে, কাজেই তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই। এরা খারাপ লোক হলে কি আমার সব দাবি পূরণ করত? খারাপ লোক তো তারাই, যারা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। তারা আমার ওপর অবিচার করেনি? একের পর এক বিভিন্ন দেশ থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়নি? আমার অপরাধ কি ছিল? না, আমি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করতে চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম তারা অসীম ক্ষমতার অধিকারী হোক। হ্যাঁ, এই ছিল আমার অপরাধ!'

আবিষ্কারকের এই অভিযোগ চিরন্তন—কেউ তাঁর মূল্যায়ন করছে না! দেখলাম ঘৃণা ও রাগে টমাস রসের চোখ দুটো জ্বলছে। অন্ধ ও বধির হয়ে গেছেন তিনি, আমার কোন কথাই শুনতে পাচ্ছেন না। আমি কেন, তাঁকে যুক্তির পথে আনা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

তারমানে সর্বনাশ যা ঘটার ঘটবেই, আমি তা ঠেকাতে পারব না।

সত্যি কি ঠেকাতে পারব না? আমার কি আসলেও কিছু করার নেই?'

আছে, একটা উপায় অবশ্যই খোলা আছে। অনিবার্য সর্বনাশ ঠেকাবার জন্যে রক্তপাত ঘটাতে হবে। টমাস রসের ওপর জোর খাটাতে হবে। কথায় যখন কাজ হচ্ছে না, বল প্রয়োগ করাই তো উচিত। তাঁকে আমি বেঁধে ফেলতে পারি। এমনকি ডেটোনেইটর বানানো বন্ধ করার জন্যে তাঁকে যদি আমার খুনও করতে হয়, সেটা অন্যায় হবে না।

হ্যাঁ বর্তমান পরিস্থিতিতে রসকে খুন করাটা আমার কর্তব্য।

কিন্তু আমি নিরস্ত্র। বেঞ্চের ওপর থেকে হাতুড়ি বা বাটালিটা তুলে নেব? এখন যদি তাঁকে খুন করি আমি, তারপর কাঁচের টিউবগুলো সব ভেঙে ফেলি, তাঁর আবিষ্কার চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে। তখন কর্তৃপক্ষের জাহাজগুলো দ্বীপে ভিড়তে পারবে। সশস্ত্র লোকজন ব্যাকাপে ঢুকবে, যুদ্ধ করে হারিয়ে দেবে জলদস্যুদের। মাত্র একজনকে খুন করলে যদি অসংখ্য নিরীহ মানুষকে বাঁচাতে পারি, তাহলে ইতস্তত করা আমার উচিত হচ্ছে না।

টেবিলের কাছে সরে এসে ইস্পাতের ধারাল একটা ফলার দিকে হাত বাড়ালাম। কিন্তু বড় দেরি করে ফেলেছি। হঠাৎ আমার দিকে ফিরলেন রস।

এই মুহূর্তে আক্রান্ত হলে ঠেকাবার সুযোগ পাবেন তিনি, শুরু হবে ধস্তাধস্তি আর চিৎকার। সঙ্গে সঙ্গে জলদস্যুরা ছুটে আসবে। রস নন, আমিই খুন হয়ে যাব।

হাতটা টেনে নিয়ে আবার আমি তাঁর মনে দেশ প্রেম জাগাবার চেষ্টা করলাম। 'মঁশিয়ে রস! কয়েকটা জাহাজ আসছে, ওদের উদ্দেশ্য জলদস্যুদের এই আস্তানা ধ্বংস করা। সঠিক জানি না, তবে ধারণা করছি জাহাজগুলোর মাস্তুলে ফ্রান্সের পতাকা উড়ছে।'

কেমন যেন বোকার মত তাকিয়ে থাকলেন রস। তিনি সম্ভবত জানতেন না যে দ্বীপ আক্রান্ত হতে যাচ্ছে।

'মঁশিয়ে রস, চিন্তা করে দেখুন, আপনি কি ফ্রান্সের পতাকা লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়বেন? ফ্রান্স, আপনার জন্মভূমি! তেরঙা সেই ঝাণ্ডা, মনে পড়ে?'

হঠাৎ যেন একটা ঝাঁকি খেয়ে বাস্তবে ফিরে এলেন রস। এতক্ষণে যেন তিনি একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন, সেটা কেটে যাচ্ছে।

'বলুন! আমার কথার জবাব দিন! আপনি নিজের দেশকে আক্রমণ করবেন?'

'আমার কোন দেশ নেই!' হঠাৎ চিৎকার করে বললেন টমাস রস। 'প্রত্যাখ্যাত, অবহেলিত ও বিতাড়িত বিজ্ঞানীর নিজের দেশ বলতে কিছু থাকে না। যেখানে আশ্রয় জোটে সেটাই তার দেশ। কেউ যদি হামলা করে, আমার ধন-সম্পদের লোভেই করবে, কাজেই আমি তাদের ঠেকাব। আত্মরক্ষা করা আমার অধিকার। আমিও দেখতে চাই কার এত সাহস যে দ্বীপে হামলা চালায়!' পাগলের মত দরজার দিকে ছুটলেন তিনি, কবাট খুলে গর্জে উঠলেন, 'বেরিয়ে যাও, বেরোও!' তাঁর এই চিৎকার মৌচাক পর্যন্ত শোনা যাবে।

এখন সময় নষ্ট করা মানে নিজের মৃত্যু ডেকে আনা। ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে এলাম ল্যাব থেকে।

## সতেরো

গহ্বরের একবারে শেষ প্রান্তে, অসংখ্য পাথুরে স্তম্ভের গোলকধাঁধায় প্রায় এক ঘণ্টা হলো অস্থিরভাবে উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি। দেয়াল আর পাঁচিলগুলো আরও যেন পুরু, আরও যেন নিরেট লাগছে আমার। বুকের ওপর চেপে বসার একটা অনুভূতি হচ্ছে, ওগুলো যেন আমাকে পিষে ফেলবে।

নিজেও জানি না কখন আবার মৌচাকের কাছে ফিরে এসেছি। সংবিৎ ফিরতে দেখলাম নিজের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ভেতরে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। ওই খুপরির ভেতর কি পাব আমি? স্বস্তি পাব? বিশ্বাস পাব? ওখানে ঢুকলে মনের অস্থিরতা দূর হবে? অসম্ভব!

এই সংকটের পরিণতি কি হতে যাচ্ছে আমি জানি না। টমাস রসকে যুক্তির পথে আনতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছি আমি। ভয়ানক সংকট ঘনিয়ে আসছে, অথচ আমি কোন কাজেই লাগছি না। প্রলয়কাণ্ড ঘটে যাওয়া এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। জাহাজগুলো রেঞ্জ বা পাল্লার মধ্যে এলেই ভয়ঙ্কর ক্ষেপণাস্ত্র ছুটে যাবে। সরাসরি আঘাত যদি না-ও করে, তারপরও সবগুলো যুদ্ধজাহাজ সমুদ্রের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এই মুহূর্তে আমার কিছু করার নেই। ঘরে ঢুকে বসে থাকতে হবে। ঘুম আসবে না জানি, সারারাত বসে অপেক্ষা করতে হবে কখন সকাল হয়। সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখতে হবে কি ঘটে। কিন্তু রাতেই যে বিপদটা ঘটবে না, তার নিশ্চয়তা কি? কের কারাইয়ে যদি গভীর রাতে ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ে, কে তাকে বাধা দেবে?

মৌচাকের দিকে শেষ একবার তাকালাম। বিপরীত দিকে একটাই আলো জ্বলছে—ল্যাবরেটরিতে। ওই আলোর প্রতিফলন হ্রদের পানিতে কাঁপছে। তীর ফাঁকা পড়ে আছে, জেটিতেও কেউ নেই। মৌচাকের খুপরিগুলোও নিশ্চয় ফাঁকা পড়ে আছে—আক্রমণ ঠেকাবার প্রস্তুতি নিতে গেছে সবাই।

হঠাৎ আমার ষষ্ঠইন্দ্রিয় সজাগ করে তুলল আমাকে। প্রবল একটা তাগাদা অনুভব করলাম। ঘরের ভেতর না ঢুকে দেয়ালে হাত রেখে এগোতে শুরু করলাম। সতর্ক হয়ে আছি, কারও পায়ের আওয়াজ বা গলা পেলেই ঝট করে কোন থামের আড়ালে গা ঢাকা দেব।

কারও সঙ্গে দেখা হলো না। একসময় পৌঁছে গেলাম দ্বিতীয় টানেলের মুখের কাছে। অবাক কাণ্ড, এখানে কোন পাহারা নেই! ভাল-মন্দ কিছুই বিবেচনা করলাম না, প্রবল ঝোঁক দমাতে না পেরে অন্ধকার টানেলের ভেতর ঢুকে পড়লাম। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, হাতড়ে হাতড়ে এগোলাম। কিছুক্ষণ পরই তাজা বাতাস ধাক্কা মারল মুখে। নোনা হাওয়া, যেমন তাজা তেমনি শীতল। দীর্ঘ পাঁচ মাস পর এই প্রথম মুক্ত বায়ু পেলাম।

টানেলের মুখ এখনও খানিকটা দূরে, সেদিকে তাকিয়ে রাতের তারা-জ্বলা আকাশ দেখতে পেলাম। মনে একটা আশা জাগল, আমি বোধহয় এই সুযোগে ব্যাকাপ থেকে বেরিয়ে যেতে পারব। আকাশের গায়ে শুধু তারাই দেখতে পাচ্ছি, কোন ছায়ামূর্তি দেখছি না। তারমানে টানেলের বাইরের মুখেও কোন পাহারা

নেই। তবু সাবধানের মার নেই ভেবে টানেলের মেঝেতে শুয়ে পড়লাম। ক্রল করে এগোচ্ছি। খোলা মুখের কাছে এসে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকালাম। না, কেউ নেই!

টানেল থেকে বেরিয়ে পশ্চিম দিকে এগোলাম। ওদিকে পাহাড়ের ঢাল এত বেশি খাড়া যে কারও পক্ষেই ওঠা-নামা করা সম্ভব নয়, তাই কখনোই পাহারা বসানো হয়নি। সরু একটা ফাটলের কাছে এসে থামলাম আমি। এই জায়গাটা তীর বা সৈকতের উত্তর-পশ্চিম বিন্দু থেকে দুশো ফুট দূরে।

বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু ঘটনা তো সত্যি—শেষ পর্যন্ত জলদস্যুদের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছি আমি। তবে তারমানে এই নয় যে আমি মুক্তি পেয়েছি। খুবজোর বলা যায় স্বাধীনতার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি। ওপরে, পাহাড়ের আরেক দিকে, নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে ছায়ামূর্তি—প্রহরী। রাতটা ঠাণ্ডা হিম, আকাশ জুড়ে জ্বলজ্বলে তারার মেলা বসেছে, গায়ে লাগছে মুক্ত বায়ুর কোমল পরশ। উত্তর-পশ্চিম দিগন্তে আলোর ছটা দেখতে পেলাম। যুদ্ধজাহাজের লণ্ঠন। কিছুক্ষণ পর খেয়াল করলাম পুবদিকের আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। কব্জির ঘড়িতে দেখলাম পাঁচটা বাজে।

সরু ফাটলটার ভেতর ঢুকে বসে আছি, বাইরে থেকে এরা কেউ আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। আজ আঠারো নভেম্বর। এরই মধ্যে দিনের প্রথম আলো চারদিক বেশ ভালই ফুটেছে। কাগজ-কলম সব সময় পকেটেই থাকে, মন চাইছে রসের ল্যাবরেটরি যাবার ঘটনাটা এই ফাঁকে লিখে ফেলি। কে জানে, আমার ডায়েরীর এটাই হয়তো সর্বশেষ সংযোজন হতে যাচ্ছে, এরপর লেখার সুযোগ আর নাও পেতে পারি।

ভোররাতে সমুদ্রের ওপর কুয়াশার হালকা পর্দা ছিল, সকালের বাতাসে তা মিলিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধজাহাজগুলোকে এখন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।

ভোর রাতে সমুদ্রের ওপর কুয়াশার হালকা পর্দা ছিল, সকালের বাতাসে তা উবে যাচ্ছে। যুদ্ধজাহাজগুলোকে এখন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। পাঁচটা জাহাজ পাশাপাশি একটা রেখার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তীর থেকে ওগুলো কত দূরে হবে? পাঁচ মাইল, কিংবা খুব বেশি হলে ছ'মাইল। দিনের আলো আরও ভালভাবে ফুটলে হামলা চালাবার জন্যে ব্যাকাপের দিকে ছুটে আসবে ওগুলো।

সৈকতে তৎপরতা শুরু হলো। পাথরের আড়াল থেকে তিন-চারজন দস্যু বেরুল। দ্বীপটার একেবারে শেষ মাথা থেকে ফিরে এল একজন প্রহরী। সবারই গন্তব্য এখন লঞ্চিং প্যাড।

ফাটলের ভেতর আছি, তাই বাইরে থেকে আমাকে ওরা দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু ওদের কেউ যদি আমার ঘরে ঢুকে আমাকে দেখতে না পায়, তাহলে কি হবে? কি আবার হবে, সবাই মিলে খুঁজবে আমাকে। তবে যেহেতু আমাকে ওদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই, এসময় উত্তেজনায় আমার কথা ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

সাতটা পঁচিশ মিনিটে কের কারাইয়ে, স্পেড আর সেরকোকে দেখতে পেলাম। অন্তরীপের মুখে গিয়ে দাঁড়াল তিনজন। উত্তর-পশ্চিম দিকের দিগন্তে তীক্ষ্ণ চোখ বোলাচ্ছে। ওদের ঠিক পিছনে বসানো হয়েছে লঞ্চিং প্যাড। চাকতির মত ক্ষেপণাস্ত্রগুলো রোদ লেগে চকচক করছে। ডেটোনেইটরের সাহায্যে ওগুলোকে সক্রিয় করামাত্র দীর্ঘ উত্তল রেখা তৈরি করে ছুটবে। তারপরই শোনা যাবে নির্ঘোষ, আর্তনাদ, সামুদ্রিক উচ্ছ্বাস, পানির ঘূর্ণি আর জলস্তম্ভের উত্থান-পতনের শব্দ।

সাতটা পঁয়ত্রিশ। জাহাজগুলোর ওপর ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি, তারমানে এখুনি হয়তো ব্যাকাপ লক্ষ্য করে ছুটে আসবে। উত্তেজিত দস্যুরা চেঁচিয়ে উঠল, যেন শিকার দেখতে পেয়ে আক্রোশে গরগর করে উঠল একদল হিংস্র পশু।

দ্রুত টানেলের ভেতর ঢুকে পড়ল সেরকো। সে সম্ভবত টমাস রসকে ডাকতে গেল।

আচ্ছা, কের কারাইয়ে রসকে যখন জাহাজগুলোকে লক্ষ্য করে ফুলগুরেটর ছুঁড়তে বলবে, তাঁর কি মনে পড়বে আমি তাঁকে কি বলেছি? এখানকার পরিস্থিতি নিজের চোখে দেখার পরও কি তাঁর বোধোদয় হবে না? যদি বুঝতে পারেন কের কারাইয়ে তাঁকে দিয়ে অন্যায় একটা কাজ করিয়ে নিতে চাইছে, তিনি কি প্রতিবাদ করবেন না?

পাঁচ জাহাজ এগোতে শুরু করল। হ্যাঁ, সরাসরি ব্যাকাপের দিকেই আসছে ওগুলো। ওরা হয়তো ধরে নিয়েছে টমাস রস এখনও তাঁর আবিষ্কারের কলা-কৌশল দস্যুদের জানাননি। অন্তত আমার বার্তায় এ-ধরনের আশঙ্কার কথা ছিল না। প্রকৃত তথ্যের অভাবে পাঁচ জাহাজের লোকজন সবাই এখন বিপদে পড়তে যাচ্ছে। যেমন-তেমন বিপদ নয়, একটু পর সমুদ্রের পিঠে ওদের কোন অস্তিত্বই থাকবে না।

টমাস রসকে নিয়ে টানেল থেকে বেরিয়ে এল সেরকো। লঞ্চিং প্যাডের দিকে এগোচ্ছেন রস। নিক্ষেপক মঞ্চের মুখ সমুদ্রের দিকে ফেরানো, একটু ঘুরিয়ে জাহাজগুলোর দিকে তাক করা হলো। টমাস রসের পাশে এসে দাঁড়াল কের কারাইয়ে আর স্পেড। দূর থেকে দেখতে পেলাম রস পুরোপুরি শান্ত, তবে

একটু বোধহয় চিন্তিত। একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারবেন কি করতে যাচ্ছেন তিনি। আমি যতটুকু বুঝি, তাঁর মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে। প্রত্যাখ্যাত হবার কারণে দুনিয়ার সবার ওপর খেপে আছেন তিনি।

টমাস রসের হাতে একটা কাঁচের নল বা টিউব রয়েছে, তাতে আলো লাগলে ঝিলিক দিচ্ছে ভেতরের তরল ডেটোনেইটর। একটা জাহাজ বাকিগুলোকে পিছনে রেখে রওনা দিয়েছে, সেটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন রস। ওটা মাঝারি আকারের একটা ক্রুজার, সাড়ে চার কি পাঁচ মাইল দূরে, ওজন কমবেশি আড়াই হাজার টন। মাস্তুলে পতাকা নেই, গড়ন দেখেও মনে হয় না ফরাসী জাহাজ। প্রথম জাহাজ এই ক্রুজারই আক্রমণ শুরু করতে যাচ্ছে, বাকি চারটে ওটার পিছনে এক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবলাম, ক্রুজারের ক্যাপটেন বোকা নাকি? দস্যুরা তাকে যখন এগোতে দিচ্ছে, সে কামান দাগছে না কেন? একটু পরই তো ফুলগুরেটর তার ক্রুজারকে ধ্বংস করে দেবে।

'মঁশিয়ে রস!' হাত তুলে ক্রুজারটা দেখাল সেরকো। ওটা আর মাত্র সাড়ে তিন কি চার মাইল দূরে। গতি ধীর হলেও এখনও এগিয়ে আসছে।

ঘাড় নেড়ে সাড়া দিলেন রস। লঞ্চিং প্যাডের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তাঁর সামনে পাশাপাশি তিনটে ক্ষেপণাস্ত্র সাজানো। হাত তুলে কি যেন বললেন। সম্ভবত নিক্ষেপক মঞ্চে একাই থাকতে চান। আপত্তি না তুলে কের কারাইয়ে তার শিষ্যদের নিয়ে পিছু হটল। পঞ্চাশ পা পিছিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই।

রস এবার টিউবের ছিপি খুললেন। কয়েক ফোঁটা ডেটোনেইটর পড়ল ক্ষেপণাস্ত্রের একটা ফুটোয়। বিস্ফোরকের সঙ্গে মিশে গেল সেই তরল পদার্থ।

পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড! আমার হৃৎপিণ্ড যেন পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের জন্যে থেমে গেল।

তীব্র একটা শিসের শব্দ উঠল বাতাসে। কেঁপে উঠল লঞ্চিং প্যাড। তিনটে ক্ষেপণাস্ত্র প্রথমে একশো গজের মত ওপরে উঠল, তারপর এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময় ইতস্তত করল, পরমুহূর্তে ছুটল ক্রুজারের দিকে। ক্রুজারটাকে ছাড়িয়ে গেল ওগুলো, তারপর বুমেরাঙের মত ফিরে এসে বিস্ফোরিত হলো। সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ব্যাকাপ দ্বীপ পর্যন্ত থরথর করে কেঁপে উঠল।

তাকিয়ে দেখি সমুদ্রে ক্রুজারটার চিহ্নমাত্র নেই!

দস্যুরা একযোগে উল্লাসে ফেটে পড়ল। এরকম অবিশ্বাস্য দৃশ্য জীবনে তারা দেখেনি।

রস সেই একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা। চোখ দুটো জ্বলছে।

এখন যদি বাকি জাহাজগুলো এগোয়, তাদেরও এই একই অবস্থা হবে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম আমি, ভাবছি এখনও জাহাজগুলো পালাচ্ছে না কেন! এভাবে বোকার মত মৃত্যু আর ধ্বংসকে বরণ করে নেয়ার তো কোন মানে হয় না। দ্বীপটাকে ধ্বংস করতে হলে এই মুহূর্তে রণে ভঙ্গ দেয়া উচিত ওদের। সরাসরি যুদ্ধ করে ফুলগুরেটরের বিরুদ্ধে কোনদিনই ওরা জিততে পারবে না। একমাত্র উপায় দূর থেকে দ্বীপটাকে ঘিরে রাখা, অবরোধ করা। রসদের অভাবে জলদস্যুরা যাতে না খেয়ে মরে।

তারপর আমার মনে পড়ল—এগুলো যুদ্ধজাহাজ, পিছু হটতে জানে না।

একটু পরই জাহাজগুলো ধোঁয়া ছাড়ল, আর তারপরই একসঙ্গে রওনা হলো চারটে জাহাজ। টের পেলাম, পরস্পরের সঙ্গে সঙ্কেত বিনিময় করল ওরা। চারটের মধ্যে তিনটে একটু পিছিয়ে পড়ল, চতুর্থ জাহাজটা ফুলস্পীডে ছুটে আসছে।

ফাটলের ভেতর আর লুকিয়ে থাকতে পারলাম না, বেরিয়ে এলাম বাইরে। এই মুহূর্তে আমি যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছি, দ্বিতীয় ধ্বংস কাণ্ডটা দেখার জন্যে অপেক্ষা করছি রুদ্ধশ্বাসে। নিজের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

জাহাজটা আমার চোখের সামনে প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে। এটাও একটা ক্রুজার। এটারও মাস্তুলে পতাকা নেই। কোন দেশের জাহাজ বোঝার কোন উপায় নেই। গতি ক্রমশ বাড়ছে আরও, যেন ছুটে এসে দ্বীপে আঘাত করতে চায়। হায়, এত জেদ আর তেজ তুমি কার বিরুদ্ধে দেখাচ্ছ হে? এখুনি তো টমাস রসের ফুলগুরেটর তোমাকে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করে দেবে!

হঠাৎ ক্রুজার থেকে ভেসে এল দামামা। শিঙার কান ফাটানো আওয়াজ নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

কী আশ্চর্য! এ শিঙার শব্দ তো আমার অতি পরিচিত। এ সুর যে আমার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। লা মার্সাই। তারমানে ওটা ফরাসী জাহাজ! আমার দেশের জাহাজ। আমার এবং টমাস রসের। অথচ একজন ফরাসী বিজ্ঞানী ওটাকে ধ্বংস করবেন? এ-ও কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

না, অসম্ভব, এ কিছুতেই ঘটতে দেয়া যায় না। রসের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব আমি, চিৎকার করে বলব, 'এখনও চিনতে পারছেন না? ওটা তো আমাদের দেশের জাহাজ!' চিনতে তিনি পারেননি, তবে আমি তাঁকে চেনাব।

আরও জোরে, আরও তীব্র সুরে বেজে উঠল শিঙা। শুধু তাই নয়, জাতীয় সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খুলে গেল পতাকার ভাঁজ। তেরঙা পতাকা

বাতাসে পত-পত উড়ছে। আকাশের গায়ে ঝলসে উঠল যেন নীল, সাদা আর লাল রঙ।

জাতীয় পতাকা উড়তে দেখে টমাস রস কেমন যেন হয়ে গেলেন, মন্ত্রমুগ্ধের মত অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন। আমার মনে হলো, এই মুহূর্তে নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছেন তিনি। পতাকাটা ধীরে ধীরে মাস্তুলের ডগায় উঠছে এখনও। যেন তারই সঙ্গে মিল রেখে টমাস রসের হাতটা শরীরের পাশে ঝুলে পড়ল। তারপর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পিছিয়ে এলেন তিনি। দু'হাতে মুখ ঢাকলেন, সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে।

ঈশ্বর! ও ঈশ্বর! তুমি সত্যি মহান। টমাস রসের বুকে এখনও তুমি দেশপ্রেম জাগিয়ে রেখেছ, সেজন্যে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। টমাস রস, তোমাকেও শ্রদ্ধা জানাই। সত্যি, এখনও দেশকে তুমি ভালবাসো!

কোন দিকে খেয়াল করলাম না, বিপদকেও ভয় করলাম না, ছুটলাম আমি। এই সংকটের মুহূর্তে টমাস রসের পাশে দাঁড়াতে হবে আমাকে। দ্বীপের দিকে ছুটে আসছে ফ্রান্স! আমার দেশের জাহাজ! আমার দেশের মানুষ!

কিন্তু আমার আগে দস্যুরাই তাঁর কাছে পৌঁছাল। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। ওরা রসকে গায়ের জোরে ক্ষেপণাস্ত্রের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। রসও যাবেন না, ওদের সঙ্গে রীতিমত লড়াই শুরু করে দিয়েছেন।

কের কারাইয়ে আর সেরকোকে এগিয়ে আসতে দেখে দস্যুরা সরে গিয়ে জায়গা করে দিল। কের কারাইয়ে আঙুল তুলে জাহাজের দিকে রসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে, তার হুকুম মত ওটার দিকে ফুলগুরেটর ছুঁড়তে হবে। প্রবলবেগে মাথা নেড়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন রস।

ক্যাপ্টেন স্পেড আর তার কয়েকজন সঙ্গী গালমন্দ করছে রসকে। ভয় দেখিয়ে কি সব বলছে। তাদের একজন রসের গায়ে হাত তুলল। আরেকজন চেষ্টা করল কাঁচের টিউবটা কেড়ে নিতে।

নিজেকে ছাড়িয়ে পিছিয়ে এলেন রস। পরমুহূর্তে হাতের টিউবটা পাথরের ওপর ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে ভেঙে ফেললেন।

সেই মুহূর্তে আতঙ্কে নীল হয়ে গেল জলদস্যুরা। ক্রুজারটা ইতিমধ্যে 'বিপজ্জনক এলাকা' পার হয়ে এসেছে। জাহাজের লোকেরা কামান দাগছে ঘন ঘন। কিন্তু টমাস রসের কি পরিণতি হলো? কামানের গোলা লাগল নাকি তাঁর গায়ে? না, তিনি আহত হননি। ওই তো ছুটছেন, ছুটতে ছুটতে ঢুকে পড়লেন টানেলের ভেতর। তাঁর পিছু নিয়ে ভেতরে ঢুকল কের কারাইয়ে, সেরকোসহ আরও অনেকে। ব্যাকাপ ছাড়া তারা আর পালাবেই বা কোথায়!

আমি? আমি এখন কি করব? ওই গহ্বরেই ফিরে যাব নাকি?

না, অসম্ভব! একবার যখন বেরিয়ে আসতে পেরেছি, ওই বন্দীশালায় আর আমি ফিরছি না। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে যদি মরতেও হয়, সে-ও ভাল। আমার দেশের জাহাজ যখন দ্বীপে নোঙর ফেলবে, শুধু তখনই শেষ হবে আমার এই ডায়েরী লেখা।

**(এঞ্জিনিয়ার সিমোন আর্‌ৎ-এর ডায়েরী এখানেই শেষ)**

# আঠারো

লেফটেন্যান্ট ডেভনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, ডুবোজাহাজ সোর্ড নিয়ে জলদস্যুদের আস্তানা ব্যাকাপের ভেতর ঢুকে পড়তে হবে। সোর্ড যখন ফিরল না, কর্তৃপক্ষ ধরে নিলেন সদলবলে নিহত হয়েছেন লেফটেন্যান্ট ডেভন। তবে রহস্য একটা থেকেই গেল—সোর্ড কি টানেলে ঢোকার সময় দুর্ঘটনাবশত ধ্বংস হয়েছে, নাকি কের কারাইয়ে আর তার শিষ্যরা ওটাকে ধ্বংস করেছে?

ভাসমান ছোট্ট কাঠের বাক্সে যে বার্তা পাওয়া গিয়েছিল সেটা পড়ে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ফুলগুরেটর তৈরি হবার আগেই বিজ্ঞানী টমাস রসকে ধরে নিয়ে আসতে হবে। লেফটেন্যান্ট ডেভনকে সেই নির্দেশ দিয়েই পাঠানো হয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন কোনভাবে একবার যদি টমাস রস আর সিমোন আর্‌ৎকে জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্ত করে আনা যায় তাহলে আর ফুলগুরেটর নিয়ে দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে। কিন্তু বেশ ক'টা দিন অপেক্ষা করার পরও সোর্ড যখন ফিরল না, কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিলেন এবার দ্বিতীয় অভিযান শুরু করার সময় হয়েছে। ঠিক হলো, দ্বিতীয় অভিযানটা হবে পুরোপুরি সামরিক কায়দায়।

কিন্তু প্রস্তুতি নিতেই আট হপ্তা কেটে গেল। কর্তৃপক্ষ ধারণা করলেন, এতগুলো দিন যখন পেরিয়ে গেছে, কের কারাইয়ে নিশ্চয়ই ফুলগুরেটর-রহস্য জেনে নিয়েছে। তাই সবদিক বিবেচনা করে কয়েকটা দেশকে নিয়ে একটা চুক্তি করতে হলো—সংশ্লিষ্ট প্রতিটি রাষ্ট্রের নৌ-বাহিনী একটা করে যুদ্ধজাহাজ বারমুডার পানিতে পাঠাবে। সেই চুক্তি অনুসারেই পাঁচটা যুদ্ধজাহাজ প্রস্তুতি নিল। উদ্দেশ্য একটাই—ব্যাকাপের ভেতর একটা গহ্বর আছে, প্রথমে ওই গহ্বরের দেয়াল আধুনিক গোলন্দাজ বিদ্যার সাহায্যে নিশ্চিহ্ন করতে হবে, তারপর জলদস্যুদের বংশ ধ্বংস করতে হবে।

ভার্জিনিয়ার চেসাপিক-এ জড়ো হলো জাহাজগুলো। তারপর রওনা হয়ে বারমুডায় পৌঁছাল তারা সতেরো নভেম্বর সন্ধ্যার দিকে। আক্রমণ শুরু হলো

পরদিন সকালে। প্রথমে একটা মাত্র জাহাজ ব্যাকাপের দিকে ছুটল। দ্বীপ যখন চার মাইল দূরে, এই সময় উড়ন্ত সসার-এর মত তিনটে ক্ষেপণাস্ত্র চোখের পলকে ধেয়ে এল, জাহাজটার ওপর পৌঁছে বুমেরাঙের মত বাঁক নিয়েই বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পানির তলায় তলিয়ে গেল যুদ্ধজাহাজ। এ এক আশ্চর্য বিস্ফোরক, সবকিছু চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন করে দিল। গোলন্দাজ বিদ্যায় আজ পর্যন্ত এরকম কোন বিস্ফোরকের কথা শোনা যায়নি। বাকি যুদ্ধজাহাজগুলো যথেষ্ট দূরে থাকলেও, ওই বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায় সেগুলো ডুবে যাবার উপক্রম হয়েছিল।

এই আকস্মিক ও অভূতপূর্ব হামলা থেকে কর্তৃপক্ষ দুটো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেল। এক, কের কারাইয়ের হাতে ফুলগুরেটর আছে। দুই, নতুন এই মারণাস্ত্রের বিধ্বংস ক্ষমতা কল্পনাকেও হার মানায়।

সামনের যুদ্ধজাহাজ ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর বাকি জাহাজ থেকে একটা করে নৌকা নামানো হয় সমুদ্রে, জাহাজীদের কেউ বেঁচে থাকলে উদ্ধার করে আনবে। তারপর নিজেদের মধ্যে সঙ্কেত বিনিময় করল, এবং হামলা করার জন্যে একসঙ্গে এগোল ব্যাকাপের দিকে।

বাকি চারটে যুদ্ধজাহাজের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন হলো তনাঁৎ। ওটা একটা ফরাসী রণতরী। তনাঁৎ বাকি তিনটে জাহাজকে পিছনে ফেলে সামনে এগোল। দেখতে দেখতে প্রথম জাহাজ যেখানে নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেই জায়গাটাও পার হয়ে গেল সে। এবার তনাঁৎ দ্বীপ লক্ষ্য করে কামান দাগবে। তবে তার আগে মাস্তুলে তেরঙা পতাকা ওড়াল সে। জাহাজের পাটাতনে দাঁড়িয়ে, চোখে দূরবীন, তনাঁৎ-এর নাবিকরা দেখলেন কের কারাইয়ের লোকজন ভয় পেয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। এর ফলে দস্যুদের ওপর কামানের গোলা ছুঁড়তে আরও সুবিধে হলো। পাল্টা হামলা না চালিয়ে ব্যাকাপের গহ্বরে ঢুকে পড়ছে দস্যুরা।

এর মাত্র কয়েক মিনিট পরই অকস্মাৎ জল-স্থল অন্তরীক্ষ এমন প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেলো, মনে হলো যেন আটলান্টিকের পানিতে গোটা আকাশটাই ভেঙে পড়েছে।

একটু আগে যেখানে ছোট্ট দ্বীপটা ছিল, দেখা গেল পাথর আর ধোঁয়া ছাড়া কিছুই আর নেই সেখানে। এখনও ওই জায়গায় তুমুল শিলাবৃষ্টি হচ্ছে।

আকস্মিক ঝাঁকিটার কারণ কি? কি ফাটল? কে ফাটাল? তবে কি জলদস্যুরাই বিস্ফোরক ফাটিয়ে উড়িয়ে দিল নিজেদের আস্তানা ব্যাকাপ দ্বীপ?

প্রবল শিলাবৃষ্টিতে খানিকটা জখম হলো তনাঁৎও। তারপরও কালবিলম্ব না

করে কমান্ডার নৌকা নামানোর নির্দেশ দিলেন। নাবিক ও অফিসাররা যত দ্রুত সম্ভব নৌকা নিয়ে দ্বীপটার দিকে ছুটলেন।

ধোঁয়া ও আবর্জনার মধ্যে দ্বীপে নেমে আহত লোকজনকে খুঁজতে শুরু করলেন ওঁরা। কিন্তু পাওয়া গেল শুধু মানুষের ছিন্নভিন্ন লাশ। কোথাও পড়ে আছে কাটা মুণ্ডু, কোথাও ছিন্ন একটা হাত, কোথাও বা পায়ের খানিকটা অংশ। আহত কোন মানুষকে পাওয়া গেল না। গহ্বরটারও কোন অস্তিত্ব নেই। যেখানে গহ্বর ছিল সেখানে ক্ষুব্ধ গর্জন করছে আটলান্টিকের বিপুল জলরাশি।

দ্বীপের উত্তর-পুব দিকে একজন মাত্র আহত মানুষকে খুঁজে পেলেন অফিসাররা। তখনও বেঁচে আছে, তবে না থাকারই মত। নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা বোঝা যায় না। তবু তাঁকে বাঁচানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করা হলো। অজ্ঞান লোকটার পাশেই পড়ে থাকতে দেখা গেল খোলা একটা নোটবুক আর পেন্সিল। নোটবুকে লেখা শেষ বাক্যটা অসম্পূর্ণ। ওই নোটবুক দেখেই বোঝা গেল আহত ও অজ্ঞান ভদ্রলোক একজন ফরাসী এঞ্জিনিয়ার, নাম সিমোন আর্‌ৎ। ধরাধরি করে প্রথমে নৌকায়, তারপর তনাঁৎ-এ তোলা হলো তাঁকে। চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হলো। কিন্তু জাহাজের ডাক্তাররা ব্যর্থ হলেন, কোনভাবেই তাঁরা সিমোন আর্‌ৎ-এর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারলেন না।

সিমোন আর্‌ৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকলেও তাঁর লেখা ডায়েরী পড়ে সবই জানা গেল।

আনন্দের খবর হলো এই যে শেষ পর্যন্ত সিমোন আর্‌ৎ জ্ঞান ফিরে পেলেন। চিকিৎসকদের আন্তরিক চেষ্টায় এ-যাত্রা প্রাণেও বেঁচে গেলেন তিনি। গোটা দ্বীপে একা শুধু তিনিই বাঁচলেন।

সুস্থ হবার পর সিমোন আর্‌ৎ মুখ খুললেন। তাঁর বিশ্বাস, ফ্রান্সের তেরঙা পতাকা দেখে টমাস রস প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছিলেন, সেই সঙ্গে প্রবল অনুতাপেও দগ্ধ হয়েছিলেন। নিজের ভুল বুঝতে পারেন তিনি, আর তাই কেউ বাধা দেয়ার আগেই এক ছুটে গহ্বরের ভেতর ঢুকে গুদাম ভর্তি বিস্ফোরকের ভেতর তরল ডেটোনেইটর ছিটিয়ে দেন। ব্যস, সেই মুহূর্তে গোটা দ্বীপ বিস্ফোরিত হয়।

সব দিক বিবেচনা করলে বোঝা যায় সিমোন আর্‌ৎ-এর বিশ্বাস বা অনুমান মিথ্যে নয়। দ্বীপের সঙ্গে কের কারাইয়ে আর তার দস্যুদল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তবে দুঃখজনক ব্যাপার হলো তাদের সঙ্গে টমাস রসও, তাঁর বিরল আবিষ্কার সহ, চিরকালের জন্যে দুনিয়ার বুক থেকে হারিয়ে গেলেন। নির্যাতন ও উপহাসের শিকার এই বিপথগামী বিজ্ঞানী দুনিয়ার ওপর খেপে গিয়ে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। আসলে নিজেকে তিনি ভাল করে চিনতেন না। যাই ঘটে থাকুক, সবশেষে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেম, তাঁর

বিবেক। পাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনি আত্মাহুতি দিয়েই করে গেলেন। স্বদেশের তেরঙা পতাকা দেখে টমাস রস যেভাবে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিলেন, ওই দৃশ্যটার কথা জীবনে কখনও ভুলতে পারবেন না সিমোন আর্‌ৎ।

***

# বনের গল্প

## মূল: জিম করবেট

## রূপান্তর: অনীশ দাস অপু

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

## পেত্নীর বাঁশি

ভূতের গল্প বলছে ডানসে।

বালক জিম সহ চোদ্দজন ছেলেমেয়ে, কালাধুঙ্গির বোয়ার নদীর পুরানো কাঠের সেতুটার ওপর গোল হয়ে বসে সেই গল্প শুনছে। পাশের জঙ্গল থেকে খড়কুটো এনে অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সে-আগুন প্রায় নিভু নিভু। আগুনের লালচে আভায় অন্ধকার যেন আরও গাঢ়। আসরের মধ্যমণি ডানসে হাত-পা নেড়ে, চেহারায় বিচিত্র ভাব ফুটিয়ে তার ভূতুড়ে অভিজ্ঞতাগুলো এমন ভাবে বর্ণনা করে চলেছে, ছেলেমেয়েরা ভয়ে জড়োসড়ো। বিশেষ করে মেয়েরা একজন আরেকজনকে ঠেলা মেরে ফিসফিস করে বলছে, 'অ্যাই, খবরদার পেছন ফিরে তাকাসনে। আমার ভয় লাগছে।'

ডানসে আইরিশ। কুসংস্কারে ভরা তার মন। জিন-ভূতের আজগুবি ব্যাপারগুলো বিশ্বাসও করে সে। কাজেই ভূতের গল্প বলতে পারে দারুণ বিশ্বাসযোগ্য করে। সাদা কাফনে জড়ানো ছায়ামূর্তি, হাড়ের খটখট আওয়াজ, রহস্যময় ভঙ্গিতে দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়া, শতাব্দী প্রাচীন জমিদার বাড়ির সিঁড়িতে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ—ইত্যাদি নানা বিষয় তার গল্পের প্রতিপাদ্য। জমিদার বাড়িতে যাবার সুযোগ যেহেতু কোনদিনই হবে না তাই ডানসের ভূতের গল্প শুনে ভয় পাচ্ছেন না বালক জিম করবেট। রক্ত হিম করা একটা গল্প মাত্র শেষ করেছে ডানসে, ভীতু একটা মেয়ে তার বান্ধবীকে আবার পেছন ফিরে তাকাতে নিষেধ করছে, এমন সময় রাত্রির নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে গেল মেছো পেঁচার ডাকে। বাজ পড়ে ঝলসে যাওয়া হালদু গাছটার মরা মগডালে সারাদিন বসে ঝিমিয়েছে ওটা। মেছো পেঁচাটার নিরাপদ আশ্রয়স্থল গাছটা। কাক সহ আরও বেশ কিছু পাখির প্রিয় শিকার মেছো পেঁচা—ওদের হাত থেকে লুকিয়ে থাকার জন্যে গাছের কোটর বেছে নেয় বেচারা। গুলতি এবং প্রজাপতির জাল নিয়ে জিম করবেটেরা যখন গভীর জঙ্গলে ঢোকেন, হালদু গাছটাকে ব্যবহার করেন 'ল্যান্ডমার্ক' হিসেবে। প্রিয় আস্তানা ছেড়ে রাতের বেলায় বোয়ার নদীতে মাছ আর ব্যাঙ শিকারে বেরিয়ে

পড়ে মেছো পেঁচা। সেদিনও বেরিয়েছে। তারই সঙ্কেত ওই তীক্ষ্ণ গলার ডাক।

মেছো পেঁচার ডাক অনেকে বাঘের গর্জন বলে ভুল করে। ওটার ডাকে খালের ধারের পিপুল গাছ থেকে তার সঙ্গিনী সাড়া দিল। ডানসে এই সুযোগে ভূতের গল্প বাদ দিয়ে বাঁশির গল্প শুরু করে দিল। বাঁশি-কাহিনী ভূতের গল্পের চেয়েও রোমহর্ষক এবং ভয়ানক। ডানসে বলে বাঁশি হলো শয়তান নারীর আত্মা। থাকে গভীর জঙ্গলে। এমনই ভয়ঙ্কর, যে তার বাঁশির আওয়াজ শুনবে সে তো বটেই, তার চোদ্দ গোষ্ঠীর কপালে পর্যন্ত নেমে আসবে দুর্ভোগ। আর ডাইনীটার মুখোমুখি হলে তো কথাই নেই। তাকে সামনাসামনি দেখা মানে অনিবার্য মৃত্যু। ডানসে বলল বাঁশির সুর আসলে কোন সুর নয়, প্রলম্বিত এক চিৎকার, ঘুটঘুটে আঁধার আর ঝোড়ো রাতে সবচে' বেশি শোনা যায়। ভূত-টূত জিম করবেটকে তেমন আকর্ষণ না করলেও বাঁশির গল্পের প্রতি তাঁর সীমাহীন আগ্রহ। কারণ, এ সব গল্পের ঘটনাস্থল জঙ্গল। জঙ্গল মানেই পাখি। আর পাখির ডিম ও প্রজাপতির সন্ধানে প্রায়ই বনে হানা দেন তিনি।

রহস্যময় বাঁশি নিয়ে নানা গল্প প্রচলিত ভারতে, বিশেষ করে যাদের বাস হিমালয়ের পাদদেশে। বাঁশির মত শব্দ করে যে পেত্নী, তার স্থানীয় নাম চুড়েল। ভয়ঙ্কর পিশাচ, আত্মপ্রকাশ করে সুন্দরী মেয়েমানুষের ছদ্মবেশে। পায়ের পাতা পেছন দিকে থাকে এদের। কোনও মানুষের চোখে চোখ পড়লেই হলো, সাপ যে ভাবে সম্মোহন করে ফেলে পাখিকে, ঠিক তেমনি এই পিশাচিনী তার শিকারকে সম্মোহন করে। সম্মোহিত লোকটির একমাত্র পরিণতি মৃত্যু। চুড়েলের হাত থেকে রক্ষা পাবার একটাই উপায়—মুখোমুখি হয়ে গেলে চোখে হাত চাপা দিতে হবে। কোন ভাবেই যেন চুড়েলের চোখে চোখ না পড়ে। আর চুড়েল যদি বাড়িতে ঢুকে পড়ে, সোজা কাঁথা মুড়ি দিয়ে, মুখ ঢেকে শুয়ে পড়তে হবে।

ডানসে আইরিশ হলেও বহুদিন ধরে ভারতে আছে। গড়গড় বলে যায় স্থানীয় ভাষা, কাজেই জিন-ভূতের প্রতি তার নিজের বিশ্বাস দিয়ে অন্যদেরকে খুব সহজেই প্রভাবিত করতে পারে। ওখানকার পাহাড়ী মানুষেরা ভীতু স্বভাবের নয়, ডানসেরও সাহসের অভাব নেই, কিন্তু সবাই কুসংস্কারে এমন ডুবে আছে যে চুড়েল বা রহস্যময় বাঁশির ব্যাপারটি সত্য না মিথ্যা যাচাই করে দেখার সাহস দূরে থাক, কল্পনাও করেনি কোনদিন। অবশ্য ভারতে কুসংস্কারে বিশ্বাস বিচিত্র কিছু নয়। কালাধুঙ্গির মানুষ, গভীর জঙ্গলে যাতায়াতে যাদের নিজেদের পা দুখানি মাত্র সম্বল, যারা রাতের বেলা পাইন গাছের ডাল দিয়ে মশাল বানিয়ে পথ চলে—কারণ তখনকার দিন খুব কম মানুষের পক্ষেই প্যারাফিন বা কেরোসিন জোগাড় করে হ্যারিকেন জ্বালানো সম্ভব ছিল—তাদের দুঃসাহসী বললে কম বলা হবে। কিন্তু কুসংস্কারের কাছে তারা একেবারে অসহায়। রাত-বিরেতে অশরীরী আত্মাকে ভয়

তো পাবেই।

কুমায়ূনে অনেক দিন ছিলেন জিম করবেট, জঙ্গলে তাঁর বহু রাত কেটেছে। এর মধ্যে মোট তিনবার চুড়েলের ডাক শুনেছেন তিনি—প্রতিবারই রাতের বেলা—আর মাত্র একবার ওটাকে দেখতে পেয়েছেন।

সেটা ছিল মার্চ মাস। সেবার শস্যের বাম্পার ফলনে গ্রামবাসীদের মুখে আনন্দের হাসি, নাচে-গানে মুখর হয়ে ছিল পাহাড়ী গ্রামগুলো। পূর্ণিমার আর দুই দিন বাকি। থালার মত চাঁদের আলোয় রাত হয়ে গেছে যেন দিন। সন্ধ্যা সাড়ে আটটা নাগাদ বোন ম্যাগীকে নিয়ে করবেট নৈশ ভোজে যাবেন—ঠিক সেই সময় রাতের বাতাস ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তীক্ষ্ণ, পরিষ্কার এক চিৎকারে।

চুড়েল ডাকছে!

সাথে সাথে গোটা গ্রামে নেমে এল কবরের নিস্তব্ধতা। জিম করবেটের কটেজ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে, কম্পাউন্ডের ডান দিকের কোণায় একটা হালদু গাছ ছিল অনেক বয়স গাছটার। শকুন, ঈগল, বাজ, চিল, কাক আর জলচর সারসের বংশধররা ওটার ছাল বলতে কিছু রাখেনি। বছরের পর বছর ধরে ঠুকরে ঠুকরে তুলেছে। মগডালগুলোর দশাও শোচনীয় করে ছেড়েছে। উত্তুরে প্রবল ঠাণ্ডা হাওয়ার কারণে সদর দরজা বন্ধ ছিল। করবেট তাঁর বোনকে নিয়ে দরজা খুলে পা রাখলেন বারান্দায়। ঠিক তখন আবার ডাক ছাড়ল চুড়েল। অমানুষিক চিৎকারটা এসেছে হালদু গাছ থেকে, মগডালে বসে আছে ওটা, ঝলমলে আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল।

চুড়েলের ডাক, চিৎকার বা আর্তনাদ, যে বিশেষণেই ভূষিত করা হোক না কেন, লিখে ঠিক বোঝানো যাবে না শব্দটা। শুনলে মনে হয় তীব্র বিক্ষোভে হাহাকার করছে কারও আত্মা বা ভয়ানক যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে কোন মানুষ। জিম করবেট এমন অদ্ভুত শব্দ জীবনেও শোনেননি। জঙ্গলে ঘোরা তাঁর আজন্ম অভ্যাস, অথচ মনে পড়ে না এ রকম আর্তনাদ বা ডাক কখনও শুনেছেন। জঙ্গলের নানা রকম বিচিত্র কোন শব্দের সাথে এটাকে মেলানো যাবে না। এটা একদম আলাদা কিছু। শুনলে মনে হয় এ পৃথিবীর কোন শব্দ নয়; ভূতুড়ে, রোমহর্ষক, রক্ত জমাট বেঁধে যেতে চায়, বন্ধ হয়ে আসে যেন হৃৎস্পন্দন।

এমন চিৎকার আগেও শুনেছেন জিম করবেট। তাঁর ধারণা এটা পাখির ডাক। হতে পারে কোন অভিবাসী পেঁচা। অনেক দূর থেকে উড়ে এসেছে। কুমায়ূনের প্রতিটি পাখি এবং তাদের ডাক চেনেন করবেট। তিনি নিশ্চিত এ পাখি এ জঙ্গলের নয়। ঘরে ঢুকে একজোড়া ফিল্ড গ্লাস নিয়ে এলেন তিনি। কাইজারের আমলের দূরবীন। আর্টিলারী দেখার কাজে ব্যবহার হত। চোখে ফিল্ড গ্লাস লাগিয়ে পাখিটাকে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখলেন জিম করবেট। ওটার যে সব

বৈশিষ্ট্য তাঁর চোখে পড়ল তা হলো:

ক. সোনালি ঈগলের চেয়ে পাখিটা আকারে সামান্য ছোট।

খ. পা-জোড়া বেশ লম্বা। লম্বা পায়ের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

গ. লেজটা খাটো। তবে পেঁচার লেজের মত ছোট নয়।

ঘ. পেঁচার মত বড় আর গোল নয় মাথাটা। ঘাড়ও ছোট নয়।

ঙ. মাথায় ঝুঁটি বা 'শিং' নেই।

চ. আধ মিনিট বিরতি দিয়ে দিয়ে ডেকে ওঠে। ডাকার সময় মাথাটা আকাশের দিকে তুলে ধরে, ঠোঁট জোড়া অনেকখানি ফাঁক করে ফেলে।

ছ. গায়ের রঙ মিশমিশে কালো; বাদামীও হতে পারে–চাঁদের আলোয় কালো আর বাদামীর ফারাক বোঝা কঠিন।

করবেটের গান র‍্যাকে .২৮ বোরের একটা শটগান আর হালকা একটা রাইফেল ছিল। শটগান দিয়ে কাজ হবে না, পাখিটা রেঞ্জের বাইরে। রাইফেল ব্যবহার করবেন কিনা ভেবে দ্বিধায় ভুগতে লাগলেন তিনি। কারণ চাঁদের আলোর ওপর ভরসা করে লক্ষ্য স্থির করা মুশকিল। আর যদি গুলি লাগাতে না পারেন, তাহলে গ্রামের লোকজনের মনে কুসংস্কার আরও জেঁকে বসবে—চুড়েল সত্যি এক ভয়ঙ্কর শয়তানী শক্তি, রাইফেলের বুলেটও তার ক্ষতি করতে পারে না।

আরও কয়েকবার ডাকার পর পাখিটা ডানা মেলল। উঠে পড়ল গাছ থেকে। অদৃশ্য হয়ে গেল রাতের আঁধারে।

চুড়েলের ডাক শোনার পর গ্রামবাসীরা সেই যে চুপ মেরে গেছে, আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। পরদিন চুড়েল বিষয়ে কেউ কোন কথাই বলল না। জিম করবেটকে ছেলেবেলায় তাঁর এক শিকারী বন্ধু কুনওয়ার সিং বলেছিল, 'যখন জঙ্গলে ঢুকবে, ভুলেও বাঘের নাম মুখে আনবে না। যদি আনো, সাথে সাথে হালুম করে চলে আসবে বাঘ।'

চুড়েলের ব্যাপারেও কালাধুঙ্গির মানুষের সে-রকম বিশ্বাস। তাই তারা কখনও ওই জিনিস নিয়ে কথা বলে না।

কালাধুঙ্গিতে যে দু'টি পরিবার শীতের ছুটি কাটাতে এসেছে তাদের সদস্য সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। ছোটরাই হবে অন্তত জনা চোদ্দ। তবে এ দলে জিম করবেটের ছোট ভাইটি খুবই কম বয়স বলে ঠাঁই পায়নি। কাজেই অগিকুণ্ড ঘিরে বসা বা সবাই মিলে নদীতে গোসল করতে যাবার মজা থেকে সে বঞ্চিত। চোদ্দজনের মধ্যে সাতটি মেয়ে—বয়স নয় থেকে আঠারো, বাকি সাতজন ছেলে—বয়স আট থেকে আঠারো। করবেট এদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। দলের সবচে' কমবয়েসী সদস্য হবার কারণে বেচারী করবেটের ভাগ্যে এমন এক দায়িত্ব জুটেছে, কাজটা করতে ভয়ানক বিরক্ত বোধ করেন তিনি। করবেটদের বাড়ির

সীমানার মধ্যে একটি খাল ছিল। রোববার বাদে প্রতিদিন মেয়েরা ওখানে গোসল করতে যেত। তখন করবেটের কাজ ছিল মেয়েদের তোয়ালে এবং নাইটড্রেস বয়ে নিয়ে যাওয়া এবং গোসলের পুরো সময়টা তাদের পাহারা দেয়া। হঠাৎ যদি কোন পুরুষ লোক এসে পড়ে খালের ধারে এজন্যে পাহারা দিতে হয়। খালের বিপরীত দিকে একটা সরু আল আছে। জঙ্গল থেকে লাকড়ি জোগাড় করতে বা জামা-কাপড় ধোয়ার প্রয়োজন হলে লোকজন মাঝে মাঝে রাস্তাটা ব্যবহার করে। খালটা দশ ফুট চওড়া। তিন ফুট গভীর। একটা ইনলেট বা সরু খাঁড়িও আছে। করবেটদের বাগান কিং অভ কুমায়ুন-এ জল সেচের ব্যবস্থা করা হয় ওটা দিয়ে। জেনারেল স্যার হেনরী রামসে খালটার বেড বা তলদেশের মাটি খুঁড়ে ইনলেটটাকে ছয় ফুট গভীর করে দিয়েছিলেন। জিম করবেটকে প্রতিদিন সতর্ক নজর রাখতে হত খাঁড়িটার ধারে যাতে মেয়েরা না আসে। ডুবে যাবার ভয় আছে।

খালটা তিন ফুট গভীর হলে কি হবে, বেশ স্রোত। ফিনফিনে সুতি কাপড়ের নাইট ড্রেস পরে মেয়েরা গোসল করার সময় মাঝে মাঝে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যায়। মেয়েরা করে কি, খালের ধারে এসেই লাফিয়ে পড়ে পানিতে। হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ে। জামা-কাপড় না সামলে, অসতর্ক হয়ে লাফ দিলে, স্রোতের টানে কাপড় উঠে যায় মাথার ওপর, ভয়ানক বিব্রত হয়ে পড়ে তারা। এ রকম ঘটনা ঘটলে, যা প্রায়ই ঘটে, জিম করবেটের ওপর কঠোর নির্দেশ রয়েছে তখন অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

করবেট বেচারা যখন মেয়েদের পাহারা দিতেন এবং মাঝে মাঝে প্রয়োজনে মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাতেন, তখন ছেলেদের দল গুলতি আর মাছ ধরার বড়শি নিয়ে, আল ধরে খালের শেষ মাথার উদ্দেশে রওনা হয়ে যেত। একই সাথে গুলতি দিয়ে তাদের অবিরাম টার্গেট প্রাকটিস চলত। সামাল গাছের সবচে' উঁচু ডালের ফুলটা কে গুলতি মেরে ফেলে দিতে পারে, সে প্রতিযোগিতায় তারা ব্যস্ত থাকত। তবে ওদের সবচে' মজা পাখি শিকারে। কত হরেক রঙের পাখি যে ছিল! ঝুঁটিঅলা ড্রংগো, সোনালি ওরিওল, গোলাপী প্যাস্টর; এরা সামাল ফুলের মধু খায়। গোলাপী মাথার স্লেট রঙা, লম্বা লেজওয়ালা টিয়ে সামাল ফুলের খানিকটা অংশ ঠুকরে খেয়ে ফেলে দেয় মাটিতে। হরিণ এবং শুয়োররা ওগুলো আবার পরে খায়। ছিল ঝুঁটিঅলা মাছরাঙা। কেউ বিরক্ত করলে খালের ধারে উড়তে থাকে। আর সব সময়ই দেখা মিলত বোয়ার সেতুর ধারের হালদু গাছের পেঁচাটার সঙ্গীকে। এই পেঁচাটার আস্তানা খালের ওপর ঝুলে থাকা একটা পিপুল গাছ। একটা ডালে থাকত সে। এটাকে টার্গেট করে অনেকেই গুলতি ছুঁড়েছে, কিন্তু কেউ কখনও লাগাতে পারেনি।

খালের শেষ মাথায় পানি বেশ গভীর। এখানে পৌঁছা মাত্র হুড়োহুড়ি লেগে

যেত ছেলেদের মধ্যে। কে বেশি মাছ ধরতে পারে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত। কে বড়শিতে আধার গাঁথতে পারে না তা নিয়েও হাসাহাসি চলত। বড়শিগুলো সবই বাঁশ কেটে তৈরি। মাছ ধরা পর্ব শেষ হত ছেলেরা ক্লান্ত হয়ে পড়লে অথবা আধার শেষ হয়ে গেলে কিংবা কারও হাত লেগে আধারের পাত্রটা যদি হঠাৎ পানিতে পড়ে যেত। কালাধুঙ্গির নদীতে প্রচুর মাছ ছিল তখন—সবাই কিছু না কিছু মাছ পেয়েই যেত। অন্তত ছোট সাইজের মাহসির হলেও পেত। ছেলেরা যখন মাছ ধরা শেষে মহা ফুর্তিতে সাঁতার কাটত বালক জিম করবেট তখন মাইলখানেক দূরে বিরস বদনে মেয়েদের পাহারা দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে তাঁকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাতে হত অন্য দিকে কিংবা বকা খেতে হত ঠিকঠাক নজর না রাখার জন্যে।

ছোট মানুষ করবেট কতদিকে লক্ষ রাখবেন? হয়তো বুড়ো এক গ্রামবাসী মাথায় লাকড়ির বোঝা নিয়ে খালের পাড় দিয়ে যাচ্ছে, খেয়াল করেননি করবেট, মেয়েরা বকতে শুরু করে দিল তাঁকে। তবে মেয়েদের পাহারা দিতে গিয়ে একটা সুবিধে হত জিমের—দুই পরিবারের ছেলেদের নিয়ে, বিশেষ করে ডানসে আর নীল ফ্লেমিংকে নিয়ে ওদের গোপন পরিকল্পনার কথা জেনে ফেলতেন আগেভাগে।

ডানসে আর নীল দু'জনেই আইরিশ। তবে এর বেশি আর মিল নেই তাদের মধ্যে। ডানসে বেঁটে। গা ভর্তি লোম। গ্রিজলি ভল্লুকের মতই শক্তিশালী। নীল লম্বা, রোগা, গায়ের রঙ ধবধবে। ডানসে সব সময় রাইফেল কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, বাঘ শিকার ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না। নীল আবার জঙ্গল ভীষণ ভয় পায়। জীবনে বন্দুক চালায়নি। এরা দু'জনেই মেয়েদের প্রেমে পাগল। এ কারণেই কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। ডানসের বাবা ছিলেন জেনারেল। ডানসে আর্মিতে যেতে রাজি হয়নি বলে তাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেছেন। সে করবেটের বড় ভাইদের সাথে পাবলিক স্কুলে পড়েছে। ফরেস্ট সার্ভিসে চাকরি করেছে কিছুদিন। সেটা খুইয়ে এখন পলিটিকাল সার্ভিসে চাকরি করার স্বপ্ন দেখছে। নীল বেকার নয়। করবেটের ভাই টমের সহকারী হিসেবে কাজ করে ডাকঘরে। একজন বেকার, অপরজনের সামান্য চাকরি, জানে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেয়া যাবে না। তবে স্বপ্ন দেখতে দোষ কি? মেয়েদের নিয়ে তাই ওরা নানা সুখ-কল্পনায় বিভোর, সেই সাথে পারস্পরিক ঈর্ষাবোধও বেড়ে চলেছে।

মেয়েরা জানে এই দুই শ্রীমান তাদের প্রতি আকৃষ্ট। তাই তারাও সুযোগ পেলে মজা করে ওদেরকে নিয়ে।

খালের পাড়ে পাহারা দেয়ার সময় করবেট ওদের নিয়ে মেয়েদের হাস্য-রসিকতা সবই শুনতে পেতেন। জানতে পারেন শেষবার নীল যখন এল কালাধুঙ্গিতে, মেয়েদের নিয়ে নাকি খুব বেশি কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। তবে

ডানসের আচরণ ছিল অপেক্ষাকৃত কোমল এবং ধীর। মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস নেই। কাজেই নীলকে একটু 'পচানো' দরকার আর ডানসের জন্যে একটু সাহস। 'তবে খুব বেশি সাহস যোগানোর দরকার নেই,' করবেট শুনতে পান এক মেয়ে বলছে তার বান্ধবীকে, 'তাহলে ডানসেও নীলের মত স্বপ্নানুরাগী হয়ে উঠতে পারে।' 'স্বপ্নানুরাগী' কথার অর্থ জানা নেই খুদে করবেটের। মানে জিজ্ঞেস করার সাহসও তিনি পান না। শুনতে পান মেয়েরা নীল এবং ডানসে দু'জনকে নিয়েই এবার মজা লোটার ফন্দি করেছে। নানা পরিকল্পনা করা হলো। শেষে একটি পরিকল্পনার ব্যাপারে সকলে সায় দিল। পরিকল্পনা সফল করার জন্যে জিমের ভাই টমের সাহায্য লাগবে। শীতের সময় নৈনিতালে কাজটাজ তেমন থাকে না। নীল প্রতি শনিবার সন্ধ্যা থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত অনুপস্থিত থাকে অফিসে। টমও কিছু বলে না। এই ছোট্ট ছুটিটা নীল কালাধুঙ্গিতে দুই পরিবারের সাথে পালা করে কাটায়। দুই পরিবারই তাকে বেশ পছন্দ করে তার অমায়িক আচরণের জন্যে।

পরিকল্পনা মাফিক টমের কাছে চিঠি পাঠানো হলো, নীলকে যেন সে আসছে শনিবার সন্ধ্যায় যে কোন ছুতোয় আটকে রাখে। নৈনিতাল থেকে কালাধুঙ্গির দূরত্ব পনেরো মাইল। নীল হেঁটেই আসে। টমকে বলা হলো নীলকে এমন একটা সময় ছাড়বে যাতে ওর কালাধুঙ্গি পৌঁছুতে রাত হয়ে যায়। যাত্রার আগে টম নীলকে আভাস দেবে। নীলের আসতে দেরি দেখলে মেয়েরা তার জন্যে রাস্তার ধারে অপেক্ষায় থাকবে। নীল যাত্রা শুরু করবে, তারপর হবে আসল মজা। আর এ মজাটুকু পাবার জন্যেই এই মহাপরিকল্পনা। ডানসেকে বলা হবে ভল্লুকের চামড়ার পোশাক পরে সে যেন মাইল দুই দূরে, নৈনিতালের রাস্তাটা যেখানে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে, সেখানে চলে যায়। মেয়েরা তার জন্যে ওখানে অপেক্ষা করবে। ডানসে বাঁকে পৌঁছে লুকিয়ে থাকবে পাথরের আড়ালে, নীল ওখানে পৌঁছা মাত্র সে ভল্লুকের মত গর্জন করে লাফিয়ে পড়বে প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর। তখন সত্যি দারুণ মজার ব্যাপার হবে। নীল যখন পরে নিজের বীরত্বের কথা বলতে যাবে মেয়েদের কাছে, মেয়েরা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে, তখন রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটবে ভল্লুকবেশী ডানসের। তারপর কি ঘটবে বোঝাই যায়।

তবে ভল্লুক সাজতে প্রথমে রাজি হচ্ছিল না ডানসে। কিন্তু যখন বলা হলো, হপ্তা দুই আগের পিকনিকে হ্যাম স্যান্ডউইচে লাল ফ্ল্যানেলের কাপড় গুঁজে দিয়ে তাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার পরিকল্পনাটি ছিল নীলের, তারপর আর আপত্তি করল না ডানসে।

কালাধুঙ্গি-নৈনিতাল রোডে সন্ধ্যার পর লোক চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় ভল্লুকের চামড়া গায়ে মুড়িয়ে, মেয়েদের নির্দেশে কখনও চার হাত-পায়ে, কখনও দুই পায়ে লাফাতে লাফাতে ওই রাস্তায় হাজির হয়ে গেল ডানসে।

চামড়াটা তার শার্টের সাথে সেলাই করে দেয়া হয়েছে, ঘেমে নেয়ে গেল বেচারা। ওদিকে নৈনিতালে নীল ছুটকো কাজে আটকা পড়ে ভয়ানক বিরক্ত, তাকে যখন ছাড়া হলো ততক্ষণে বিকেল প্রায় শেষ। যাবার আগে তার হাতে একটা শটগান ধরিয়ে দিল টম দুটো কার্তুজ পুরে। বারবার বলল একান্ত প্রয়োজন ছাড়া যেন গুলি না ছোঁড়ে।

নৈনিতাল থেকে কালাধুঙ্গির প্রায় গোটা রাস্তাটাই উতরাইয়ের মত, প্রথম আট মাইল যেতে হয় নানা শস্য খেতের ভেতর দিয়ে। তারপর রাস্তাটা সরাসরি চলে গেছে কালাধুঙ্গির দিকে, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। ডানসে আর মেয়েরা তাদের নির্ধারিত জায়গায় অপেক্ষা করছে। সাঁঝের আঁধার সবে ঘনিয়ে আসছে, এমন সময় নীলের গলা শোনা গেল। ভয় তাড়াতে উঁচু গলায় গান ধরেছে। (মেয়েরা পরে স্বীকার করেছে, অত চমৎকার গলায় নীলকে তারা কখনও গাইতে শোনেনি) নীল গাইতে গাইতে বাঁকটার কাছে এসেছে, ভয়ানক গর্জন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ভল্লুকবেশী ডানসে। ভল্লুকটাকে দেখে আত্মা উড়ে গেল নীলের। তবে সাহস হারাল না। ভল্লুকটাকে এগিয়ে আসতে দেখে শটগান তাক করে ধরল নীল। দুটো ব্যারেলই ফায়ার করল। ধোঁয়ায় সামনের দৃশ্যটা ঢেকে গেল। নীলের মনে হলো সে ভল্লুকটাকে ঢাল বেয়ে পড়ে যেতে শুনেছে। দেরি না করে সে দিল ছুট। ঠিক তখন মেয়েরা দৌড়ে এল ওদিকে। ওদের দেখে বন্দুক উঁচিয়ে ধরল নীল। সগর্বে বলল এইমাত্র সে বিশালদেহী এক ভল্লুককে গুলি করেছে। ভল্লুকটা তাকে হামলা করতে যাচ্ছিল। ভল্লুকের কথা শুনে মেয়েরা ভয়ে বাঁচে না। জানতে চাইল ভল্লুকটার কি দশা হয়েছে। নীল ঢালের দিকে ইঙ্গিত করে বলল ওখানে পড়ে আছে ভল্লুকটা। মেয়েদের আমন্ত্রণ জানাল সে তার সাথে ভল্লুক দেখতে যেতে। অভয় দিল, এক গুলিতে সে সাবাড় করে দিয়েছে জানোয়ারটাকে। কিন্তু নীলের কথায় ভরসা পেল না মেয়েরা। বলল নীল একাই যাক। মেয়েদের চোখে জল দেখে নীল ভাবল ভল্লুকের হামলা থেকে বেঁচে গেছে সে, এ আনন্দে কাঁদছে তারা। কাজেই মহা উৎসাহে নামতে শুরু করল সে ঢাল বেয়ে মরা ভল্লুক উদ্ধার করে আনতে।

এরপর ডানসে কি বলেছে নীলকে বা নীলের সাথে ডানসের কি কথা হয়েছে জানা সম্ভব হয়নি; তবে অনেকক্ষণ পর দু'জন টলতে টলতে উঠে এল রাস্তায়। মেয়েরা ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ডানসের ঘাড়ে বন্দুক আর নীলের হাতে ভল্লুকের চামড়া। ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লেও ভল্লুকের মোটা চামড়ার কারণে ব্যথাট্যথা পায়নি ডানসে। বলল বুক লক্ষ্য করে তাকে গুলি করেছিল নীল। তাল সামলাতে না পেরে সে পড়ে যায়। নীল ব্যাখ্যা করল বন্দুকটা সে কোত্থেকে পেয়েছে। আরেকটু হলেই ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল। পুরো দোষ সে

চাপিয়ে দিল টমের ওপর।

সোমবার সরকারী ছুটি। রোববার রাতে টম এল বাড়িতে। মেয়েরা পারলে তাকে চিবিয়ে খায়। সে কি করে নীলের মত একটা আনাড়ির হাতে গুলিভরা বন্দুক তুলে দিল। আরেকটু হলে ডানসেকে খুন করে ফেলেছিল সে। টম সমস্ত বকা নীরবে সয়ে গেল, ডানসে গুলি খেয়ে মরে গেছে ভেবে তার অকাল মৃত্যুতে মেয়েদের পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কান্নার গল্প শুনে সে আর হাসি থামিয়ে রাখতে পারল না, হা হা করে হেসে উঠল। বলল, সে চিঠি পেয়ে একটু বাড়তি মজার জন্যে নীলকে বন্দুক দিয়েছে, তবে তাতে গুলি ছিল না, ছিল ময়দা।

এর ফলাফল যা হলো তা এই—পরিকল্পনা মাঠে মারা যাবার কারণে নীল মেয়েদের ব্যাপারে আরও 'স্বপ্নানুরাগী' হয়ে উঠল আর ডানসে যেন আরও গুটিয়ে গেল নিজের ভেতর।

---

# ব্যর্থ শিকারী

মেয়েদের হাতে সেদিন নাকাল বনে যাবার ঘটনায় ডানসে সন্দেহ করেছিল জিম করবেটকে, কিন্তু কিছু বলেনি। করবেট মেয়েদের শুধু বুদ্ধি দিয়েছিলেন ভল্লুকের চামড়া সেলাই করতে পাকানো সুতা ব্যবহার করার জন্যে। এর বেশি কিছু নয়।

যা হোক, ডানসে ব্যাপারটা পরে ভুলে যায়। বালক করবেটকে সে পছন্দ করত। একদিন করবেটকে নিয়ে সে বাঘ শিকারে বেরিয়ে পড়ে। ডানসে বড়াই করে বলছিল বাঘের গায়ে কিভাবে গুলি লাগাতে হয় তা করবেটকে সে দেখিয়ে দেবে।

ধুনিগড়ে তখন প্রচুর বাঘ ছিল। করবেট নিজেও অনেক বাঘের পায়ের ছাপ দেখেছেন। কিন্তু বাঘ শিকার করতে হলে আগে জানা দরকার কিভাবে বন্দুক চালাতে হয়। ডানসে সিদ্ধান্ত নেয় করবেটকে আগে বন্দুক চালানো শেখাবে। করবেটকে নিয়ে, কাঁধে শটগান ঝুলিয়ে সে চলে আসে জঙ্গলের মধ্যে ফাঁকা একটা জায়গায়। শটগানটা তুলে দেয় করবেটের হাতে, বলে সামনের ঝোপে বসা সাদা পালকঅলা পাখিগুলোকে লক্ষ্য করে গুলি করতে। ডান পা সামান্য আগে বাড়িয়ে কাঁধে বন্দুক তুলে নেন করবেট। তারপর ডানসের নির্দেশে ট্রিগারে চাপ দেন তিনি।

এরপর যে কি ঘটেছিল সে ব্যাপারটি বহুদিন পরেও পরিষ্কার হয়নি জিম করবেটের কাছে। তাঁর শুধু মনে আছে ট্রিগারে টিপ দেয়ার পরে তিনি একটা প্রবল ঝাঁকুনি অনুভব করেন, পরক্ষণে দেখেন হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন মাটির ওপর। সামনের ঝোপের সাদা ঝুঁটিঅলা গায়ক পাখিগুলো অদৃশ্য, মাটিতে পড়ে আছে একটা ফ্লাই ক্যাচার। পাখিটা আকারে রবিন পাখির মত, পিঁপড়ে খায়। করবেট পরীক্ষা করে দেখেছিলেন পাখিটার গায়ে কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই। ডানসে শেষে এই সিদ্ধান্তে আসে—গুলির আওয়াজে হার্টফেল করে মরেছে বেচারী পিপীলিকাভুক। আরেকটু হলে জিম করবেটেরও একই দশা হতে যাচ্ছিল।

ডানসের সাথে বাঘ শিকারে ব্যর্থ করবেটকে তাঁর বড় ভাই টম বললেন তিনি ভল্লুক শিকারে বের হবেন। সঙ্গী হিসেবে থাকবেন করবেট। কিভাবে ভল্লুক শিকার করতে হয় দেখিয়ে দেবেন ছোট ভাইকে। করবেটকে চার বছরের শিশু রেখে মারা যান তাঁর বাবা। সংসারের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করে

চলছিলেন টম। মা'র বড় আদরের ছেলে জিম। তিনি টমের সাথে জিমকে ভল্লুক শিকারে যেতে দিতে মোটেই রাজি হচ্ছিলেন না। তবে জিমের আনন্দই লাগছিল। বড় ভাই'র ওপর প্রবল আস্থা করবেটের। তাঁর সঙ্গে নরকে যেতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু মা কি আর সহজে ছাড়তে চান? টম অনেক করে বোঝালেন জিম তাঁর কাছে নিরাপদেই থাকবে, কোন সমস্যা হবে না। শেষে অনুমতি মিলল। জিম ঠিক করলেন সারাক্ষণ বড় ভাই'র পায়ে জোঁকের মত সেঁটে থাকবেন। তাহলে কোন বিপদ হবে না।

সন্ধ্যার সময় যাত্রা হলো শুরু। টমের হাতে দুটো বন্দুক। একটা নিজের, অপরটা জিমের। দুই ভাই গেম ট্র্যাক ধরে এগিয়ে চললেন। ট্র্যাকটা সোজা পাহাড়ের দিকে চলে গিয়েছে।

পাহাড়ের মাঝামাঝি দূরত্ব পার হবার পর পথে পড়ল একটা খাদ। গভীর, অন্ধকার খাদটার দিকে তাকালেই ছমছম করে ওঠে গা। যেন একটা শয়তান মুখ হাঁ করে আছে। খাদের পাশে দাঁড়িয়ে পড়লেন টম, ফিসফিস করে বললেন এ জায়গায় ভল্লুকের আনাগোনা প্রচুর। ভল্লুকের দল খাদের ধার ঘেঁষে নাকি পাহাড়ে যায়। গেম ট্র্যাকের পাশে একটা পাথর, বড় ভাইয়ের নির্দেশে ওখানে বসলেন জিম। টম জিমের হাতে দুটো বল কার্তুজসহ বন্দুক ধরিয়ে দিলেন। সাবধান করে দিলেন ভল্লুকদের আহত করা চলবে না, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হত্যা করতে হবে। পাহাড়ের মাথায়, আটশো গজ দূরে একটা নিঃসঙ্গ ওক গাছ। সেদিকে আঙুল তুলে টম বললেন ওখানে তিনি থাকবেন, তাঁর ধারে কাছে কোন ভল্লুক দেখতে পেলে জিম যেন সাথে সাথে তাঁকে জানান। এ কথা বলে জিমকে একা ফেলে টম রওনা হয়ে গেলেন পাহাড়ের দিকে।

শোঁ শোঁ বাতাস বইছে, শুকনো ঘাস আর পাতা উড়ছে হাওয়ায়। মাঝে মাঝে পাতায় পাতায় ঘষা লেগে খচমচ শব্দ হচ্ছে। চারদিকে আবছা অন্ধকার। ভয়ানক একটা খাদের পাশে বালক জিম একা। ভয়ে থরথর করে কাঁপছেন তিনি। মনে হচ্ছিল চারপাশে ক্ষুধার্ত ভল্লুকের দল ওত পেতে আছে তাঁকে খেয়ে ফেলার জন্যে। ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ সেবার শীতে, পাহাড়ে ন'টা ভল্লুক মারা পড়েছে। জিম এক রকম নিশ্চিতই হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি মারা যাচ্ছেন। তাঁর শরীর ঠাণ্ডায় অসাড়, পা জোড়া যেন সীসের তৈরি। অসম্ভব ভারী। সাড়া পাচ্ছিলেন না পায়ে। অস্তগামী সূর্য তখন লাল শরীর নিয়ে পাহাড়ের কোলে ডুব দিচ্ছে, এমন সময় ভল্লুকটাকে দেখতে পেলেন করবেট। টমের ওক গাছ থেকে শ' গজ দূরে, আকাশের পটভূমিতে ফুটে উঠল ওটার কাঠামো। টম ভল্লুকটাকে দেখতে পেয়েছেন কি পাননি তা নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না জিমের। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা শুরু করে দিয়েছেন যেন ভয়ঙ্কর প্রাণীটার হাত থেকে

পৈতৃক প্রাণটা রক্ষা পায়। পালিয়ে যাবার তীব্র ইচ্ছে জাগল মনে। কিন্তু টমের নির্দেশ মনে পড়ে গেল। তিনি পইপই করে বলে দিয়েছেন ভল্লুক দেখতে পেলেই যেন তাঁকে খবর দেয়া হয়।

বন্দুকটা কাঁধে ঝোলালেন জিম। লোড করতে ভয় পাচ্ছিলেন তিনি। পা বাড়ালেন বড় ভাই'র আস্তানার দিকে।

হিমালয়ের কালো ভল্লুকরা সারাটা শীতকাল বেঁচে থাকে ওক ফল খেয়ে। সমস্যা হলো ফলগুলো ঝুলে থাকে গাছের মগডালে। ভল্লুকগুলো প্রকাণ্ডদেহী আর ভারী বলে গাছ বাইতে কষ্ট হয়। তাই ফল পাড়ার জন্যে ডাল ধরে ঝুলে পড়ে। টানাটানিতে কোন ডাল ভেঙে যায়, কোনটা আবার আধ-ভাঙা হয়ে ঝুলতে থাকে।

খাদ পার হয়ে ঘন একটা ঝোপের চাপড়ার মধ্যে ঢুকে গেলেন জিম। হঠাৎ শোঁ শোঁ শব্দ ভেসে এল। ক্রমে বেড়েই চলল শব্দটা। ভয়ে গা হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল জিমের। এমন সময় ভারী কি যেন একটা জিনিস দুড়ুম করে পড়ল জিমের সামনে। লাফিয়ে উঠলেন তিনি। ওক গাছের একটা ডাল। ডালটা আধা-ভাঙা ছিল। একটা ভল্লুক ফল খাওয়ার আশায় ডাল ধরে টান দিতে ওটা ভেঙে পড়েছে। ভল্লুকটা বিশাল। এতবড় ভল্লুক জীবনে দেখেননি করবেট। দেখে ভয় পাওয়ার অবস্থাও তখন নেই যেন তাঁর। বাতাসের ভূতুড়ে আওয়াজ তাঁর সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়েছে। কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এলেন সেই পাথরের ধারে।

পাহাড়ের আড়ালে ডুব মেরেছে সূর্য। আকাশ থেকে শেষ আলোক রেখাটিও অদৃশ্য। হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি, খুশি খুশি গলায় বলল, 'ভয় পাসনি তো?'

টম!

মাথা নাড়লেন জিম। ভয় পাননি। মানে এ মুহূর্তে ভয় করছে না তাঁর। জিমের হাত থেকে বন্দুকটা নিলেন টম। যাত্রা শুরু করলেন বাড়ির দিকে।

শিকারে ছোট ভাইকে অভিজ্ঞ করে তুলতে চাইছিলেন টম। তাই জিমকে নিয়ে সব সময় ঘুরে বেড়াতেন। একবার ভোর চারটার সময় ঘুম থেকে ডেকে তুললেন জিমকে। হাত মুখ ধুয়ে রেডি হতে বললেন। ময়ূর শিকারে যাবেন। তবে বাড়ির কাউকে জানানো চলবে না। এক কাপ গরম চা আর বাড়িতে তৈরি বিস্কুট খেয়ে বড় ভাইয়ের হাত ধরে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লেন জিম। গন্তব্য সাত মাইল দূরের গারুপ্পু। ওখানে নাকি প্রচুর ময়ূরের দেখা মিলবে।

জিম করবেট জীবনে অনেক জঙ্গলে ঘুরেছেন, জঙ্গলের পরিবর্তন দেখেছেন। তারাই এবং ভাবায়ের জঙ্গলেও এই পরিবর্তন চোখে পড়েছে তাঁর। কিছু পরিবর্তন ঘটেছে প্রাকৃতিক কারণে, কিছু মানুষের জন্যে। এক সময় যেখানে ছিল ঘন

অরণ্য, মানুষ গাছ কেটে সে জঙ্গল ফাঁকা করে ফেলেছে। অল্প কিছু ঝোপ ছাড়া কিছু নেই। আবার যে জায়গায় মাইলের পর মাইল বাতাসে ঢেউ খেলে যেত ঘাস আর কুল গাছের কচি পাতা, সেখানে গড়ে উঠেছে নিবিড় অরণ্য। গারুপ্পুর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এখন জঙ্গল, কিন্তু করবেটরা যখন ময়ূর শিকার করতে গিয়েছিলেন ওই সময় ওখানে ছিল কোমর সমান ঘাস আর কুল গাছের ঝোপ। কুলগুলো পেকে টসটস করছিল। অমন রসাল কুল শুধু হরিণ বা শুয়োর নয়, ময়ূরদেরও প্রধান আকর্ষণ ছিল।

গারুপ্পুতে যখন পৌঁছুলেন দুই ভাই তখনও আঁধার পুরোপুরি কাটেনি। একটা কুয়োর ধারে বসলেন দু'জনে। ভোরের অপেক্ষা করছেন। আস্তে আস্তে ফর্সা হয়ে উঠল চারদিক, জেগে উঠছে জঙ্গল। লাল বন মোরগগুলো একসাথে কোরাস শুরু করে দিল। ওদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল ছোট ছোট পাখিদের। নড়ে উঠল ওরা, শরীর থেকে গড়িয়ে পড়ল শিশির কণা। আস্তে আস্তে কেটে গেল ঘুমের রেশ। তারপর বন মোরগদের সাথে ওরাও গলা মেলাতে লাগল। সবাই যেন নতুন একটি দিনকে স্বাগত জানাচ্ছে। বিশাল সামাল গাছের নিচে ঝিমুচ্ছিল ময়ূরের দল, ছড়িয়ে গেল প্রকাণ্ড ঘাস জমিতে। তীক্ষ্ণ গলায় ডেকে উঠল। জঙ্গলের নানা আওয়াজ ছাড়িয়ে ওদের গলা শোনা গেল বেশি। পুবাকাশে উঁকি দিল সূর্য। এক সময় উঠে এল সামাল গাছের মগডালের সীমানা বরাবর। ঠিক তখন আশ্চর্য একটি দৃশ্য দেখা গেল। কম করেও কুড়িটি ময়ূর দৌড়ে হাজির হয়ে গেছে কুল ঝোপের নিচে। টম অনেক আগেই পাইপ টানা বন্ধ করেছেন। ছাই ফেলে আড়মোড়া ভাঙলেন। বললেন জঙ্গলে ঢোকার সময় হয়েছে। হাঁটার সময় উঁচু গাছের ডালে জমে থাকা শিশির বৃষ্টির মত ঝুপঝুপ করে পড়ল দু'ভাইয়ের গায়ে। প্রায় গোসল করিয়ে দিল। কোমর সমান ঘাস ঠেলে এগোতে হচ্ছিল দু'জনকে। শিশির ভেজা ঘাসের মুক্তোর মত পানি ওদের দ্বিতীয় দফা গোসল করাল। ভেজা কাপড়ে রীতিমত কাঁপ ধরে গেল শরীরে।

সামাল গাছের নিচের গোটা দশেক ময়ূর টার্গেট করলেন ওঁরা। তবে প্রায় সবগুলোই উড়ে গেল ওঁদের সাড়া পেয়ে। একটা শুধু উড়ে গিয়ে বসল খানিক দূরে, ঘাসের ওপর। টম ১২ বোরের বন্দুক তুলে দিলেন ছোট ভাইয়ের হাতে। উৎফুল্ল গলায় বললেন ময়ূরটাকে 'পেড়ে' ফেলতে। জিমের কাছ থেকে ময়ূরটা দেড়শো গজ দূরে। চল্লিশ গজের মত এগিয়ে থেমে দাঁড়ালেন। বন্দুক কক্ করছেন, এমন সময় মৃদু শিস শুনতে পেলেন পেছনে। ঘুরে তাকালেন। তাঁকে ইশারা করছেন টম। ফিরে আসতে বলছেন। ফিরে এলেন জিম। কারণ জানতে চাইলে টম ব্যাখ্যা করলেন জিম নাকি রেঞ্জের বাইরে চলে যাচ্ছিলেন। জিম বললেন তিনি গুলি করছিলেন না, বন্দুক কক্ করতে যাচ্ছিলেন মাত্র। ভর্ৎসনা

করলেন টম। বললেন গুলি করার জন্যে প্রস্তুতি না নিয়ে কখনও বন্দুক কক্ করা উচিত নয়। ব্যাপারটা খুব বিপজ্জনক। বিশেষ করে ঘাসের মধ্যে। যেখানে খানা-খন্দে পড়ার সম্ভাবনা সবচে' বেশি।

'যা এখন,' বললেন বড় ভাই, 'আরেকবার চেষ্টা করগে।' এবার একটা বড় কুল গাছের আড়াল নিয়ে দাঁড়ালেন জিম করবেট। বন্দুক তাক করে ধরলেন সামাল গাছের দিকে। ওটার ডালে এসে বসেছে অপূর্ব সুন্দর একটা ময়ূর। এত সুন্দর ময়ূর জীবনে দেখেননি তিনি। এত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন তিনি, হ্যামার টেনে বন্দুকই কক্ করতে পারলেন না। আঙুলগুলো যেন অসাড় হয়ে গেছে। কি করবেন ভাবতে ভাবতেই উড়ে গেল ময়ূরটা।

'মন খারাপ করিস না,' সান্ত্বনা দিলেন টম। 'আরেকবার চেষ্টা কর। এবার নিশ্চয়ই ভাগ্য সহায়তা করবে।'

কিন্তু ভাগ্য সহায়তা করল না। ময়ূর শিকার করাও হলো না বেচারী জিমের।

ফেরার পথে একটা লাল বন মোরগ আর তিনটে ময়ূর শিকার করলেন টম। নিজে ব্যর্থ হলেও ভাইয়ের সাফল্যে দারুণ খুশি বালক জিম।

---

## বিপদের মুখোমুখি

ভল্লুক আর ময়ূর শিকারে ব্যর্থ জিম করবেট সেবার বাড়ি ফিরে আসার পর জ্বরে পড়ে যান। নিউমোনিয়া হয়ে গিয়েছিল তাঁর। ভয়ানক অবস্থা। যমে মানুষে টানাটানি চলছিল। কিছুটা সুস্থ হবার পরে বালক জিমকে তাঁর বড় ভাই টম একটি গুলতি উপহার দেন। জীবনের প্রথম গুলতি। জিমের মন ভাল করার জন্যে টম জিনিসটা দিয়েছিলেন। সেই সাথে বেড-সাইড টেবিলে রাখা গরুর মাংসের জুস হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন এ জিনিসটা বেশি বেশি খেতে হবে। নইলে গুলতি মারার মত শক্তি ফিরবে না গায়ে। গুলতির লোভে গপ্ গপ্ গিলে ফেলতেন জিম। আর টম পাশে বসে সব সময় জঙ্গলের গল্প বলতেন। মন ভাল হয়ে যেত জিমের। দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে থাকেন তিনি।

জঙ্গল বিষয়ক নানা ট্রেনিং পেয়েছিলেন জিম তাঁর বড় ভাইয়ের কাছ থেকে। বন্দুক চালাতে শিখেছিলেন। টমের কাছ থেকেই প্রথম জানতে পারেন শিকারীরা বছরটাকে দু'ভাগে ভাগ করে। তাদের ভাষায়, 'ক্লোজ সিজন' এবং 'ওপেন সিজন'। ক্লোজ সিজনে জিমকে গুলতি ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না। কারণ ওই সময় পাখি হত্যা করা খুবই নিষ্ঠুরতা হবে। পাখিরা ক্লোজ সিজনে ডিমে তা দেয়, বাচ্চাদের লালন পালন করে। ওপেন সিজনে যথেচ্ছ ভাবে গুলতি ব্যবহারে কোন অসুবিধে নেই। তখন জিম যত ইচ্ছা পাখি শিকার করতে পারবেন।

টমের কাছ থেকে জিম পাখির ছাল ছাড়াতেও শেখেন। তাঁদের এক কাজিন, স্টিফেন ডিয়াজ, ওই সময় কুমায়ূনের পাখিদের ওপর একটি বই লিখছিলেন। তাঁর বইয়ের চারশো আশিটি রঙিন পাখির বেশির ভাগ জোগাড় করে দিয়েছিলেন জিম নিজের কালেকশন থেকে। এ ছাড়া আরও অনেক পাখি সংগ্রহ করার ব্যবস্থাও করে দেন তিনি।

টমের দুটি কুকুর ছিল, পপি এবং ম্যাগগ। লাল রঙের পপিকে তিনি দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সময় কাবুলের রাস্তায় কুড়িয়ে পান। ক্ষুধার্ত কুকুরটাকে ভারতে নিয়ে আসেন। আর ম্যাগগ ছিল সাদা রঙের স্প্যানিয়েল জাতের কুকুর। লম্বা লেজ। তাতে প্রচুর পশম। পপি বাচ্চাদের তেমন কাজে আসত না। তবে ম্যাগগের পিঠে চড়ে জিম ঘুরে বেড়াতে পারতেন স্বচ্ছন্দে। ম্যাগগ খুব ভালবাসত জিমকে। ম্যাগগের কাছ থেকে জিম শেখেন ঘন ঝোপঝাড়ের খুব কাছে দিয়ে নেই। তাহলে ঝোপের আড়ালে ঘুমিয়ে থাকা প্রাণীরা বিরক্ত হয়ে উঠতে পারে।

ম্যাগগকেই প্রথম দেখেন জিম জঙ্গলের মধ্যে বেড়ালের মত নিঃশব্দে চলাফেরা করতে। আগে যেখানে যেতে ভয় করত, ম্যাগগ সঙ্গে থাকায় সে-সব জায়গায় ঢুকতে আর ভয় পেতেন না জিম। গুলতি নিয়ে মজা করে পাখি শিকার করতেন তিনি। পাখি শিকার করতে গিয়ে একদিন ম্যাগগের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিলেন।

সেদিন সকাল সকাল সানবার্ড শিকারে বেরিয়ে পড়েছিলেন তিনি। সানবার্ড হলো লাল টকটকে রঙের এক জাতের পাখি। এই পাখিটা করবেটের সংগ্রহে ছিল না। ম্যাগগ এবং থিস্‌ল্‌ ছিল তাঁর সাথী। থিস্‌ল্‌ হলো ডানসের কুকুর। সে-ও ঘুরতে বেরিয়েছিল। রাস্তায় করবেটের সঙ্গী হয় ওরা। থিস্‌লের সাথে ম্যাগগের তেমন ভাব না থাকলেও এক সাথে পথ চলতে আপত্তি ছিল না কারও। কিছুদূর যাবার পর থিসলের চোখ পড়ল একটা শজারুর ওপর।

সাথে সাথে ওটার দিকে ছুটল সে। জিমের ডাকাডাকি অগ্রাহ্য করে থিস্‌ল্‌ের পথ ধরল ম্যাগগও। ডানসের কাছে শটগান থাকলেও গুলি করতে ভয় পাচ্ছিল সে। কারণ দুটো কুকুরই শজারুটার দু'পাশ থেকে ধাওয়া করেছে, কামড় দেয়ার চেষ্টা করছে। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে কুকুর দুটো আহত হতে পারে। ডানসে তেমন দৌড়াতে পারে না। খানিকটা দৌড়ে সে হাঁপাতে হাঁপাতে রণে ভঙ্গ দিল। জিম আর দুই কুকুর শজারুর পিছু ছুটতে থাকল।

শজারুকে জঙ্গলের প্রায় সব প্রাণীই এড়িয়ে চলে তীক্ষ্ণধার কাঁটার জন্যে। হামলার আশঙ্কা দেখলেই এরা শরীরের সমস্ত কাঁটা ফুটিয়ে তুলে পিছু হঠতে থাকে। ওই কাঁটার খোঁচা খেলে যন্ত্রণার একশেষ হবে।

গুলতি দিয়ে শজারু বধ করা যাবে না বুঝতে পেরে অস্ত্রটা আগেই পকেটে পুরে নিয়েছিলেন জিম। মোটা একটা লাঠি বাগিয়ে ছুটছিলেন তিনি। কিন্তু কুকুর দুটোর খুব কমই সাহায্যে আসতে পারছিলেন। যতবার লাঠি নিয়ে শজারুকে আঘাত করতে গেছেন, তেড়ে এসেছে ওটা।

তখন চাচা আপন প্রাণ বাঁচা নীতি অবলম্বন করতে হয়েছে জিমকে। পিছু হটে এসেছেন তিনি। তবে শজারুর হামলা থেকে প্রতিবারই তাঁকে রক্ষা করেছে কুকুর দুটো।

আধা মাইল এভাবে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলল। শজারুটা দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এল গভীর একটা খাদের ধারে। এখানে শজারুদের আস্তানা। আস্তানায় একবার ঢুকে গেলে বাছাধনের টিকিটিরও খোঁজ মিলবে না বুঝতে পেরে মরিয়া হয়ে উঠল কুকুর দুটো। ম্যাগগ শজারুটার নাক কামড়ে আর থিস্‌ল্‌ ঝুলে পড়ল গলা ধরে। ডানসে যখন ওখানে হাজির হলো, মারামারি ততক্ষণে শেষ। তবু বীরত্ব দেখানোর জন্যে শজারুটাকে গুলি করল সে। শজারুর কাঁটার আঘাতে

দুটো কুকুরেরই গা থেকে দরদর ধারায় রক্ত পড়ছিল। জিম আর ডানসে ওদের গা থেকে একটা একটা করে কাঁটা তুললেন। তারপর বাড়ির পথ ধরলেন মৃত শজারুটাকে কাঁধে ফেলে। অবশ্য শজারু সাবধানে বয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব ডানসেই পালন করল। সাবধানতার প্রয়োজন ছিল, কারণ শজারুর কাঁটা খুব খারাপ জিনিস। বাঁকা বলে মাংসে ঢুকে গেলে বের করা কষ্ট।

বাড়ি ফেরার পর দেখা গেল ম্যাগগের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। রাতের বেলা প্রচুর হাঁচি দিল সে। প্রতিবার হাঁচির সাথে রক্ত পড়ল গলগল করে, ভিজিয়ে দিল খড়ের বিছানা। ভাগ্যই বলতে হবে পরদিন ছিল রোববার, টমের ছুটির দিন। বাড়ি এসে ম্যাগগের অবস্থা দেখে তিনি ওকে পরীক্ষা করতে বসলেন। দেখলেন জানোয়ারটার নাকের ভেতর তখনও একটা কাঁটা ঢুকে আছে। ওটার জন্যেই রক্ত বেরুচ্ছিল। অনেক কসরৎ করে চিমটা দিয়ে ছয় ইঞ্চি লম্বা কাঁটাটা বের করে আনলেন টম। কাঁটা বেরুনোর সাথে সাথে প্রচুর রক্তপাত হলো ম্যাগগের, তবে যত্ন এবং ঠিকমত খাওয়া-দাওয়ার কারণে সুস্থ হয়ে উঠল কুকুরটা। থিস্‌লকে অবশ্য ম্যাগগের মত ভুগতে হয়নি। ম্যাগগের ওপর ঝাপটাটা বেশি গিয়েছিল তার কারণ জিমকে রক্ষার জন্যে সে-ই বার বার শজারুটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল।

ম্যাগগকে নিয়ে জিম করবেট এরপরেও বেশ কয়েকবার শিকারে বেরিয়েছেন। এর মধ্যে একবার তিনি পড়েছিলেন বাঘের খপ্পরে, আরেকবার চিতাবাঘের। প্রথম ঘটনাটা ঘটেছিল করবেটদের বাড়ি কালাধুঙ্গি থেকে মাইল তিনেক দূরে নয়া গাঁও গ্রামে।

একদিন খুব ভোরে ম্যাগগকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন জিম করবেট। উদ্দেশ্য ময়ূর ধরবেন। নয়া গাঁও-র পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ধুনিগড় নদী। নদীর ধারেই জঙ্গল। জঙ্গল ধরে সিকি মাইলটাক এগোলে চওড়া একটা গেম ট্র্যাক। আর এ গেম ট্র্যাকের দু'পাশের জঙ্গলে বোঝাই ময়ূর, হরিণ, শুয়োর, আরও কত কি প্রাণী।

জিম ম্যাগগকে নিয়ে যখন ওই গেম ট্র্যাকে পৌঁছুলেন ততক্ষণে বেশ ফর্সা হয়ে উঠেছে চার দিকে। হাতে বন্দুক নিয়ে বীরের মত হাঁটছেন জিম, সাথে ম্যাগগ। চলার পথে বেশ কিছু বনতিতির আর ময়ূর চোখে পড়ল। কিন্তু বন্দুক তাক করার আগেই ছুটে পালাল ওরা। আরও আধা মাইল যাবার পর জঙ্গলের মধ্যে, খোলা একটা জায়গায় হাজির হলেন জিম। ওখানে কয়েকটা ময়ূর চরে বেড়াচ্ছিল। পা টিপে টিপে ময়ূরের দলটার দিকে এগোলেন তিনি। তারপর ম্যাগগকে লেলিয়ে দিলেন ওদের পেছনে।

কুকুরের ধাওয়া খেয়ে ময়ূর গাছে উঠে পড়ে। জিমের উদ্দেশ্য ছিল ম্যাগগের ধাওয়া খেয়ে ময়ূরগুলো গাছে উঠলে ওগুলোকে পেড়ে ফেলবেন। কিন্তু মাত্র

একটা ময়ূর ধরা সম্ভব হলো তাঁর পক্ষে। ম্যাগগ অবশ্য ময়ূর ধাওয়া করতে খুব মজা পাচ্ছিল। ওগুলো গাছে উঠে পড়লে নিচে দাঁড়িয়ে খুব ঘেউ ঘেউ করছিল সে। ওদের ধাওয়া করে নিয়ে গিয়েছিল সে একশো গজ দূরে একটা ঘন ঝোপের ধারে। হঠাৎ ময়ূরগুলো তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে উঠে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে শূন্যে উঠে গেল। তার পর পরই ভয়ার্ত আর্তনাদ করে উঠল ম্যাগগ। একইসাথে ঝোপের আড়াল থেকে ভেসে এল বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জন। ম্যাগগ ছুটতে শুরু করেছে, পেছন পেছন ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বাঘ। ওখানে ঘুমাচ্ছিল সে। ম্যাগগের চিৎকারে কাঁচা ঘুম ভেঙে গেছে তার। বেজায় চটে গিয়ে ধাওয়া করল ম্যাগগকে। দু'জনেই ছুটে আসছিল জিমের দিকে। ঠিক তখন একটা ময়ূর সাবধানী গলায় ডাকতে ডাকতে জিমের মাথার ওপরে, গাছের শাখায় এসে বসল। জিম ইচ্ছে করলেই ওটাকে গুলি করতে পারতেন। কিন্তু বাঘ দেখে পাখি মারার কথা ভুলে গেলেন তিনি। পালানোর উপায় খুঁজতে লাগলেন। তারপর এমন দৌড় দিলেন, জীবনেও এত জোরে ছোটেননি। বিশ্বস্ত সঙ্গী ম্যাগগকে পেছনে ফেলে, লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে দৌড়াতে লাগলেন জিম। যদিও একটু পরেই দৌড় প্রতিযোগিতায় ম্যাগগ তাঁকে হারিয়ে দিয়ে আগে আগে ছুটতে লাগল। বাঘের গর্জন ক্রমে ম্লান হয়ে এল তাদের পেছনে।

জিম করবেট পরে বলেছেন, 'এখনও আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, বাঘটা নিজের আস্তানায় ফিরে গিয়ে হা হা করে হাসছে। হাসছে প্রকাণ্ড একটা কুকুর আর ছোট একটা ছেলেকে তার ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালানোর দৃশ্যের কথা মনে করে। আসলে আমাদের হামলা করার কোন ইচ্ছেই ছিল না ওটার। ম্যাগগের কারণে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটায় সে আমাদের শুধু তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।'

এটা শীতকালের ঘটনা। গরমের সময় করবেটরা সাধারণত কালাধুঙ্গি ছেড়ে নৈনিতালে, তাঁদের সামার হোম-এ চলে যেতেন! সামার হোমে যাবার আগে আরেকটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হলো তাঁর।

সেবার একাই ঘুরতে বেরিয়েছেন করবেট। ম্যাগগ গ্রামে গেছে তার কুকুর সঙ্গিনীর সাথে মোলাকাত করতে। জিম হাঁটছিলেন গারুপ্পু রোড ধরে। এটা নয়া গাঁওর রাস্তা। বনতিতির খুঁজছিলেন তিনি। রাস্তায় প্রচুর পাখি দেখতে পেয়েও গুলি করার মত 'ক্লোজ শটে' কাউকেই পাচ্ছিলেন না জিম। তাই রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকলেন জুতো মোজা খুলে। এদিকে জঙ্গল বলতে কিছু ঝোপঝাড় আর খাটো ঘাস। কিছুদূর যাবার পর একটা বনমোরগ দেখতে পেলেন জিম। টকটকে লাল। একটা গাছের নিচে মরা পাতা খুঁটছে। পোকা-মাকড় খুঁজছে।

বনমোরগরা সাধারণত খাবার সংগ্রহের সময় মাথা তুলে বার বার চারপাশে তাকিয়ে দেখে কোথাও বিপদের আশঙ্কা আছে কিনা। বিপদের আশঙ্কা না থাকলে

মাথা নামিয়ে খাবার খুঁজতে থাকে। এটাও তাই করছিল। বন মোরগটা শূটিং রেঞ্জের বাইরে বলে পা টিপে টিপে এগোলেন জিম। বন মোরগটা যে-ই মাথা নামিয়ে মরা পাতা খোঁটে, জিম এক পা, দু'পা করে এগোন। আর ওটা মাথা তুললেই নিজের জায়গায় পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন তিনি। এভাবে আস্তে আস্তে ওটার প্রায় কাছে চলে এলেন তিনি। বা বলা যায় তাঁর শূটিং রেঞ্জের মধ্যে চলে এল বনমোরগ। আর এক কদম এগোলেই পাখিটাকে গুলি করা যাবে। ঠিক এক কদম দূরে একটা গর্ত, চারপাশে হাঁটু সমান ঘাস। গর্তের পাশে ছোট একটা গাছও আছে। গাছটার ওপর বন্দুক রেখে লক্ষ্য স্থির করা সুবিধে হবে ভেবে ওদিকে পা বাড়ালেন জিম। বন মোরগটা মাথা নিচু করতেই গর্তের মধ্যে পা দিলেন তিনি, সাথে সাথে ঝিন্ করে উঠল শরীর। যেন বিদ্যুতের শক্ খেয়েছেন। তার নগ্ন পা পড়েছে প্রকাণ্ড একটা পাইথনের কুণ্ডলীর মধ্যে। মাস কয়েক আগে বাঘের তাড়া খেয়ে জান বাজি রেখে ছুটেছিলেন জিম। এবং বাজি ধরে বলতে পারেন অমন দৌড় দেয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আর আজ এমন লাফ দিলেন, বাজি ধরে বলা যায় কারও পক্ষে তাঁর মত লাফানোও সম্ভব নয়। এক লাফে গর্তের ওপরে। ঘুরেই নড়ে ওঠা কুণ্ডলীটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন, তারপর একদৌড়ে রাস্তায়।

উত্তর ভারতের জঙ্গলে বহু দিন কেটেছে জিম করবেটের। কোনদিন শোনেননি পাইথন মানুষ মেরেছে, তবে সেদিন স্রেফ বরাত জোরে অজগরটার কবল থেকে বেঁচে এসেছেন তিনি। কারণ ওই সময় সাপটা ঘুমাচ্ছিল। না হলে জিমের পা পেঁচিয়ে ধরলে ছাড়া পাবার উপায় ছিল না। জিমকে মারা লাগত না ওটার, ভয়ের চোটেই হার্টফেল করতেন তিনি। জিম একবার নিজের চোখে দেখেছেন তাঁর তাঁবুর পাশে প্রাপ্ত বয়স্ক একটা চিতলের পা টেনে ধরে পরে ওটাকে ভর্তা করে ফেলেছে বিশালকায় পাইথন। সেদিনের পাইথনটা কত বড় ছিল জানেন না করবেট, ওটার গায়ে গুলি লেগেছিল কিনা তা-ও জানা নেই তাঁর। কারণ ওদিকের আর ছায়াও মাড়াননি তিনি। তবে ওই এলাকায় আঠারো ফুট লম্বা পাইথন দেখেছেন জিম। দেখেছেন একটা চিতলকে গিলে খেতে।

এবার চিতাবাঘের গল্প।

ম্যাগগকে নিয়ে নৈনিতাল গেছেন জিম। ওই সময় নৈনিতালের জঙ্গলে কালেগে পাখি (এক ধরনের রঙিন পাখি) ছিল প্রচুর। আর ওটা 'ওপেন সিজন' বলে পাখি শিকারেও মানা নেই। স্কুল ছুটির পরে, সন্ধে বেলায় জিম ম্যাগগকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন পাখি শিকারে। প্রায়ই কালেগে পাখি অথবা পাহাড়ী তিতির শিকার করে নিয়ে আসতেন।

এক সন্ধ্যায় ম্যাগগকে নিয়ে যথারীতি বেরিয়েছেন জিম করবেট, হাঁটছেন

কালাধুঙ্গি রোড ধরে। ম্যাগগ ধাওয়া করছিল ফেজ্যান্টগুলোকে, কিন্তু অস্থির পাখিগুলো খুব কম সময়ের জন্যে গাছের ডালে বসার কারণে গুলি করতে পারছিলেন না করবেট। হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লেন সারিয়া তাল-এ। উপত্যকার নিচে এটা একটা ছোট লেক। লেকের পাশে জঙ্গল। লেকের ধারে একটা কালেগে শিকার করলেন জিম। তারপর রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন। জঙ্গলটা ক্রমে উঁচু হয়ে গিয়ে উপত্যকায় ঠেকেছে। এদিকে ঘন ঝোপঝাড় আর পাথরই বেশি। দুশো গজ যাবার পর ওরা হাজির হলেন খোলা, ঘাসে ছাওয়া একটা জায়গায়। এখানে এক সারি দোপাটি গাছ থেকে ঝপ্ ঝপ্ করে লাফিয়ে নামল কয়েকটা কালেগে। ছোট একটা ঝোপ থেকে বীচি খুঁটে খেতে শুরু করল। ঝোপের আড়াল থেকে দেখা যাচ্ছিল না পাখিগুলোকে। আকাশে উড়লে দেখা যেত। কিন্তু জিম করবেট উড়ন্ত পাখি গুলি করে ফেলে দেয়ার মত দক্ষ শিকারী হয়ে ওঠেননি তখনও। তাই মাটিতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন পাখিগুলো কখন খোলা জায়গাটাতে আসবে। ম্যাগগ শুয়ে রইল তাঁর পাশেই।

জিম যেখানে বসে ছিলেন, ওখান থেকে রাস্তাটা কোনাকুনি চলে গেছে পাহাড়ের দিকে। হঠাৎ রাস্তা থেকে লোকজনের হাসি আর কথা শোনা গেল। সেই সাথে টিনের ঠং ঠং শব্দ। এরা দুধওয়ালা। নৈনিতাল গিয়েছিল দুধ বেচতে। এখন সারিয়া তাল লেকের নিচে, নিজেদের গ্রামে ফিরে যাচ্ছে।

লোকগুলো জিমদের কাছ থেকে অন্তত চারশো গজ দূরে ছিল। হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেলেন জিম। মনে হলো কোন প্রাণীকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ওরা। ঠিক তার পরপর জঙ্গলের মধ্যে প্রাণীটা ঢুকে পড়ল, ছুটে যেতে শুরু করল জিমদের দিকে। ঘন ঝোপের কারণে জিম প্রাণীটার চেহারা দেখতে পাচ্ছিলেন না। দেখতে পেলেন দোপাটি গাছের পাশ দিয়ে আসার সময়। কালেগেগুলোকে সন্ত্রস্ত করে এক লাফে চলে এল ওটা খোলা ঘাস জমিতে।

একটা প্রকাণ্ড চিতাবাঘ। চিতাবাঘটা লাফ দেয়ার সময়ই দেখতে পেয়েছে জিমদেরকে। মাটিতে কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ শুয়ে রইল ওটা। খোলা ঘাস জমির ঢাল ত্রিশ ডিগ্রী কোনাকুনি উঠে গেছে ওপরদিকে। জিমদের কাছ থেকে চিতাটার দূরত্ব মাত্র দশ গজ। ওটার চিবুক থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন জিম। চিতাটাকে দেখে আগেই বন্দুক থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছেন তিনি। এবার জড়িয়ে ধরলেন ম্যাগগকে। টের পেলেন তাঁর মত ম্যাগগও থরথর করে কাঁপছে।

জিম এবং ম্যাগগ দু'জনেরই চিতাবাঘ দেখার অভিজ্ঞতা ওটাই প্রথম। তবে যতটা না ভয়, তারচে' বেশি উত্তেজনায় কাঁপুনি উঠে গিয়েছিল গায়ে। অবশ্য তেমন ভয় না পাবার কারণ করবেট ব্যাখ্যাও করেছেন। বলেছেন, চিতাটার

তাঁদেরকে ক্ষতি করার ইচ্ছে ছিল না, এটা নাকি বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। রাস্তায় তাড়া খেয়ে ওটা জঙ্গলে ঢুকে পড়ে, মুখোমুখি হয়ে যায় জিমদের। জঙ্গলে ছোট একটা ছেলে আর কুকুরটাকে নিশ্চয়ই আশা করে সে। তাই থতমত খেয়ে গিয়েছিল। তবে জিমদের এক নজর দেখেই চিতাবাঘ বুঝতে পেরেছিল এরা শত্রু নয়। এদের কাছ থেকে ভয়েরও কিছু নেই।

তাই কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকার পর হেলেদুলে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় সে। পেশীতে ঢিল পড়ে জিমের। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ম্যাগগও। কারণ কুকুরের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো চিতাবাঘ।

---

# শিকার ও শিকারী

শৈশবে, স্কুলের দশ বছরের জীবন, বাংলাদেশে (তৎকালীন বেঙ্গলে) চাকরি এবং পরবর্তীতে দুটো বিশ্বযুদ্ধের সময়ের ছুটির পুরোটাই কালাধুঙ্গির জঙ্গলে এবং তার আশপাশে কেটেছে জিম করবেটের। জঙ্গলকে চেনার ও জানার প্রচুর সুযোগ তিনি পেয়েছেন সেই সব দিনগুলোতে। চোখের সামনে দেখেছেন বিশাল সব অরণ্য ধ্বংস হয়ে যেতে। সেই সাথে বিলুপ্তি ঘটেছে জঙ্গলের অনেক দুর্লভ পশুপাখির। কোন কোন প্রাণী বাধ্য হয়ে জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে চলে এসেছে। বানরের কথাই ধরা যাক। জঙ্গল ধ্বংস হয়ে যাবার কারণে লাখ লাখ বানর লোকালয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। খিদের জ্বালায় নষ্ট করেছে খেতের ফসল। এক সময় সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের পূর্বসুরিরা। তবে বানর নিধন করা সম্ভব হয়নি হিন্দুদের কাছে এই প্রাণীকুল দেবতা জ্ঞানে সমাদৃত হয়ে থাকে বলে। জিম করবেটের সময়ে ভারতের উত্তর প্রদেশে বানরদের সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আর জঙ্গল থেকে বিতাড়িত এই এক কোটি বানর শস্য আর বাগানের ফল-ফলারি ধ্বংস করে চলেছিল মনের সুখে। কাজেই দেশের অর্থনীতির জন্যে তাদেরকে হুমকি হিসেবে দেখাটাই ছিল স্বাভাবিক।

জিম করবেট বলেছেন, যদি জানতেন তাঁকে এক সময় আত্মজীবনী লিখতে হবে, তা হলে নাকি জঙ্গলকে আরও গভীরভাবে চেনার চেষ্টা করতেন। অবশ্য স্বীকার করেছেন, জঙ্গলের দিনগুলো তাঁকে নিরবচ্ছিন্ন সুখ এনে দিয়েছে। বলেছেন প্রকৃতির মাঝে কোন দুঃখ-কষ্ট নেই, নেই কোন শোক। পাখির ঝাঁক থেকে একটা পাখিকে হয়তো তুলে নিয়ে গেল কোন বাজ, অথবা গরু বা মহিষের পাল থেকে কেউ অসহায় শিকার হলো মাংসাশী কোন প্রাণীর; এ নিয়ে ভাবান্তর ঘটে না কারও মাঝে।

জঙ্গলে আছেই দুটো জাত—শিকার এবং শিকারী। অসহায়রা শিকার হচ্ছে শক্তিশালী শিকারীর। ছেলেবেলায় না বুঝে খামোকাই পাখি বা অসহায় প্রাণীদের রক্ষার চেষ্টা করতেন করবেট। হয়তো একটা পাখিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল বাজ, তিনি ওটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতেন। কিন্তু শীঘ্রি তিনি বুঝতে পারেন এতে লাভ নেই কোন। আসলে একজনকে বাঁচাতে গিয়ে দু'জনের মৃত্যুর কারণ হচ্ছেন তিনি। বাজের শিকার যে আহত, রক্তাক্ত পাখিটিকে তিনি বাঁচাতে

চাইছেন, সে কিন্তু বাঁচতে পারছে না। জঙ্গলে তাৎক্ষণিক সেবায় আহত পাখি বা প্রাণীদের বাঁচানো সম্ভবও নয়। একশো জনে একজন হয়তো বেঁচে যায়, তা-ও সৌভাগ্যক্রমে। আর শিকারী তার শিকার হাত ছাড়া হয়ে যাবার কারণে আবার নতুন কারও ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বধ করে।

জঙ্গলের নির্দিষ্ট কিছু পশু-পাখি প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। এই ভারসাম্য রক্ষা করতে তাদের শিকার করতে হয়। আর প্রতিটি প্রাণীর শিকারের ধরন আলাদা এবং নিজস্ব। যেমন অভিবাসী বাজপাখিরা বেশির ভাগ হত্যাকাণ্ড ঘটায় মাটিতে। তবে কখনও কখনও শূন্যেই পাখি শিকার করে, উড়ন্ত অবস্থায় শিকারকে গলাধঃকরণের দৃশ্যও দুর্লভ নয়। আবার বাঘ করে কি, প্রয়োজন পড়লে শিকারের ঠ্যাং কামড়ে তাকে খোঁড়া করে দেয় আগে, তারপর ঘাড় মটকায়। আবার কখনও এক থাবায় শিকারের ঘাড় মটকে দেয়ার ঘটনাও তারা ঘটিয়ে থাকে।

তবে জঙ্গলের কোন প্রাণী অপ্রয়োজনে, উদ্দেশ্যহীন শিকার করে না। শুধু শিকারের আনন্দে শিকার করার মত ঘটনা জিম করবেট তেমন একটা চাক্ষুষ করেননি। অস্বাভাবিক কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সিভেট ক্যাট বা গন্ধ গোকুল এবং বেজিদের এ কাজটা করতে দেখেছেন তিনি। শিকারের আনন্দ, একেক জনের কাছে একেক রকম। এ প্রসঙ্গে পাইথন শিকারের একটা গল্প বলা যাক।

যে সময়ের গল্প এটি তখন কুমায়ূনের কমিশনার ছিলেন পার্সি উইন্ডহ্যাম। উত্তর প্রদেশের গভর্নর স্যার হারকোর্ট বাটলার কমিশনারকে অনুরোধ করেন সাম্প্রতিক উদ্বোধন করা লক্ষ্মৌ চিড়িয়াখানার জন্যে একটি অজগর ধরে দিতে। পার্সি উইন্ডহ্যাম তখন কালাধুঙ্গিতে, শীতের ছুটিতে। উইন্ডহ্যাম জিম করবেটের কাছে জানতে চাইলেন তাদের জঙ্গলে সে-রকম কোন অজগরের সন্ধান মিলবে কিনা যা গভর্নরকে উপহার দেয়া যায়। করবেট কমিশনারের চাহিদা অনুযায়ী অজগরের সন্ধান দিতে পারবেন জানালেন।

পরদিনই উইন্ডহ্যাম দুই শিকারীকে নিয়ে হাজির হয়ে গেলেন। সবাই মিলে হাতির পিঠে চড়ে রওনা হলেন অজগর শিকারে। অজগরটার নিবাস কোথায়, জানা ছিল করবেটের। নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেলেন সেখানে।

প্রকাণ্ড অজগরটি শরীর টান করে শুয়ে ছিল অগভীর একটা খালে। কাঁচের মত স্বচ্ছ পানির নিচে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল ওটাকে। যেন যাদুঘরের কাঁচের বাক্সে বন্দী হয়ে আছে। অজগরটাকে দেখে খুব খুশি উইন্ডহ্যাম। বললেন ঠিক এ রকম অজগরই খুঁজছিলেন তিনি। মাহুতকে হাতির গায়ে বাঁধা দড়ি খুলে নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। মাহুত মোটা রশি নিয়ে এল। রশির এক প্রান্তে ফাঁস তৈরি করলেন উইন্ডহ্যাম। শিকারীদের বললেন ফাঁস দিয়ে অজগরটাকে বেঁধে

ফেলতে। আঁতকে উঠল দুই শিকারী। প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বলল এ অসম্ভব।

'ভয়ের কিছু নেই,' উইন্ডহ্যাম আশ্বাস দিলেন ওদেরকে। সঙ্গের ভারী বন্দুকটা দেখিয়ে বললেন সাপটা হামলা চালানোর চেষ্টা করলে গুলি করবেন তিনি। কিন্তু ভরসা পেল না ওরা। অগত্যা করবেটের সাহায্য প্রার্থনা করলেন উইন্ডহ্যাম। করবেট যে কোন সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। এতেই খুশি উইন্ডহ্যাম। রাইফেলটা করবেটের হাতে ধরিয়ে দিয়ে দুই শিকারীকে নিয়ে এগোলেন অজগর পাকড়াও করতে।

করবেট পরে আফসোস করেছেন ওই সময় রাইফেলের বদলে তাঁর হাতে মুভি ক্যামেরা থাকলে কিছু দুর্লভ দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করে রাখতে পারতেন তিনি। কারণ এমন মজার দৃশ্য খুব কমই দেখেছেন করবেট।

উইন্ডহ্যামের পরিকল্পনা ছিল অজগরের লেজে ফাঁস বেঁধে হিড়হিড় করে ওটাকে মাটিতে টেনে তুলবেন। এরপর বেঁধেছেঁদে হাতির পিঠে তুলে দেবেন। পরিকল্পনাটা দুই শিকারীকে বুঝিয়ে দিলেন তিনি। শিকারীরা বলল উইন্ডহ্যাম যদি অজগরের লেজে ফাঁস পরিয়ে দিতে পারেন তাহলে সাপটাকে খালের পাড়ে টেনে তুলতে তাদের অসুবিধে নেই। উইন্ডহ্যাম নিশ্চিত, ফাঁস পরানোর কাজটা শিকারীদের চেয়ে অনেক ভাল পারবেন। বার কয়েক সামনে এগিয়ে আবার পিছানোর পরে ওরা তিনজন নিঃশব্দে নেমে পড়লেন পানিতে। প্রত্যেকেই চেষ্টা করলেন যতটা দূর থেকে সম্ভব অজগরের লেজে ফাঁস পরাতে। কিন্তু সম্ভব হলো না কাজটা। কাজেই পা টিপে টিপে আরও কাছে এগিয়ে যেতে হলো তাদের। অজগরটার কাছ থেকে হাতখানেক দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। একজন আরেকজনকে ইশারা করছেন ফাঁস পরিয়ে দিতে। কিন্তু কেউ সাহস পাচ্ছেন না। এমন সময় পানির নিচ থেকে হাতখানেক ওপরে মাথা তুলল অজগর, ঘুরতে শুরু করল ওদের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বিকট চিৎকার করে উঠল দুই শিকারী, 'ভাগো সাহেব, ভাগো!' বলেই এক লাফে পানির ওপরে। উইন্ডহ্যাম তার আগেই উঠে পড়েছেন তীরে এবং তীর বেগে ছুটেছেন ঝোপ লক্ষ্য করে। শিকারীরাও হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটল তাঁর পেছন পেছন। ওদিকে অজগরটা খালের মধ্যে ডুবে থাকা প্রকাণ্ড একটা জামুন গাছের শিকড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল, চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে। ভয় তাড়িত কমিশনার এবং তাঁর দুই শিকারীর দৌড় দেখে করবেট এবং মাহুতের হাসতে হাসতে হাতির পিঠ থেকে প্রায় পড়ে যাবার দশা।

মাসখানেক পর উইন্ডহ্যামের কাছ থেকে চিঠি পেলেন জিম করবেট। জানা গেল উইন্ডহ্যাম ওই দিনই আসছেন কালাধুঙ্গিতে। অনুরোধ করেছেন অজগরটিকে যদি আবার ধরে দিতে পারেন। অজগরটা জায়গা বদল করেছে,

খবর পেয়েছেন করবেট। সম্বর হরিণদের বিচরণভূমিতে, একটা গাছের নিচে নতুন আস্তানা ছিল ওটার। কিন্তু ধুলো ধূসরিত জায়গাটায় পৌঁছে দেখলেন মরে পড়ে আছে অজগরটা। কিছুক্ষণ আগে সাপটাকে মেরে রেখে গেছে এক জোড়া ভোঁদড়।

ভোঁদড়রা অজগর শিকার করে, মাঝেসাঝে কুমিরও মারা পড়ে তাদের হামলায়। তবে কাজটা স্রেফ শিকারের আনন্দ পেতে নাকি খাদ্য সংগ্রহের জন্যে করে বলতে পারবেন না করবেট। তবে তাদের শিকারের ধরন দেখেছেন তিনি। বেশির ভাগ সময় জোড়াবদ্ধ হয়ে শিকার করে ভোঁদড়। আর সব সময় লক্ষ্য থাকে শিকারের মাথা বা ঘাড়। অজগর বা কুমির যাকেই টার্গেট করুক না কেন ভোঁদড়রা, সব সময় দু'পাশ থেকে হামলা চালায়। একজন থাকে ডানে, অপরজন বামে। অজগর বা কুমির ডানের শিকারীকে প্রতিহত করার জন্য ঘুরলে বাঁ দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্য ভোঁদড়টা। শিকারের গলা বা ঘাড়ে কামড় দিয়েই সরে যায়। এভাবে একের পর এক কামড় দিয়ে কাহিল করে ফেলে শিকারকে। ঘাড় ভেঙে নেতিয়ে না পড়া পর্যন্ত হামলা চলতেই থাকে। কুমির এবং অজগর দুটোরই শক্ত জান বলে সহজে মরে না। ফলে লড়াই হয় দীর্ঘস্থায়ী।

জিম করবেটেরা যে অজগরটিকে ধরতে গিয়েছিলেন ওটা লম্বায় ছিল ১৭ ফুট, বেড় ২৬ ইঞ্চি। করবেটের ধারণা, বিশাল এই সরীসৃপটিকে হত্যা করতে প্রচুর ঝুঁকি নিতে হয়েছিল ভোঁদড়দের।

হাতি আর বাঘের লড়াই জঙ্গলে একটি বিরল ঘটনা। পারতপক্ষে হাতি এবং বাঘ পরস্পরকে ঘাঁটায় না। কারণ বিশালদেহী হাতির অসুরিক শক্তিকে ভয় করে চলে জঙ্গলের সব জানোয়ারই। আর সেধে বাঘের সাথে ঝগড়া করার প্রয়োজন পড়ে না হাতিরও। তবে একবার তানাকপুরে হাতি আর বাঘের ভয়াবহ লড়াই হয়েছিল। এ গল্প তানাকপুরের নায়েব তহশিলদারের কাছে শুনেছেন করবেট। গল্পের চেয়েও রোমাঞ্চকর ছিল সে-কাহিনি। জঙ্গলের রাজা হাতি হয়ে পড়েছিল বাঘের শিকার।

তানাকপুর হলো উধ তিরহুট রেলওয়ের শাখা লাইনের একটি রেলস্টেশন। সারদা নদীর ডান তীরে পাহাড়ের ঠিক নিচে গড়ে ওঠা তানাকপুরের ব্যবসায়িক গুরুত্বও কম ছিল না। এক সময় সারদা উঁচু বাঁধের পাশ দিয়ে বয়ে চলত। ওখানেই গড়ে উঠেছিল তানাকপুর। আর যে ঘটনার কথা বলতে যাচ্ছি সেটা ঘটেছে তানাকপুর থেকে দুই মাইল দূরে সারদার একটি শাখা নদীতে। একশো ফুট উঁচু মূল বাঁধের মাঝখান দিয়ে সারদার অনেকগুলো শাখা তৈরি হয়েছিল। শাখাগুলো বয়ে চলত ঘন জঙ্গুলে দ্বীপের পাশ দিয়ে।

একদিন তানাকপুরের দুই মাঝি গেছে সারদা নদীতে মাছ ধরতে। সন্ধ্যা পর্যন্ত মাছ ধরল তারা। তারপর রওনা হলো বাড়ির উদ্দেশে। নদী থেকে দু'মাইল দূরে তাদের বাড়ি। সারদার শেষ প্রশাখার মাথায়, বাঁধের ওপারে ঘন ঘাসের জঙ্গলে একটা দ্বীপ, চওড়ায় বড় জোর চল্লিশ গজ হবে। সেই দ্বীপ ঘুরে দুই মাঝি আসছিল। হঠাৎ দেখল দুটো বাঘ শাখা নদীর দূর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা এর আগেও বাঘ দেখেছে। জানে বাঘকে বিরক্ত না করলে বাঘও ওদের কিছু করবে না। তাই বসে পড়ল দু'জনে। বাঘ দুটোর চলে যাওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল।

অনেকক্ষণ বসে থাকল ওরা। ততক্ষণে পুরোপুরি আঁধার নেমে এসেছে, আকাশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ। বাঘ দুটোকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মাঝিরা। হঠাৎ ঘাসের জঙ্গল নড়ে উঠতে দেখল ওরা। নদীর যে পাড় ধরে এসেছে মাঝিরা, সেখানে, জঙ্গলের ধারে উদয় হলো দাঁতাল, প্রকাণ্ড এক হাতি। এই দাঁতালটাকে তানাকপুরের অনেকেই দেখেছে। হাতিটার একটা বদভ্যাস আছে, প্রায়ই চেনি ফরেস্ট বাংলোর পিলার ধরে টানাটানি করে। তানাকপুর বন বিভাগের লোকজন দাঁতালটাকে পছন্দ না করলেও ওটা কোন মানুষের ক্ষতি করেছে বলে শোনা যায়নি।

প্রশাখা বা চ্যানেলের ধারে আসতেই দূর প্রান্তের বাঘ জোড়াকে দেখে ফেলল হাতি। সাথে সাথে শুঁড় উঁচিয়ে হুংকার ছাড়ল। তারপর ভীতিকর ভঙ্গিতে এগোল বাঘ দুটোর দিকে। হাতিটাকে আগে বাড়তে দেখে বাঘ দুটোর একটা ওটার মুখোমুখি হবার প্রস্তুতি নিল, অন্যটা চট করে পিছনে চলে গেল হাতির। লাফ মেরে উঠে পড়ল পিঠে। মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল হাতি, শুঁড় হেলিয়ে দিল পিছনে, বাগে পেতে চাইল পিঠের ওপর চড়ে বসা মূর্তিমান যন্ত্রণাটাকে। ততক্ষণে সামনের বাঘটাও লাফিয়ে উঠে বসেছে মাথায়। রাগে ডাক ছাড়তে শুরু করল হাতি। সেই সাথে বাঘ দুটোও সমানে গর্জন করতে লাগল। বাঘ যখন রেগে গিয়ে গর্জন ছাড়ে, সেই নিনাদের ভয়াবহতার তুলনা হয় না। আর তার সাথে যোগ হয়েছে ভয়ার্ত হাতির চিৎকার। দুই মিলে এমন ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো, দুই মাঝি তাদের জাল আর মাছ রেখে দে ছুট। বিরতিহীন লম্বা দৌড়ে সোজা তানাকপুর।

তানাকপুরের মানুষজন তখন সান্ধ্যভোজনে বসেছে। তাদের কানেও ভেসে এল যুদ্ধমান তিন প্রাণীর তর্জন-গর্জন। একটু পরেই হাঁফাতে হাঁফাতে সেই দুই মাঝি এসে হাজির। বলল তারা নিজের চোখে দেখে এসেছে একটা হাতি আর এক জোড়া বাঘ লড়াই শুরু করে দিয়েছে। কয়েকজন অতি সাহসী যুবক লড়াই দেখতে বাঁধের ধারে গেল। কিন্তু মনে হলো হাতি আর বাঘ লড়াই করতে

করতে ছুটে আসছে তাদেরই দিকে। এক মুহূর্ত দেরি না করে তারাও ছুটল বাড়ির দিকে। তারপর শোনা গেল শুধু ঝপাঝপ শব্দ। তানাকপুরবাসী যে যার ঘরের ঝাপ ফেলে দিচ্ছে, বন্ধ করছে দরজা।

সে রাতের লড়াই নিয়ে নানা জন নানা মন্তব্য করছে। কারও মতে, সারা রাত লড়াই চলেছে। কেউ বলছে না, মাঝ রাতেই থেমে গেছে লড়াই। তবে ম্যাথিসন নামে এক ভদ্রলোক বলেছেন অনেকক্ষণ চলেছে লড়াই। তাঁর বাংলো ছিল বাঁধের ধারে। তিনি নাকি অমন ভয়ংকর চিৎকার এবং গর্জন জীবনেও শোনেননি। গুলির শব্দও শোনা গেছে। গুলিটা পুলিশে করেছে, নাকি ম্যাথিসন, জানা যায়নি। তবে লড়াই থামাতে বা যুদ্ধমান প্রাণীগুলোকে বিচ্ছিন্ন করতে গুলি করা হয়নি।

পরদিন তানাকপুরের অধিবাসীরা বাঁধের ধারে ভিড় জমাল। একশো ফুট উঁচু বাঁধের পাথুরে পাদদেশে হাতিটাকে মরে পড়ে থাকতে দেখল তারা। গাঁয়ের লোকে করবেটকে বলেছে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মৃত্যু ঘটেছিল বিশালদেহী প্রাণীটার। তবে হাতিটার দেহের কোন জায়গা থেকেই মাংস খায়নি বাঘ, আহত বাঘ দুটোকেও দেখতে পায়নি তানাকপুরবাসী।

করবেট বলেছেন, হাতিটাকে হত্যার কোন উদ্দেশ্যই ছিল না বাঘগুলোর। সম্ভবত বাঘ দুটো মিলিত হচ্ছিল। ওই সময় বেরসিকের মত হাজির হয়ে যায় হাতি, নিজের রাস্তা থেকে সরানোর জন্যে তেড়ে গিয়েছিল। মিলনের আনন্দ বিঘ্নিত হওয়ায় খেপে যায় বাঘ, আক্রমণ চালায় হাতির ওপর। কিভাবে অমন প্রকাণ্ড প্রাণীটাকে কাবু করেছে বাঘ, সে-ধারণাও দিয়েছেন করবেট। তাঁর মতে, একটা বাঘ হাতির মাথার ওপর উঠে খামচে ওটাকে অন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর দানবটাকে হত্যা করতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি তাদেরকে।

সব মাংসাশী প্রাণীই দাঁত দিয়ে শিকার করে। মাঝে মাঝে থাবাও ব্যবহার করে। আর হামলার সময় তাদের নড়াচড়া এত দ্রুত হয়ে ওঠে, প্রায় চোখে দেখা যায় না। বাঘ বা চিতা সাধারণত পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের শিকারের ওপর। কখনও কখনও প্রকাণ্ড লাফ মেরে বা স্বল্প দূরত্ব বিদ্যুৎ গতিতে অতিক্রম করে শিকারের গলা কামড়ে ধরে। এক ঝাঁকুনিতে গলা বা ঘাড়ের হাড় ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে। আর সম্ভব না হলে গলা কামড়ে ধরে শিকারকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে। কাজটা মোটেও সহজ সাধ্য নয়। প্রাপ্তবয়স্ক সম্বর বা চিতলকে গলা কামড়ে শুইয়ে দেয়ার সময় এরা যে ভাবে পা ছুঁড়তে থাকে, জায়গামত লাগলে বাঘ বা চিতা জন্মের মত খোঁড়া হয়ে যেতে পারে। আর লাথি থেকে রক্ষা পেতে শিকারীর প্রাণপণ চেষ্টা থাকে শিকারের মাথা মাটির সাথে চেপে ধরে মুচড়ে ভেঙে ফেলার। মাটিতে চেপে ধরা হলে শিকার ব্যর্থ আক্রোশে

শুধু উদ্দেশ্যহীন পা ছুঁড়তে থাকে, শিকারীর তাতে কোন সমস্যা নেই। শিকারী তার শিকারের ঘাড়ের শিরা প্রথম সুযোগেই টেনে ছিঁড়ে ফেলে।

চিতাকে কখনও শিকারের পা খোঁড়া করে দিতে দেখেননি জিম করবেট, বাঘকে দেখেছেন। এ কাজে থাবা ব্যবহার করে বাঘ। একবার করবেটের এক বন্ধু খবর নিয়ে এল নৈনিতাল থেকে মাইল দুয়েক দূরে, সেন্ধারগিরিতে বাঘ তার গরু মেরে ফেলেছে। বন্ধুর গরু-বাছুরের খামার আছে। পালের অনেক গরুই বাঘ বা চিতার পেটে গেছে। তবে এবারের গরুটার যেভাবে ঘাড় ভেঙে, শরীর ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়েছে, তাতে তার ধারণা, এ বাঘের কীর্তি নয়। অচেনা কোন প্রাণীর কাণ্ড।

সন্ধ্যা হতে তখনও অনেক বাকি, তাই বন্ধুকে নিয়ে নিহত প্রাণীটাকে দেখতে বেরিয়ে পড়লেন করবেট। পঞ্চাশ ফুট চওড়া একটা ফায়ার ট্র্যাকের ওপর পূর্ণ বয়স্ক গরুটার লাশ পড়ে ছিল। ওটাকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়নি। বন্ধুর বর্ণনা শুনে করবেট ভেবেছিলেন হিমালয়ের কালো ভল্লুকের কাজ। ভল্লুক মাংসাশী নয়, তবে প্রায়ই প্রাণী হত্যা করে। আর এদের হত্যা প্রক্রিয়াও খুবই নৃশংস। কিন্তু গরুটাকে দেখে বুঝলেন ভল্লুকে নয়, বাঘে মেরেছে এবং অস্বাভাবিক উপায়ে। প্রথমে ওটার পা খোঁড়া করে দেয়া হয়েছে। তারপর ছিন্নভিন্ন করেছে শরীর। হত্যার পর গরুটার মাংস সামান্যই খেয়েছে বাঘ। শক্ত মাটিতে পায়ের ছাপ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় ভেবে জঙ্গলটা ঘুরে দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন করবেট। সূর্যাস্তের সময় ফিরে এলেন লাশের ধারে। সারারাত কাটিয়ে দিলেন গাছের ওপর। কিন্তু শিকারের কাছে ফিরে এল না শিকারী। এ বাঘটা এর আগেও ছ'টা গরু আর তিনটে মোষ হত্যা করেছে। একই কায়দায়। কোন শিকারের কাছেই আর ফিরে যায়নি সে।

বাঘের এই হত্যা প্রক্রিয়া মানুষের কাছে নিষ্ঠুর মনে হতে পারে। তবে বাঘের দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিকই আছে। খাবারের জন্যে হত্যা করেছে সে। আর হত্যা প্রক্রিয়া নির্ভর করে তার শারীরিক সামর্থ্যের ওপর। ওই বাঘটার পক্ষে শিকারের জন্যে তার শ্বদন্ত ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি, পারেনি দাঁতে কামড়ে ধরে শিকার বয়ে নিয়ে যেতে। এ জন্যে দাঁতের বদলে থাবা ব্যবহার করতে হয়েছে তাকে। থাবা দিয়ে মাংস ছেঁড়ার একটাই মানে থাকতে পারে—বাঘটার শারীরিক কোন ত্রুটি ছিল। আর এ ত্রুটির জন্যে, করবেটের বিশ্বাস, মানুষই দায়ী। হয়তো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গুলির ব্যর্থ নিশানায় তার নিচের চোয়ালের একাংশ উড়ে গিয়েছিল। এ কারণে সে শিকার করতে দাঁত ব্যবহার করতে পারত না। একই কারণে মাংসও খেত কম।

দশ নম্বর গরুটাকে হত্যার পরে ওই এলাকার আর কোন গরু বাছুর বাঘের

কবলে পড়েনি। করবেট ধরে নিয়েছিলেন আহত বাঘটা এই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। হয়তো কোন গুহায় আশ্রয় নিয়েছে।

গরুর পা খোঁড়া করে হত্যার এই ঘটনা অস্বাভাবিক মনে হলেও করবেট এ রকম ঘটনা আরও দেখেছেন। বিশাল বপু মোষের প্রথমে পা খোঁড়া করে তারপর মাটিতে চেপে ধরে, কামড়ে ঘাড় ভেঙে ফেলার রোমহর্ষক দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতাও নেহায়েত কম নয় বিশ্বখ্যাত শিকারীটির।

# পাখি ও সাপ

জিম করবেটকে তাঁর বড় ভাই টম একটা গুলতি দিয়েছিলেন। ওটা ভেঙে যাবার পর জিম নিজে একটা পেলেট বো (Pellet bow) তৈরি করেন। সাধারণ ধনুকের সাথে এটার পার্থক্য হলো, পেলেট বো দিয়ে বন্দুকের গুলির মত ছোট গুলি ছোঁড়া যায়। তবে পেলেট বো দিয়ে গুলি ছোঁড়া যেমন তেমন লোকের কম্ম নয়। রীতিমত প্র্যাকটিস দরকার। এই ধনুকে দুটি ছিলা থাকে। ছিলা দুটির মাঝখানে আছে ছোট, চৌকোনা একটুকরো মোটা কাপড়। ওখানে গুলি রাখতে হয়। গুলি ছোঁড়ার সাথে সাথে ধনুক থেকে হাত সরিয়ে না নিলে ধনুক ধরা হাতের বুড়ো আঙুল ভেঙে বা থেঁতলে যাবার সম্ভাবনা খুবই বেশি। সাধারণ গুলতি দিয়ে যতদূরে গুলি ছোঁড়া যায়, পেলেট বো দিয়ে তার দ্বিগুণ দূরে গুলি ছোঁড়া সম্ভব। তবে গুলতির মত নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করতে ব্যর্থ পেলেট বো। নৈনিতাল ট্রেজারীতে রেগুলার আর্মির যে গুর্খারা পাহারা দিত তাদের সাথে জিম করবেট প্রায়ই পেলেট বো ছোঁড়ার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়তেন। গুর্খাদের ক্যাম্প ছিল করবেটদের সামার হোম-এর কাছেই, রাস্তার ওপারে। গুর্খারা পেলেট বো ছুঁড়তে খুব মজা পেত। তাই প্রায়ই ডাক পড়ত জিম করবেটের। মাটিতে কাঠের একটা পোস্ট ছিল। তাতে ঝোলানো থাকত বিরাট এক ঘণ্টা। এক ঘণ্টা পর পর ওতে বাড়ি মেরে সময় জানিয়ে দিত গুর্খারা। ওই কাঠের পোস্টে একটা দেশলাইয়ের বাক্স ঝুলিয়ে, বিশ গজ দূর থেকে তাতে টার্গেট প্র্যাকটিস করার জন্যে করবেটকে আহ্বান করত গুর্খারা। গুর্খাদের এক হাবিলদার ছিল। দশাসই শরীর, ষাঁড়ের মত শক্তি গায়ে। এই লোকটা তার দলের মধ্যে সবচে' ভাল ধনুক ছুঁড়তে পারত। তবে করবেটের সাথে সে কখনোই পেরে ওঠেনি। প্রতিযোগিতায় সব সময় জিতে গেছেন কিশোর জিম।

পেলেট বো তৈরি করার পর নিজেকে প্রায়ই ফেনিমোর কুপারের গল্পের রেড ইন্ডিয়ান ভেবে দিবা স্বপ্ন দেখতেন জিম করবেট। ওই সময় এই লেখকের বই গোগ্রাসে গিলেছেন তিনি। আর কল্পনায় তীর-ধনুক হাতে রেড ইন্ডিয়ান সর্দারকে তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতায় হারিয়ে আমোদ পেতেন।

নৈনিতালে, করবেটদের বাড়ির ধারে দুটো খাল ছিল। বর্ষায় ফুলে ফেঁপে উঠত খাল জোড়া। দুটি খালেরই বালুময় তীরের পাশে ছিল জঙ্গল। বেশ লম্বা-চওড়া ওই জঙ্গলে প্রচুর পশু-পাখির বাস। বড় হয়ে করবেট একটা সিনে-ক্যামেরা

কিনেছিলেন। দিনের পর দিন খালের ধারের গাছে উঠে তিনি চেষ্টা করেছেন পানি খেতে আসা বাঘের ছবি তুলতে। এই জঙ্গলে কুকুর ম্যাগগকে নিয়ে অনেক ঘুরে বেড়িয়েছেন করবেট। অতি পরিচিত হয়ে গিয়েছিল খাল দুটির আশপাশের সমস্ত জায়গা। খালের মধ্যে অনেক সময় গাছ পড়ে থাকত। করবেট কখনোই সতর্ক নজর না বুলিয়ে খাল পার হতেন না। কারণ পানিতে আধডোবা গাছের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকত বাঘ। সাধারণত সূর্যাস্তের সময় খালে পানি খেতে আসত বনের রাজা। তবে শিকার মিললেই শুধু আসত। ভরপেট পানি খেয়ে, সূর্যোদয়ের আগে আগে ফিরে যেত গভীর জঙ্গলে। খালের তীরে, কাদায় পায়ের ছাপ দেখেই বোঝা যেত বাঘ এসেছিল। আর আসত খালের বাম ধারের জঙ্গল থেকে। বাঘ এসেছে বুঝতে পারলে করবেট আর জঙ্গলে ঢুকতেন না পাখি শিকার করার জন্যে।

এই খাল জোড়া করবেটের কাছে ছিল অফুরন্ত কৌতূহলের উৎস। এ জঙ্গলে প্রথমে তিনি ঢুকেছেন গুলতি হাতে, তারপর ধনুক নিয়ে, এরপর মাজ্‌ল লোডার এবং সবশেষে আধুনিক রাইফেল নিয়ে। সূর্য ওঠার সময় নগ্ন পায়ে জঙ্গলে ঢুকতেন তিনি, সারাদিন কেটে যেত সবুজ অরণ্যে। খালের দু'পাশের প্রতিটি প্রাণীর পায়ের ছাপ এক সময় চিনে গিয়েছিলেন করবেট। অদম্য আগ্রহ ছিল ওদের অভ্যাস, ভাষা ইত্যাদি চিনে নেয়ার। সবার আগে পাখিদের স্বভাব-চরিত্র চিনে নেন তিনি।

জিম করবেট জঙ্গলের পাখি, পশু এবং বুকে হাঁটা প্রাণীদের নানা ভাগে ভাগ করেছেন। পাখিদের ভাগ করেছেন তিনি ছ'টি দলেঃ

১. এক দল পাখি আছে যারা প্রকৃতির বাগানকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে। এই দলে আছে মিনিভেট, ওরিয়ল (কালো পালকঅলা সোনালি রঙের পাখি) এবং সানবার্ড।

২. এক দল পাখি আছে যারা জঙ্গলকে ভরিয়ে রাখে গানের সুরেঃ থ্রাশ (গায়ক পাখি) রবিন এবং শ্যামা।

৩. জঙ্গলকে পুনর্গঠন করে যে পাখির দলঃ বারবেট (দাড়িঅলা পাখি), হর্নবিল এবং বুলবুল।

৪. যে পাখিরা বিপদআপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়ঃ ফিঙ্গে, বন কুক্কুট ও ব্যাবলার।

৫. প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে চলে যে পাখির দলঃ ঈগল, বাজ এবং পেঁচা।

৬. স্ক্যাভেঞ্জারের দায়িত্ব পালন করে যে পাখিঃ শকুন, চিল ও কাক।

**প্রাণীদের মোট পাঁচটি দলে ভাগ করেছেন করবেট:**

১. যে সব প্রাণী প্রকৃতির বাগানকে সুন্দর করে রেখেছে তাদের মধ্যে আছে হরিণ, অ্যান্টিলোপ এবং বানর।

২. ভল্লুক, শুয়োর এবং শজারুদের তিনি রেখেছেন জঙ্গল পুনর্গঠন করে রাখা প্রাণীদের তালিকায়।

৩. যে সব প্রাণী বিপদ সম্পর্কে আগাম সাবধান করে দেয়: হরিণ, বানর এবং কাঠবেড়ালি।

৪. প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে যারা: বাঘ, চিতা এবং ওয়াইল্ড ডগ বা বুনো কুকুর।

৫. স্ক্যাভেঞ্জারের দায়িত্ব পালন করে: হায়েনা, শেয়াল এবং শুয়োরের দল।

**বুকে হাঁটা প্রাণী বা সরীসৃপদের আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন তিনি:**

১. বিষাক্ত সাপ: এ দলে রয়েছে গোক্ষুর, ক্রেট (krait) এবং ভাইপার।

২. নির্বিষ সাপ: পাইথন, গ্রাস-স্নেক ও ধামিন (র‍্যাট স্নেক)।

জঙ্গলের প্রাণীদের এই ভাগগুলো করা হয়েছে প্রতিটির প্রকৃতি ও স্বভাব অনুযায়ী। করবেট লক্ষ করেছেন প্রতিটি প্রাণীরই রয়েছে নিজস্ব ভাষা। বিরল দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এক প্রজাতি অন্য প্রজাতির ভাষায় কথা বলতে পারে না। তবে জঙ্গলের সমস্ত প্রজাতি একে অন্যের ভাষা বুঝতে পারে। আর বিরল প্রজাতির মাঝে রয়েছে ব্যাকেটের মত লেজঅলা ফিঙ্গে এবং সবুজ বুলবুল। পাখি-প্রেমীদের খুবই প্রিয় হলো ফিঙ্গে। এই পাখিটি জঙ্গলের প্রায় সব প্রজাতির পাখি এবং চিতল হরিণের ডাক নকল করতে পারে। ফিঙ্গে জঙ্গলের সমস্ত পাখির বন্ধু। বাজ, বেড়াল, সাপ বা গুলতি হাতে শিকারী দেখলে বিশেষ সুরে গেয়ে ওঠে ফিঙ্গে। সাবধান করে দেয় স্বজাতিসহ অন্যান্য পাখিদের। ফিঙ্গের দৃষ্টি শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তার ধারাল চোখে প্রায় কিছুই এড়ায় না। কোন পাখিকে সুস্বাদু কেন্নো বা রসালো বিছে খেতে দেখলে সে বাজপাখির গলায় তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে ওঠে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই পাখির ওপর। দশবারে নয়বারই সে সফল হয় খাবার কেড়ে নিতে।

চিতল হরিণদের বন্ধুও বটে ফিঙ্গেরা। চিতা বা বাঘ দেখলে চিৎকার করে চিতলদের সাবধান করে দেয়। এ দৃশ্য করবেট বহুবার দেখেছেন। ফিঙ্গের চিৎকার অনেকবার বাঁচিয়ে দিয়েছে চিতলের প্রাণ।

ফিঙ্গেরা কথা বলতে পারে কিনা জানেন না করবেট। তবে ওদের শিসের সুরে গাইতে দেখেছেন তিনি। উঠতিরহুট রেলওয়ের মানকাপুর জংশনের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান স্টেশন মাস্টার ফিঙ্গে আর শ্যামাদের শিস শেখাত। শিসের সুরে গাইত

পাখিগুলো। ওদের গান শুনিয়ে দু'পয়সা কামাত স্টেশন মাস্টার। ওই সময় মানকাপুর জংশনে ভোরবেলা এবং দুপুর বেলা যে ট্রেন থামত, সেই সব ট্রেনের যাত্রীরা হুড়মুড় করে ছুটত স্টেশন মাস্টারের বাংলোতে ফিঙ্গে আর শ্যামার শিসের সুরে গান শুনতে। অনেক সময় দেখা যেত খাঁচা ভর্তি ওই পাখি কিনে ট্রেনে ফিরছে যাত্রীরা। স্টেশন মাস্টার খাঁচাসহ একেকটি পাখি বিক্রি করত ত্রিশ রূপীতে।

প্রাণীদের পায়ের ছাপ চেনাও করবেটের অন্যতম নেশা ছিল। অবশ্য শুরুতে বিভিন্ন প্রাণীর পায়ের ছাপ প্রায়ই গুলিয়ে ফেলতেন তিনি। যেমন বাচ্চা বয়েসী সম্বর হরিণ আর ব্লু-বুল (blue-bull)-এর পায়ের ছাপ আর বয়েসী শুয়োরের পায়ের ছাপ একই রকম মনে হত তাঁর কাছে। পরে পার্থক্যগুলো বুঝে উঠতে শুরু করেন করবেট। একবার চোখ বুলিয়েই বলে দিতে পারতেন শুয়োরের পায়ের ছাপের সাথে জঙ্গলের খুরঅলা অন্য প্রাণীদের পায়ের ছাপের পার্থক্য। বলতে পারতেন ব্যাঘ্র শাবক আর চিতার ট্র্যাকের কোন্‌টার ধরন কি। তবে বুনো কুকুর এবং হায়েনার পায়ের ছাপের সাথে চিতার পায়ের ছাপ মাঝে মাঝে গুলিয়ে যেতে চাইত তাঁর।

জঙ্গলের একটি প্রাণী খুব আকর্ষণ করত জিম করবেটকে। আর তা হলো সাপ। সাপ নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন তিনি। মাটিতে সাপের চলার ট্র্যাক দেখে বলে দিতে পারতেন ওটা বিষাক্ত নাকি নির্বিষ। ট্র্যাক দেখে বলতে পারতেন সাপটার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ। ভারতে তিনশো প্রজাতির সাপের মধ্যে করবেট মাত্র অল্প কয়েকটিকে বিষাক্ত বলে বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে সবচে' বিষাক্ত হলো রাজ গোক্ষুর এবং রাসেলস ভাইপার। রাসেলস ভাইপারের ট্র্যাক চেনার উপায় হলো এরা বালু বা ধুলোর ওপর ছোট ছোট কার্ভ বা বাঁক সৃষ্টি করে চলে। মাটিতে অতিরিক্ত মোচড় বা বাঁকের চিহ্ন থাকলে ধরে নিতে হবে ওটা বিষাক্ত সাপের ট্র্যাক। রাজ গোক্ষুর বেঁচে থাকে অন্য সাপ খেয়ে। এরা সাঙ্ঘাতিক দ্রুত গতিতে ছুটতে পারে। ঘোড়ার মতই গতি। রাজ গোক্ষুর লম্বায় সতেরো ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। করবেট চোদ্দ ফুটি কয়েকটি রাজ গোক্ষুর মেরেছেন।

নির্বিষ সাপদেরও গতি কম দুরন্ত নয়। আর এরা মোটামুটি সোজাসুজি ছুটে থাকে। মাটিতে খাড়া দাগ দেখলে বুঝতে হবে ওটা নির্বিষ সাপের ট্র্যাক।

ভারতে এক সময় প্রতি বছর বিশ হাজার মানুষ মারা যেত সাপের কামড়ে। তবে করবেটের ধারণা, এর মধ্যে অর্ধেকই মারা পড়ত ভয়ের চোটে। হাজার বছর ধরে শত রকম সাপের সাথে ভারতবাসীর বসবাস। অথচ তারা সাপ সম্পর্কে জানে খুব কম। তাদের মতে, সব সাপই বিষধর। বড় আকারের কোন সাপে কাটলেই তারা ধরে নেয় বিষধর সাপে কামড়েছে। তার আর রক্ষা নেই। আর এ

ভয়েই হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা যায় অনেকে। করবেটের ধারণা, নির্বিষ সাপের কামড়ে এরকমটি ঘটে বেশি।

ভারতের বেশির ভাগ গ্রামে সাপের ওঝা আছে যারা বাগাড়ম্বর করে সাপে কাটা রোগী সুস্থ করে দিতে পারবে। কিন্তু সত্যিকার বিষধর সাপে কাটা রোগীদের বাঁচানোর ক্ষমতা তাদের নেই। যারা বেঁচে যায়, তাদের বেশির ভাগ নির্বিষ সাপে কাটা রোগী। আর যাতায়াত ব্যবস্থা অপ্রতুল বলে গ্রাম থেকে শহরের হাসপাতালে সাপে কাটা রোগীদের পৌঁছুতে প্রায়ই দেরি হয়ে যায়। তখন ডাক্তারদের করার কিছুই থাকে না যদি রোগীকে বিষধর সাপে কামড়ায়।

হাসপাতালে বিষধর সাপের চার্ট টাঙানো থাকলেও গ্রামবাসীর তা খুবই কম কাজে লাগে। কারণ বেশিরভাগ মানুষ রাতের বেলা খালি পায়ে চলার সময় সাপের কামড় খায়। অন্ধকারে দেখার সুযোগ থাকে না কি ধরনের সাপ তাকে দংশন করেছে। আর গ্রামবাসীদের কুসংস্কার আছে—দংশন করা সাপকে মেরে ফেললে তার সঙ্গী আবার প্রতিশোধ নেবে। কাজেই জানা সম্ভব হয় না বিষাক্ত না নির্বিষ সাপ কামড়েছে।

জিম করবেট বিষাক্ত এবং নির্বিষ সাপ চেনার সহজ উপায় বাতলে দিয়েছেন। সাপ মেরে ওটার চোয়াল ফাঁক করে দেখতে হবে। মুখে দু'সারি দাঁত থাকলে বুঝতে হবে সাপটি বিষাক্ত নয়; তবে ওপরের চোয়ালে শ্বদন্ত থাকলে বোঝা যাবে ওটা বিষধর। নির্বিষ সাপের কামড়ে মাংসে এক সারি দাঁতের দাগ পড়ে। কিন্তু বিষাক্ত সাপের কামড়ে শুধু দুটি দাঁতের দাগ দেখা যায়। তবে মাঝে মাঝে একটি দাঁতের দাগও থাকে। এর কারণ হলো, বিষাক্ত সাপটি সঠিক অ্যাঙ্গেল থেকে ছোবল বসাতে পারেনি। কিংবা শিকারের হাতের বা পায়ের আঙুলে দুটো দাঁত লাগতেই পারেনি জায়গার স্বল্পতার কারণে।

---

# আবার পেত্নীর বাঁশি

জঙ্গলের প্রাণীদের ডাক চিনে নিতে তেমন সময় লাগেনি জিম করবেটের। সেই সাথে কিছু পশু এবং পাখির গলার স্বর অবিকল অনুকরণও করতে পারতেন তিনি। ছোট বেলাতেই বুঝে গিয়েছিলেন বনের প্রতিটি পশু-পাখির ডাকের ধরন আলাদা এবং বিনা কারণে কেউ কখনও ডাকে না।

একদিন একটা গাছের নিচে বসে আছেন জিম করবেট। জঙ্গলের মধ্যে খোলা একটা জায়গায় একদল চিতল হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে, অলস চোখে তাই দেখছেন। দলটাতে পনেরোটি মর্দা হরিণ, পাঁচটি বাচ্চাসহ। বাচ্চাগুলো সমবয়েসী। একটা বাচ্চা ঘুমাচ্ছিল। সূর্য পাটে যাবার সময় গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল সে। পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগোল মাটিতে পড়ে থাকা একটা গাছ লক্ষ্য করে। এটা হলো সঙ্কেত। এর মানে 'নেতার' পিছু পিছু এসো। দলের অন্যান্য বাচ্চা সদস্যরা তাদের নেতাকে অনুসরণ করল। গাছটার চারপাশে বৃত্তাকারে চক্কর দিল, একবার দৌড়ে গেল খোলা জায়গাটিতে, আবার ফিরে এল গাছের ধারে। লাফ ঝাঁপ দিচ্ছে। বার দুয়েক লাফালাফির পর নেতা জঙ্গলের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল সঙ্গীদের নিয়ে। একটা মাদী হরিণ শুয়ে ছিল। এবার উঠে দাঁড়াল ওটা। বাচ্চাগুলোর গমন পথের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় ডাক ছাড়ল। ডাক শুনে জঙ্গল থেকে তীরের মত বেরিয়ে এল বাচ্চাগুলো। তবে প্রাপ্তবয়স্ক মর্দাগুলোর এতে কোন ভাবান্তর ঘটল না। তারা ঘাস খাচ্ছিল। খেতেই থাকল। খোলা জায়গাটা থেকে খানিক দূরে একটা আল, কাঠুরেদের পায়ে চলার পথ। দেখা গেল কাঁধে কুড়োল নিয়ে এক লোক হেঁটে আসছে ওই রাস্তা ধরে। হরিণের দল থেকে লোকটার দূরত্ব কম করে হলেও একশো গজ, এমন সময় তাকে দেখতে পেল মাদী হরিণ। আবার তীক্ষ্ণ গলায় হাঁক ছাড়ল সে। মুহূর্তের মধ্যে গোটা দল হাওয়া।

সন্তানের জন্যে আশঙ্কিত মায়ের ডাক আর দলের সদস্যদের সাবধান করে দেয়ার জন্যে মাদীর চিৎকার, দুটোই সে সময় একই রকম মনে হয়েছিল করবেটের কাছে। পরে প্রাণীদের ডাক চিনতে শুরু করার সময় এসব পার্থক্য বুঝে উঠতে পারতেন সহজেই। কুকুরের ডাকের কথাই ধরা যাক। কুকুর কখন কি কারণে ঘেউ ঘেউ করে, ভালই বুঝতে পারতেন তিনি। প্রতিটি ডাকের ধরন আলাদা। সাধারণ মানুষের কাছে যদিও এক রকম মনে হবে। কুকুর তার প্রভুকে

দেখে আনন্দে এক সুরে ডাকে, তাকে বেড়াতে নিয়ে গেলে তার আনন্দ প্রকাশের ধরন অন্যরকম, আবার বেড়াল ধাওয়া করে তাকে ধরতে ব্যর্থ হলে তার ক্ষোভ প্রকাশের ভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা, অচেনা লোক দেখলে সে ভিন্ন গলায় ঘেউ ঘেউ করে, শেকল পরানো থাকলে অযথাই চিৎকার করে। যার বোঝার ক্ষমতা আছে সে জানে কুকুর কেন ঘেউ ঘেউ করছে।

প্রাণীদের ডাক চিনে এবং তাদের মত ডাকতে পারার দুর্লভ ক্ষমতা অর্জন করার কারণে জিম করবেটের কাছে জঙ্গল আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছিল। বনের পশু-পাখিরা কেউ কেউ দিনে বা রাতে হঠাৎ করে সামান্য ডেকেই চুপ হয়ে যায়। এর মানে হলো তারা কোন কারণে ভয় পেয়েছে। তবে এরকম ডাক একবারই ডাকে তারা। চিতা দেখে লেঙ্গুর (লম্বা লেজঅলা বানর) ডেকে ওঠে, সন্দেহজনক কিছুর নড়াচড়া দেখলে ডাক দেয় চিতল বা বাঘ এলে সাবধান করে দেয় ময়ূর। তবে মাত্র একবারের ডাক সনাক্ত করা কঠিন। আসন্ন বিপদ সম্পর্কে প্রস্তুত হওয়াও মুশকিল।

করবেটের বন্ধু স্টিফেন ডিয়াজ তাঁকে পাখি শিকারের জন্যে ডাবল ব্যারেলের একটি মাজ্‌ল্‌-লোডার বন্দুক দিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় ওটা দিয়ে অনেক পাখি শিকার করেছেন করবেট। একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি পাহাড় থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। জঙ্গলের মধ্যে, জোড়াখালের পাশ দিয়ে আসছিলেন তিনি। বেশ কিছুদিন ও এলাকায় বৃষ্টি না হবার কারণে আবহাওয়া ছিল শুকনো, খটখটে। করবেটের পিঠে একটি ঝোলা। তাতে একটি বন মোরগ এবং কালিগে পাখি। পাহাড়ের খাদের ধারে কালিগেটাকে শিকার করেছেন তিনি। তখনই লক্ষ করেছেন পশ্চিমাকাশে নীলচে-কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে। গাছের একটি পাতাও নড়ছিল না। সব যেন থম মেরে গেছে। ঝড়ের পূর্বাভাষ। শিলা বৃষ্টি হবার সম্ভাবনাই বেশি। পাহাড়ী মানুষ এবং প্রাণীরা শিলাবৃষ্টিকে ভীষণ ভয় পায়। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রবল বৃষ্টি মাইলের পর মাইল শস্য খেত মিশিয়ে দিতে পারে মাটির সাথে। খোলা জায়গায় থাকলে মানুষ এবং গরু-ছাগলের মৃত্যু অনিবার্য। শিলার আঘাতে কোন পশুকে মরতে দেখেননি করবেট তবে শকুন, ময়ূরদের অক্কা পেতে দেখেছেন।

আরও তিন মাইল রাস্তা হাঁটতে হবে করবেটকে। অবশ্য আঁকাবাঁকা গেম-ট্র্যাক ধরে গেলে দূরত্ব কমে আসবে আধামাইলটাক। আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইলেন তিনি।

মেঘের রং এখন কৃষ্ণ-কালো। একটু পর পর আকাশের বুকে ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ। জঙ্গলের সমস্ত প্রাণী নিশ্চুপ। শুধু দূর থেকে ভেসে আসছে মেঘের গর্জন।

ভারী গাছে ঠাসা একটা বেল্ট বা বেষ্টনির মধ্যে ঢুকে পড়লেন করবেট।

মাথার ওপর পাতার ঘন ছাউনি। আলো কমে আসছে ক্রমে। দ্রুত এগোলেন তিনি। তাঁর পা খালি। দেখে দেখে পা ফেলতে হচ্ছে। হঠাৎ বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ শোনা গেল। ঝড় আসছে। একটু পরেই জঙ্গলে হামলা করল বাতাস, হঠাৎ ছেড়ে দেয়া জল প্রবাহের মত ছর ছর শব্দে শুকনো পাতা ঘুরতে ঘুরতে উঠে গেল শূন্যে, আর ঠিক সে-মুহূর্তে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শুনতে পেলেন জিম—ডানসের 'পেত্নীর বাঁশি।' গা হিম হয়ে গেল তাঁর ভয়ঙ্কর চিৎকারটা শুনে। প্রথমে চিৎকারের শব্দটা কম ছিল, ক্রমে চড়া হয়ে উঠল, তারপর ফোঁপানিতে পরিণত হলো। কিছুদিন আগে বাঘের ভয়ে ম্যাগগকে নিয়ে জান-প্রাণ বাজি রেখে ছুটেছিলেন জিম। মনে হয়েছিল অমন দৌড় জীবনে দৌড়াননি। আর আজ ভয়ের চোটে এমন দৌড় দিলেন, যেন পাখা গজিয়েছে পায়ে। তবে করবেটের তাগত আছে বলতে হবে–বন্দুক এবং ভারী ঝোলা দুই নিয়েই ছুটেছেন। পায়ে পটপট করে কাঁটা ফুটল, বুড়ো আঙুল গেল মচকে। কিন্তু পেত্নীর বাঁশির ভয়ে ভীত কিশোর করবেট ওই মুহূর্তে কোন শারীরিক যন্ত্রণাই অনুভব করেননি। এক দৌড়ে বাড়ি। মাথার ওপর তখন রুদ্র আক্রোশে গর্জাচ্ছে মেঘ, বারান্দায় পা রেখেছেন জিম, এমন সময় ঝমঝমিয়ে শুরু হয়ে গেল শিলাবৃষ্টি। ঝটপট দরজা-জানালা বন্ধ করে হাঁপাতে লাগলেন তিনি।

ডানসে বলেছিল যে পেত্নীর বাঁশি শোনে তার পরিবারের ওপর নেমে আসে অভিশাপ। বালক জিম ভয় পেলেন, না জানি কোন্ দুর্যোগ নেমে আসবে তাঁর পরিবারের ওপর! পেত্নীর বাঁশির কথা তাই তিনি কাউকে বললেন না।

ওই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন জঙ্গলের ওধার মাড়ালেন না। কিন্তু কিশোর বয়সের তীব্র কৌতূহল একদিন আবার ওখানে টেনে নিয়ে গেল তাঁকে। সেদিনও ঘনিয়ে এসেছে সাঁঝ, জোরে বইছে বাতাস। একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন জিম, এমন সময় আবার ভয়াল ডাকটা শুনতে পেলেন। ভোঁ দৌড় দেয়ার প্রবল ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করলেন করবেট। কাঁপুনি উঠে গেছে গায়ে। খানিক পর আবার শোনা গেল চিৎকারটা। একটু পর আবার। করবেট সিদ্ধান্ত নিলেন জান যায় যাক, পেত্নীর বাঁশি রহস্য তাঁকে ভেদ করতেই হবে। এর আগেও পেত্নীর বাঁশির আওয়াজ শুনেছেন তিনি। কিন্তু আজতক পরিবারে কোন দুর্যোগের আভাস পাওয়া যায়নি। তাছাড়া তাঁর ভরসা ছিল খুব ছোট বলে চুড়েল বা পেত্নীটা তাঁর ঘাড় মটকে নাও দিতে পারে। গলার কাছে উঠে এসেছে হৃৎপিণ্ড, কাঁপতে কাঁপতে তিনি এগোলেন পেত্নীর বাঁশির রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে।

যেখান থেকে তীক্ষ্ণ চিৎকারটা আসছিল, করবেট দেখলেন সে-জায়গায় প্রকাণ্ড একটা গাছ পড়ে আছে। ঝড়ে পড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তবে পুরোপুরি মাটিতে ধসে পড়েনি, আরেকটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে আছে। এ গাছটা ঝড়ে

পড়া গাছটার চেয়ে আকারে ছোট। বড় গাছটার ওজনের চাপে ছোটটা সামান্য বেঁকে গেছে, যখনই বাতাস বইছে, হাওয়ার ঝাপটাটা যাচ্ছে বড় গাছটার ওপর দিয়ে। বড় গাছটা দুলে উঠছে তার অবলম্বনের গায়ে। দুটো গাছেরই চামড়া, ডাল-পালা শুকিয়ে খটখটে, কাঁচের মত মসৃণ। ফলে বাতাসের ধাক্কায় দুটো গাছের মসৃণ ছালে ঘষা লাগতেই সেই ভয়ঙ্কর শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে। বন্দুক মাটিতে রেখে হেলানো গাছটার ওপর উঠে বসলেন জিম, নিচে বাতাসের ধাক্কায় আর্তনাদ করতে লাগল 'পেত্নীর বাঁশি।' দৃশ্যটা দেখে মনে মনে হাসলেন তিনি। এই তাহলে পেত্নীর বাঁশির রহস্য। এর জন্যেই ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এরপর থেকে, জঙ্গলে অস্বাভাবিক কোন কিছু ঘটতে দেখলে বা শব্দ শুনলে ভয় না পেয়ে ওটার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে নামতেন জিম। এজন্যে ডানসের কাছে কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করেছেন। সে যদি পেত্নীর বাঁশির গল্প শুনিয়ে ভয় না দেখাত জিমকে তিনি হয়তো জঙ্গলের রহস্যময় এবং অস্বাভাবিক ব্যাপারগুলোর প্রতি আগ্রহ বোধ করতেন না। পেত্নীর বাঁশি জিম করবেটকে পরবর্তীতে জঙ্গলের অনুদঘাটিত উত্তেজক এবং আকর্ষণীয় ঘটনাগুলোর প্রতি কৌতূহলী করে তুলেছিল, যে সব ঘটনা গোয়েন্দা গল্পের চেয়েও চমকপ্রদ।

—

# জিম করবেটের গোয়েন্দাগিরি

পেত্নীর বাঁশির রহস্যোদ্ধারের পরে জিম করবেট সিদ্ধান্ত নেন জঙ্গলে কোন অস্বাভাবিক দৃশ্য ঘটতে দেখলে বা শব্দ শুনলে তা উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করবেন। অনেকটা গোয়েন্দা গল্পের গোয়েন্দাদের মত আর কি।

গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাসের শুরুটা সাধারণত হয় কোন রোমহর্ষক অপরাধের ঘটনা থেকে, রোমাঞ্চিত করে তোলে পাঠকদের—কিছু সময়ের জন্যে তারা ভুলে যায় যে উপন্যাস পড়ছে—একের পর এক শিহরণ জাগানো দৃশ্যপটের মধ্যে ডুবে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না অপরাধী ধরা পড়ে তার কৃতকর্মের জন্যে, পাঠক বুঁদ হয়ে থাকে বইতে।

তবে জিম করবেটের গোয়েন্দা গল্পের ধরনটা এ থেকে আলাদা, এতে কাহিনীর শেষে অপরাধীর সবসময় সাজা মেলে না। এখানে দুটো ঘটনার কথা উল্লেখ করা হলো যাতে জিম করবেটকে দেখা যাবে গোয়েন্দার ভূমিকায়।

## এক

কালাধুঙ্গি থেকে মাইল দশেক দূরে, বন বিভাগের একটি বাংলোতে ক্যাম্পিং করেছিলেন জিম করবেট। দুপুরের খাবারের জোগাড় করতে একদিন ভোর বেলা বেরিয়ে পড়লেন বুনো মোরগ শিকারে।

জিমের বাম দিকের রাস্তায় ঘন জঙ্গলে ঢাকা নিচু পাহাড়। এখানে সব ধরনের শিকার মেলে। ডান পাশে ধান এবং শস্য খেত। খেত আর রাস্তার মাঝখানে ঝোপ ঝাড় নিয়ে সরু একটা স্ট্রিপ। সকাল বেলায় কৃষকের দল মাঠে যেতে শুরু করেছে, তাদেরকে দেখে শস্য খেতে ব্যস্ত পাখিরা উড়ে চলে এল রাস্তার ওপর, গুলি করার জন্যে চমৎকার টার্গেট। কিন্তু জিমের ভাগ্য খারাপ, হাতের স্বল্প বোরের বন্দুক দিয়ে গুলি করা যাচ্ছিল না ওগুলো রেঞ্জের বাইরে বলে। তিনি খেতের শেষ সীমানায় নেমে পড়লেন গুলি না করেই।

পাখিগুলোর ওপর একটা চোখ করবেটের, আরেক চোখ রাস্তায়। একশো গজ দূরে একটা পাখি দেখতে পেয়েছেন তিনি, রাইফেলের সীমানার মধ্যে। কিন্তু সুযোগটা নষ্ট করে দিল একটা চিতাবাঘ। পাহাড় থেকে নেমে এসে করবেটের বাম দিকের রাস্তায় উঠে পড়েছে। রাস্তার বাম দিক ঘেঁষে কয়েক কদম হাঁটল ওটা,

তারপর চলে এল ডান পাশে। শুয়ে পড়ল একটা ঝোপের কাছে। একটু পরেই সিধে হলো চিতাবাঘ, এগোল বিশ গজের মত, আবার শুয়ে পড়ল আরেকটা ঝোপের পাশে। চিতাটার আচরণ রহস্যময় ঠেকল করবেটের কাছে। দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটার প্রতি কৌতূহলী হয়ে উঠেছে বাঘটা, তবে সে জিনিস রাস্তায় নেই। থাকলে ঝোপের মাঝ দিয়ে এগোত সে, রাস্তা ধরে নয়।

বাঘটা যেখানে প্রথম শুয়ে পড়েছিল সে জায়গায় চলে এলেন জিম করবেট। ঝুঁকলেন। চিতাটা এখান থেকে কি দেখেছে জানার চেষ্টা করলেন। শস্য খেত আর সরু ঝোপের চাপড়া যেখানে শেষ হয়েছে সে জায়গার পরে খোলা জমিন। চিতাটা দ্বিতীয়বার যেখানে শুয়ে পড়েছিল সেখান থেকেও খোলা জমিনটা পরিষ্কার দেখা যায়, পরীক্ষা করে দেখলেন করবেট। বুঝতে পারলেন বাঘটা যে কোন কিছুর প্রতিই আকৃষ্ট হোক না কেন তা আছে ওই খোলা জমিনের মধ্যে।

ঝোপের পর্দার আড়াল নিয়ে চিতা এগিয়ে গেছে আরও পঞ্চাশ গজ। এখানে শেষ হয়েছে ঝোপ। তারপর রাস্তার কিনারা ঘেঁষে অগভীর একটা গর্ত নেমে গিয়ে মিশেছে খোলা জমিনের সাথে। ঝোপের শেষ সীমানায় চিতাটা শুয়ে ছিল খানিকক্ষণ, তারপর বেশ কয়েকবার দিক পরিবর্তন করার পরে অবশেষে ঢুকেছে গর্তে, থেমে দাঁড়িয়েছে এবং ওখানে শুয়েওছে। রাস্তা থেকে বাতাসে তাড়িয়ে নিয়ে আসা বালু আর ধুলো গর্তের কিনারে জমেছে। এখানে খাটো কিছু ঘাসও জন্মেছে। ঘাসের সাথে লেগে থাকা ধুলো আর বালুতে চিতার পায়ের ছাপ পড়েছে, বোঝা যায় আগের দিন সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ, শিশির পড়ার সময় জানোয়ারটা এদিক থেকেই গিয়েছিল। গর্তের আশপাশে, কয়েক গজ জুড়ে জন্মানো ঘাস আর হালকা বালু এবং ধুলোর ওপরে আর কোন থাবার চিহ্ন নেই। আর খোলা জমিনে ট্র্যাকিং করাও সম্ভব নয়। তবে চিতাটা গর্তের যে জায়গা থেকে চলে গেছে সেখানে চোখ বুলিয়ে করবেট বুঝতে পারলেন ওটা ফুট দুই লম্বা ঘাসের চাপড়ার দিকে এগিয়েছে। ঘাসের চাপড়ার ধারে এসে, দশ ফুট দূর থেকেও দেখতে পেলেন মাটিতে ফুটে আছে সম্বর হরিণের খুরের গভীর ছাপ। এখান থেকে ত্রিশ গজের মত জায়গায়, মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে, মাটিতে গভীর ভাবে ফুটে রয়েছে চারটে খুরের চিহ্ন। দেখে মনে হয় হরিণটার পিঠে কিছু একটা চেপে বসেছিল আর ওটা বারবার চেষ্টা করেছে চেপে বসা আপদটাকে গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে। ত্রিশ গজ রাস্তার পরে সম্বর বাঁক নিয়েছিল বাম দিকে, সোজা ছুটে গিয়েছিল গর্তের দূর প্রান্তে একা দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাছের দিকে। এ গাছের ছালে এবং চার ফুট উঁচুতে করবেট সম্বরের গায়ের পশম আর কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখতে পেলেন।

শিকারী বুঝে গেলেন চিতাটা পাহাড়ের ওপরে, নিজের লুক-আউট থেকে

সম্বরটাকে দেখেছে খোলা জমিনে দাঁড়িয়ে ঘাস খেতে, ওটার অবস্থান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণের পরে ছুটে নেমে এসেছে এবং ঘাসের চাপড়ার আড়াল থেকে লাফ মেরে সওয়ার হয়েছে হরিণের পিঠে। সম্বরটাকে কামড়ে ধরে থেকেছে চিতা ওটা তাকে নিরাপদ কোন জায়গায় নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত, যেখানে শিকারকে হত্যা করা শিকারীর জন্যে সহজ হয়। হামলা চালানোর জায়গাতেই চিতা মেরে ফেলতে পারত সম্বরকে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক একটা জানোয়ারকে আড়ালে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না বাঘটার পক্ষে। খুরের ছাপ দেখেই করবেট বুঝতে পেরেছিলেন সম্বরটা ছিল পূর্ণ বয়স্ক। আর দিনের আলো ভাল ভাবে ফুটে গেলে শিকার খোয়া যাবারও আশঙ্কা ছিল। তাই চিতা সম্বরের পিঠে চড়ে, বসে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম গাছটার সাথে ধাক্কা মেরেও পিঠের অপ্রত্যাশিত সওয়ারীকে ফেলে দিতে ব্যর্থ হয়ে সম্বর আরও বারতিনেক চেষ্টা চালায়। শেষে দুশো গজ দূরের মূল জঙ্গলের দিকে ছুটে যায় এ আশায় যে গাছ দিয়ে যে কাজ হয়নি ঝোপের সাহায্যে সে উদ্দেশ্য পূরণ হবে। ঝোপের মধ্যে বিশ গজ যাবার পরে, শকুন আর মানুষের চোখের আড়াল হয়েছে বুঝতে পেরে চিতা কামড় বসিয়ে দেয় সম্বরের গলার পেছনে। হরিণটাকে হত্যা করার পরে তার মাংস খায় চিতা। জিম করবেট যখন ওখানে চলে আসেন, বাঘ ওই সময় তার শিকারের কাছেই ছিল। তবে করবেটকে ভয় পাবার দরকার ছিল না তার। কারণ তিনি ২৮ বোরের একটি বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছিলেন পাখি শিকার করার জন্যে।

চিতল, সম্বর, এমন কি ঘোড়ার ওপরেও এভাবে চিতা বাঘের সওয়ার হবার ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী জিম করবেট। তবে একটা বাঘও এরকম কাণ্ড ঘটিয়েছিল একবার।

সেবার মঙ্গোলিয়া খাট্টার কাছে তাঁবু খাটিয়েছেন করবেট। এটা একটা ক্যাটল স্টেশন, কালাধুঙ্গি থেকে মাইল দশ দূরে। এক সকালে, দেরিতে চা খাচ্ছেন তিনি, দূর থেকে মোষের গলায় বাঁধা ঘণ্টার তীব্র শব্দ শুনতে পেলেন। ওইদিন খুব ভোরে একটা চিতার ছবি তুলে তাঁবুতে ফিরেছেন করবেট, আসার সময় একটা নালার ধারে জন্মানো তরাই ঘাস খেতে ব্যস্ত একপাল মোষকে দেখে এসেছেন। জানোয়ারগুলো সংখ্যায় দেড়শোর কম হবে না। নালার তীরে একটা বাঘ আর একটা বাঘিনীর তাজা পায়ের ছাপ চোখে পড়েছে শিকারীর। ঘণ্টার বজ্রধ্বনি শুনে তিনি বুঝতে পারলেন মোষের দল আতঙ্কিত হয়ে ফিরে আসছে ক্যাটল স্টেশনে। ঘণ্টার শব্দ ছাপিয়ে মাঝে মাঝে একটা মোষের কাতর আর্তনাদও শোনা যাচ্ছিল। স্টেশনে মোষের রাখালরা ছিল সংখ্যায় দশ জন, তারা জানোয়ারটার চিৎকার শুনে সতর্ক হয়ে উঠল। তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করল তারা সেই সাথে টিনের পাত্র বাজাতে লাগল। চিৎকার-চেঁচামেচিতে মোষটার গোঙানি আর শোনা গেল না,

তবে পালটা ঘণ্টার শব্দ তুলে তীর বেগে ছুটে আসতেই থাকল।

কিছুক্ষণ পরে থেমে গেল সমস্ত কোলাহল, করবেটের কানে ভেসে এল দুটো গুলির আওয়াজ। ঘটনা কি জানতে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। দেখলেন এক তরুণ ইউরোপিয়ান, হাতে বন্দুক নিয়ে কয়েকজন ভারতীয় রাখালের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সামনে নিথর পড়ে আছে একটা মোষের লাশ। করবেটকে নিজের পরিচয় দিল তরুণ। সে ইজ্জতনগরে, ইন্ডিয়ান উড প্রোডাক্টসে চাকরি করে। রাখালদের সাথে কথা বলছিল সে, এমন সময় মোষের পালের ঘণ্টা ধ্বনি শুনতে পায়। শব্দ কাছিয়ে আসতে একটা মোষের গোঙানি শোনে তারা, সেই সাথে ভেসে আসে বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জন (করবেট দূরে ছিলেন বলে বাঘের গর্জন শুনতে পাননি), ভয় পেয়ে যায় তারা। ভাবে বাঘটা স্টেশনের দিকে আসছে। তখন একযোগে গলা তুলে চেঁচাতে থাকে এবং টিনের পাত্র বাজাতে শুরু করে। মোষের পালটা আসার পরে তারা দেখতে পায় একটা জানোয়ারের গা রক্তে মাখামাখি, ভয়ানক আহত হয়েছে ওটা। রাখালরা ইউরোপিয়ানকে তখন অনুরোধ করে আহত মোষটাকে মেরে ফেলে যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে। তরুণ পরপর দুটো গুলি করে মোষটাকে যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই দেয়।

গুলি খাওয়া মোষটা বয়সে তরুণ, স্বাস্থ্য খুব ভাল। পালের অন্যতম সেরা জানোয়ার ছিল ওটা। কিন্তু মোষটার ঘাড় কিংবা গলায় দাঁত অথবা থাবার চিহ্ন নেই দেখে ওটার মৃত্যু রহস্য উদ্‌ঘাটনে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন করবেট।

তিনি লক্ষ করেন মোষের পিঠে অসংখ্য আঁচড়ের দাগ। দেখেই বোঝা যায় বাঘের নখের আঁচড়। কিছু আঁচড় কাটা হয়েছে বাঘটা যখন মোষটার মাথার দিকে ছিল, আর বাকিগুলো সৃষ্টি হয়েছে বাঘ তার শিকারের লেজের দিকে থাকার সময়। বাঘ মোষের পিঠে সওয়ার অবস্থাতেই ওটার পাঁজরের কাছ থেকে পাঁচ পাউন্ডের মত মাংস খুবলে খেয়েছে, দশ থেকে পনেরো পাউন্ড মাংস খেয়েছে নিতম্বের দিক থেকে।

তাঁবুতে ফিরে এলেন করবেট। ভারী একটা রাইফেল নিয়ে মোষদের তৈরি ট্রেইলে ফিরে গেলেন। দেখলেন নালার দূর প্রান্তের ঘাস জমি দোমড়ানো-মোচড়ানো। তার মানে ও জায়গা থেকেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে শুরু করেছিল মোষের দল। আর ও জায়গাতেই এর আগে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে গেছেন করবেট। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে ঘাস ওদিকে কাঁধ সমান উঁচু, কাজেই বাঘটা কোন্ দিক থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মোষের গায়ে, বুঝতে পারলেন না তিনি।

নালার ধারের পায়ের ছাপ প্রমাণ করে দুটো বাঘই ছিল প্রাপ্তবয়স্ক। কাজেই অনভিজ্ঞ কোন বাঘ হুট করে লাফিয়ে পড়েনি হতভাগ্য মোষের পিঠে। আর কোন তরুণ বাঘের সাহসও হবে না সকাল দশটার সময় কিংবা অন্য যে কোন সময়

বিশাল মোষের পালের মাঝ থেকে কারও ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার।

তবে করবেট একটা ব্যাপারে নিশ্চিত যে বাঘটা হামলা চালিয়েছিল তরুণ মোষটার ওপর, তাকে হত্যা করার ইচ্ছে ছিল না ওটার। তাহলে মোষের ঘাড় এবং গলায় দাঁতের দাগ থাকত। কিন্তু কেন একটা বাঘ হঠাৎ করে পালের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোন মোষকে আহত করার দুঃসাহস দেখাবে, এর কারণ শত চিন্তা করেও বের করতে পারেননি বলে আফসোস থেকে গেছে জিম করবেটের।

# দুই

জিম করবেটের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হ্যারী গিলের ছেলে ইভলিন গিল। তার মত উৎসাহী প্রজাপতি সংগ্রাহক দ্বিতীয়টি দেখেননি করবেট। নৈনিতালে একবার ইভলিনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাঁর। কথা প্রসঙ্গে করবেট ইভলিনকে জানান পোয়ালগড়ের রাস্তায় অদ্ভুত একটি প্রজাপতি দেখেছেন তিনি, ডানায় উজ্জ্বল লাল রঙের ফুটকি। ইভলিন বলে ওরকম প্রজাপতি সে জীবনেও দেখেনি। একটা নমুনা সংগ্রহ করে দেয়ার জন্যে বাবার বন্ধুকে ধরে বসে সে।

মাস কয়েক পরে সান্দনি গাগায় ক্যাম্প করেছেন করবেট, জায়গাটা পোয়ালগড় থেকে মাইল তিনেক দূরে। চিতল হরিণদের যুদ্ধ দৃশ্য ক্যামেরা বন্দী করতে এসেছেন। ওই সময় সান্দনি গাগার সমভূমিতে যুদ্ধরত চিতলের দেখা পাওয়া দুর্লভ কিছু ছিল না। একদিন সকালে নাস্তা সেরে প্রজাপতি ধরার জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন করবেট। জালটা নিয়েছেন ইভলিনের জন্যে দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির সেই প্রজাপতি ধরে দেবেন। করবেটের তাঁবু থেকে শ'গজ দূরে একটি ফরেস্ট রোড কালাধুঙ্গিকে একত্রিত করেছে গোয়ালগড়ের সঙ্গে, রাস্তা ধরে মাইল খানেক এগোলে একটা খাত্ পড়ে। করবেটের আশা ওখানে ইভলিনের প্রজাপতির দেখা মিলবে।

ফরেস্ট রোড বা জঙ্গুলে রাস্তাটা মানুষজন কমই ব্যবহার করে। জঙ্গলের মাঝ দিয়ে চলে গেছে রাস্তাটা। এ এলাকায় শিকারের অভাব নেই কোন। শক্ত মাটির রাস্তায় ধুলোর পাতলা প্রলেপ। তাতে ফুটে আছে অসংখ্য প্রাণীর পায়ের ছাপ। প্রাণীগুলো রাতের বেলা এ রাস্তা ধরেই গেছে। রাস্তায় বা গেম পাথে অভ্যস্ত চোখে ট্র্যাক খোঁজার সময় প্রতিটি ছাপ দেখে ওটা কি ধরনের প্রাণী তা পরীক্ষা করার জন্যে থেমে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই। কারণ একবার চোখ বুলালেই অভিজ্ঞ শিকারী প্রাণীর আকার, গঠন, মুভমেন্ট ইত্যাদি সব কিছুই বুঝতে পারেন। তাঁর অবচেতন মনে এর একটা ছাপ আগেই থাকার কারণে ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে

হয় না। যেমন শজারুর পায়ের ছাপ দেখেই করবেট বুঝতে পেরেছেন ওটা রাস্তায় উঠে এসেছিল জঙ্গলে, রাস্তার ডান দিকে কোন কিছু দেখে ভয় পেয়ে। তারপর দ্রুত বেগে ছুটে পালিয়েছে। শজারুর ভয় পাবার কারণ হতে পারে কোন ভল্লুক, যেটা রাস্তায় উঠে পড়েছিল ডান দিক থেকে। তারপর চলে গেছে বামে। বামের জঙ্গলে ঢোকার পরে ভল্লুকটাকে দেখে ভীত হয়ে পড়ে একটা শুয়োর এবং ছোট এক দল চিতল। তারা রাস্তা পার হয়ে ডানদিকের জঙ্গলে ঢুকে যায়। খানিক এগিয়ে সম্বরের পায়ের ছাপ দেখতে পেলেন করবেট। ধারণা করলেন ওটা ডান দিক থেকে এসেছিল, ঝোপের পাতা-টাতা খানিক চিবিয়ে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেছে পঞ্চাশ গজের মত, শিঙ ঘষেছে একটা কচি চারাগাছের সাথে, তারপর ফিরে গেছে জঙ্গলে। এদিকে চার শিঙা একটা অ্যান্টিলোপ ছিল, সঙ্গে বাচ্চা, উঠে পড়েছিল রাস্তায়। ধুলোর ওপর বাচ্চাটির খুরের ছাপ দেখা যাচ্ছে। মানব শিশুর হাতের নখের চেয়ে বড় নয় ছাপগুলো। মাকে নিয়ে বাচ্চা লাফাতে লাফাতে এগোচ্ছিল রাস্তা ধরে, হঠাৎ কোন কারণে ভয় পেয়ে যায় মা, সন্তানকে নিয়ে বেগে ঢুকে পড়ে জঙ্গলে। মা আর বাচ্চার ভয় পাবার কারণও বের করে ফেললেন করবেট। রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সে মোড়ে ফুটে আছে হায়েনার পায়ের ছাপ। হায়েনাটা এ পর্যন্ত এসে আবার মোড় ঘুরে যেদিকে এসেছিল সেদিকে চলে গেছে।

রাস্তায় পায়ের ছাপ রহস্য উদ্‌ঘাটন আর পাখির গান শোনার জন্যে সান্দনি গাগার তুলনা হয় না। আশপাশে একশো মাইলের মধ্যে এরকম আর একটিও জায়গা নেই যেখানে বসে পাখির জগৎকে চেনা যাবে।

আধ মাইল খানেক এগোবার পরে করবেট এসে পৌঁছুলেন পাহাড়ের ধারে। এখানে রাস্তাটা বেশ চওড়া। পাহাড় কেটে এদিকের রাস্তা বানানো হয়েছে। সারফেস এত শক্ত যে স্বাভাবিক ট্র্যাকও খুঁজে বের করা মুশকিল। রাস্তা ধরে কিছুটা পথ হাঁটার পরে অস্বাভাবিক একটা চিহ্ন দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন করবেট। তিন ইঞ্চি লম্বা, দু'ইঞ্চি গভীর একটা গর্ত। লোহার শক্ত কিছু দিয়ে সম্ভবত গর্তটা খোঁড়া হয়েছে। কিন্তু করবেট যদ্দূর জানেন গত চব্বিশ ঘণ্টায় এ রাস্তা ধরে কোন মানুষ যায়নি। আর গর্তটার সৃষ্টি ঘণ্টা বারো আগে। তাছাড়া মানুষ এ গর্ত খুঁড়লে এটা সমান্তরাল হত, সমকোণী হত না। গর্ত থেকে ছিটকে পড়া মাটি দেখে মনে হয় যে এটা খুঁড়েছে সে ডান দিক থেকে বামে চলে গেছে।

গর্তটা মনুষ্য সৃষ্ট নয়, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে করবেট ভাবতে লাগলেন তা হলে ওটা চিতল কিংবা তরুণ সম্বরের শিঙের আঘাতে তৈরি হয়েছে। চোদ্দ ফুট চওড়া রাস্তাটার ডান দিকে দশ ফিট উঁচু, খাড়া তীর আর বাম দিকে নেমে গেছে খাড়া ঢাল। তো চিতল বা সম্বর ওটা যাই হোক, খাড়া তীর ধরে লাফিয়ে

পড়েছিল, তাল সামলাতে পারেনি, শক্ত খুর প্রচণ্ড জোরে আঘাত হেনেছে মাটিতে, সারফেস ভেঙে সৃষ্টি হয়েছে ট্র্যাক। তবে গর্তের আশপাশে কোন হরিণের পায়ের ছাপ নেই। করবেট উপসংহার টানলেন এই ধারণা করে—গর্তের সৃষ্টি মৃত হরিণের শিঙের আঘাতে। বাঘ মরা হরিণটাকে মুখে ঝুলিয়ে তীরে লাফিয়ে পড়েছিল, তখন শিঙের গুঁতো লেগে গর্তটা আকার পায়। রাস্তায় লাশ টেনে নিয়ে যাবার কোন চিহ্ন নেই। অবশ্য হত্যা করার পরে বাঘ এবং চিতাবাঘ দুটি প্রাণীই মুখে শিকার ঝুলিয়ে নিয়ে পথ চলার শক্তি রাখে। এ কাজটা তারা করে কোন ট্রেইল না রাখার জন্যে। কোন ট্রেইল বা চিহ্ন থাকলে ভল্লুক, হায়েনা কিংবা শেয়াল তাদের পিছু নিতে পারে।

ধারণাটা সঠিক কিনা দেখার জন্যে রাস্তা পার হলেন জিম করবেট। রাস্তার বাম দিকে, পাহাড়ের নিচে তাকালেন। হিঁচড়ে নিয়ে যাবার কোন চিহ্ন পড়ল না চোখে, তবে পাহাড়ের বিশ ফুট নিচে একটা ঝোপের পাতার ওপর কি যেন চকচক করে উঠতে দেখলেন করবেট ভোরের সূর্যের আলোতে। নিচে নেমে এলেন তিনি। চার ফুট লম্বা ঝোপটার পাতায় লেগে আছে বড়সড় রক্তের ফোঁটা, এখনও পুরোপুরি শুকোয়নি। এখান থেকে ট্র্যাকিং করা সহজ, আরও পঞ্চাশ গজ নামার পরে ঘন ঝাড় দিয়ে ঘেরা ছোট একটা গাছের নিচে শিকারটাকে দেখতে পেলেন করবেট। একটা চিতল হরিণ। চমৎকার একজোড়া শিঙ মাথায়। এ শিঙ ট্রফি হিসেবে পুরস্কার পেলে বর্তে যাবে যে কোন শিকারী। বাঘটা তার শিকারের নিতম্বের মাংস অনেকটাই সাবাড় করে ফেলেছে—তারপর পাখি বা অন্য কোন জানোয়ারের যাতে চোখে পড়ে না যায় শিকার সে জন্যে শুকনো পাতা আর খড়কুটো দিয়ে ঢেকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে লাশ। বাঘ এরকম কাণ্ড করলে বুঝতে হবে শিকারের ওপর নজর রাখার জন্যে আশপাশে শুয়ে নেই সে।

জিম করবেট তাঁর বন্ধু ফ্রেড অ্যান্ডারসন এবং হুয়িশ এডি'র কাছে শুনেছিলেন এদিকে নাকি বড় একটা বাঘ দেখা গেছে। মিসেস অ্যান্ডারসন ওটার নামও দিয়েছেন—পোয়ালগড়ের ব্যাচেলর। বিখ্যাত বাঘটাকে দেখার খায়েশ ছিল করবেটের। কারণ এ অঞ্চলের প্রায় সব শিকারীই বাঘটাকে হত্যার চেষ্টা করেছে।

শিকারের কাছে পিঠে অন্য কোন প্রাণীর পায়ের ছাপ না দেখে করবেট ধারণা করলেন চিতলটা ব্যাচেলরের হাতেই মারা পড়েছে। বাঘটাকে দেখার ইচ্ছেটা আবারও চাগিয়ে উঠল তাঁর। শুনেছেন প্রকাণ্ড জানোয়ার ওটা।

শিকারটা যেখানে পড়ে আছে, তার ধারে সরু একটা ফাঁকা জায়গা, একশো গজ দূরের ছোট একটা জলধারার সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। প্রবাহের পরে লেবুর ঘন ঝোপ। ব্যাচেলর তার আস্তানায় ফিরে না গেলে ওই ঝোপের আড়ালে তার শুয়ে থাকার সম্ভাবনা একশো ভাগ। করবেট সিদ্ধান্ত নিলেন বাঘটার জন্যে অপেক্ষা

করবেন। শিকারের কাছে ফিরে এলে দেখতে পাবেন জানোয়ারটাকে। তিনি উঠে এলেন রাস্তায়। প্রজাপতি ধরার সাদা জালটা ঢেকে দিলেন মরা পাতা দিয়ে। খোলা জায়গাটার উচ্চতর প্রান্ত প্রায় দশ ফিট চওড়া, আর যে গাছটার নিচে পড়ে আছে লাশ সেখান থেকে চত্বরটার ডান পাশের দূরত্ব একই সমান। বাম পাশটাতে, শিকারের প্রায় বিপরীত দিকে একটা মরা গাছের গুঁড়ি পড়ে রয়েছে মাথায় ঝাড়ের সামিয়ানা নিয়ে। গুঁড়ির গর্ত বা ফাটলে সাপ-টাপ নেই দেখে নিশ্চিত হয়ে ওটার পায়ের ধারের শুকনো পাতা পরিষ্কার করলেন করবেট কাঁকড়া বিছের ভয়ে—তারপর আরাম করে হেলান দিয়ে বসলেন গুঁড়ির গায়ে। এখান থেকে শিকারটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ত্রিশ হাত দূরে, জলধারাটাও দৃষ্টিসীমার মধ্যে, ওটার দূর প্রান্তে, একটা পিপল গাছ থেকে ফল ছিঁড়ে খাচ্ছে একদল লাল বানর।

প্রস্তুতি শেষ হবার পরে চিতাবাঘের গলায় ডেকে উঠলেন করবেট। চিতাবাঘ—সুযোগ পেলেই বাঘের শিকার চুরি করে খায়—আর সঙ্গত কারণেই ব্যাপারটা পছন্দ নয় বাঘের। বাঘটা যদি কাছে পিঠে থাকে, আর করবেটের চিতার ডাকের অনুকরণ নিখুঁত হয়, ওটা এখুনি চলে আসবে খোলা চত্বরে, বাঘটাকে ভাল করে দেখেই কেটে পড়বেন করবেট।

বানরের দল করবেটের ডাকে সাড়া দিল সতর্ক গলায় নিজেরা ডেকে উঠে। পিপল গাছের চল্লিশ ফুট উঁচুতে, মগডালে এসে বসল তিনটে বানর। বানরগুলো অবশ্য দেখতে পায়নি করবেটকে, মিনিটখানেক সতর্ক ভঙ্গিতে ডাকাডাকি করল ওরা। এই সতর্ক সংকেত বাঘের কানে পৌঁছলে নিশ্চিত হয়ে যাবে সে তার রাজ্যে শিকারের মাংস খাওয়ার লোভে অনুপ্রবেশ ঘটেছে চিতার। বানর তিনটের ওপর চোখ করবেটের, লক্ষ করলেন একটা হঠাৎ ঘুরে বসল, উঁকি দিয়ে দেখছে তার পেছনের বনভূমি, বেশ কয়েকবার ওপর-নিচ করল মাথা, তারপর ডেকে উঠল সতর্ক গলায়। মিনিট খানেক পরে বাকি দুটো অনুসরণ করল তার সঙ্গীকে, তারপর ওদের সঙ্গে যোগ দিল আরও অনেকগুলো বানর। সবাই ডাকছে একযোগে। করবেট বুঝে গেলেন আসছে বাঘ। আফসোস হলো তাঁর সঙ্গে ক্যামেরা আনেননি বলে। তাহলে বাঘ হেঁটে আসছে খোলা চত্বরে, জলধারা চিকমিক করছে সূর্য রশ্মিতে, ব্যাকগ্রাউন্ডে পিপল গাছের ওপর চেঁচামেচিতে ব্যস্ত বানরের দল—সব মিলে চমৎকার একটা ছবি নেয়া যেত।

এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যেমনটি ঘটে থাকে এবং করবেট যা আশা করেছিলেন বাঘ সেরকম কিছু করল না। দীর্ঘক্ষণ ওটার দেখা মিলল না, করবেটের ভারী অস্বস্তি হতে লাগল ভেবে বাঘ হয়তো তাঁর পেছন দিক থেকে এগোচ্ছে শিকারের দিকে। তিনি এক ঝলক শুধু দেখতে পেলেন জানোয়ারটাকে,

লাফ মেরে পার হলো জলপ্রবাহ, পরমুহূর্তে চত্বরের ডান হাতি ঘন বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জলধারার পেছনে, ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাঘটা হয়তো ভেবেছিল সে খোলা জায়গাটিতে চলে এলে চিতা তাকে দেখে ফেলবে। তাই সে শিকারের দিকে চোরের মত সন্তর্পণে এগিয়েছে, ভেবেছে চিতার দেখা পাবে।

মাটিতে শুকনো পাতার কার্পেট বিছানো। কিন্তু বাঘটা এত নিঃশব্দে এগিয়েছে যে ওটার হাঁটার শব্দ শুনতে পাননি করবেট। ওটাকে আবার দেখতে পেলেন তিনি। নিজের শিকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তবে এ ব্যাচেলর নয়, একটা বাঘিনী। গা শিরশির করে উঠল করবেটের। বাঘিনীদের মেজাজ-মর্জি বোঝা দায়। আর তিনি পশুটার শিকারের খুব কাছে বসে রয়েছেন। ওটার বাচ্চাকাচ্চা লেবু ঝোপের আড়ালে থাকতে পারে। আর সেক্ষেত্রে শিকারের এত কাছে করবেটের উপস্থিতি বাঘিনী মেনে নাও নিতে পারে। এখন বাঘিনী যে পথ দিয়ে এসেছে সেদিক দিয়ে চলে যায় তো ভাল··· কিন্তু তা করল না বাঘিনী। চিতা তার শিকার ছোঁয়নি দেখে সন্ত্রস্ট হলো ওটা, পা বাড়াল খোলা জমিনের দিকে। ফলে করবেটের সাথে বাঘিনীর দূরত্ব কমে গেল অনেকখানি। দীর্ঘ এক মিনিট সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল সে, দম বন্ধ করে, চোখ বুজে রইলেন করবেট পুরো সময়টা। তারপর চুল পরিমাণ চোখের পাতা ফাঁক করে দেখলেন শান্তভাবে খোলা চত্বরের দিকে হেঁটে যাচ্ছে বাঘিনী, জলধারার কাছে এসে গলা বাড়িয়ে দিল, পানি খেল, শেষে লাফ মেরে পার হলো ওটা, চলে গেল ঘন ঝোপের আড়ালে।

ফোঁস করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন জিম করবেট। গোয়েন্দাগিরি করতে এসে আজ অল্পের জন্যে জানে বেঁচে গেছেন বলে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানালেন বিধাতাকে। তারপর সিধে হলেন। পাতার আড়াল থেকে বের করে আনলেন প্রজাপতি ধরার জাল। বন্ধুর ছেলের জন্যে দুর্লভ প্রজাপতি সংগ্রহে যাবেন এবার।

---

## ক্যাডেট করবেট

দশে পা দেয়ার পরে জিম করবেটকে বলা হলো এবার তিনি নৈনিতাল ভলান্টিয়ার রাইফেলস-এ যোগ দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। ভারতে ওই সময় ভলান্টিয়ারিং খুবই জনপ্রিয় ছিল, ব্যাপারটিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিত সবাই। সুস্বাস্থ্যের কিশোর-যুবারা অত্যন্ত গর্ব ও আনন্দের সাথে দলে যোগ দিত। ক্যাডেট কোম্পানি ছিল চারটে, একটি অ্যাডাল্ট কোম্পানি। সব মিলে করবেটদের ব্যাটালিয়নে সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০০। নৈনিতালের ৬০০০ অধিবাসীর হিসেব ধরলে প্রতি বারো জনে একজন ছিল ভলান্টিয়ার।

জিম করবেটদের স্কুলে পড়াশোনা করত মোট সত্তরজন। স্কুলের প্রিন্সিপাল স্কুল ক্যাডেট কোম্পানির ক্যাপ্টেনও ছিলেন। পঞ্চাশটি ছেলে স্কুল ক্যাডেট কোম্পানিতে যোগ দেয়। ক্যাপ্টেন ছিলেন আর্মির প্রাক্তন অফিসার। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নিজের ক্যাডেট কোম্পানিকে ব্যাটালিয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। এ জন্যে ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে যে অত্যাচার সহ্য করতে হত তা তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই আনতেন না। হপ্তায় দু'দিন ড্রিল হত স্কুল মাঠে, আর একদিন অন্য চারটে কোম্পানির সাথে ড্রিল করতে হত নৈনিতাল লেকের শেষ মাথার খোলা জমিনে।

ভয়ানক কড়া ছিলেন করবেটদের ক্যাপ্টেন। কোন কিছুই তাঁর নজর এড়াত না। ড্রিল গ্রাউন্ডের ভুল ত্রুটির শোধ তুলতেন তিনি স্কুলে বসে। অভিযুক্ত ক্যাডেটের চার ফুট দূরে দাঁড়াতেন হাতে চার হাত লম্বা বেত নিয়ে। তারপর সপাং সপাং বাড়ি। করবেটদের ক্যাডেট কোম্পানিকে অন্য তিনটি কোম্পানি সেরা বলে মেনে নিতে না চাইলেও পিটুনি খাওয়ার ব্যাপারে করবেটদের কোম্পানির ক্যাডেটরা যে সেরা সে ব্যাপারে কারও দ্বিমত ছিল না। যখন অন্য কোম্পানিগুলো ড্রিল করতে ছুটছে, তখনও জিম করবেটদের ক্যাপ্টেন খুঁটিয়ে দেখছেন তাঁর ক্যাডেটদের নখের নিচে ময়লা জমে আছে কিনা কিংবা ইউনিফর্মে ধুলো আছে কিনা।

কড়া ইস্ত্রি দেয়া, গাঢ় নীল রঙের সার্জের ইউনিফর্ম পরতে হত করবেটদের। কাঁটার মত বিঁধত সেই ইউনিফর্ম গায়ে, ঘষা লেগে উঠে যেত চামড়া। আর সামান্য ধুলো লাগলেও দেখা যেত পরিষ্কার। ভীষণ গরম এবং অস্বস্তিকর ইউনিফর্ম তো পরতে হতই, গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মত মাথায় চাপাতে হত হেলমেট নামে এক ভয়ানক যন্ত্রণাকে। ভারী এই জিনিসটিতে

লাগানো থাকত চার ইঞ্চি লম্বা, খাঁজ কাটা ধাতব পেরেক। স্পাইক বা পেরেকের স্ক্রু ইঞ্চিখানেক ঢুকে থাকত হেলমেটের ভেতরে। মাংসের ভেতরে যাতে স্ক্রু ঢুকে না যায়, সে জন্যে স্ক্রুর মাথায় কাগজ পেঁচানো থাকত। হেলমেট চাপানোর পরে ওটা সাঁড়াশির মত আটকে থাকত মাথায়, আর চিবুকের নিচে লাগাতে হত শক্ত চামড়া বসানো ভারী ধাতব স্ট্র্যাপ। ভয়ানক ওজনদার এই জিনিস পরে তিন ঘণ্টা তপ্ত সূর্যের নিচে লেফট রাইট করার পরে এমন কোন ক্যাডেট ছিল না যার মাথা ব্যথায় ছিঁড়ে না যেতে চাইত। আর ড্রিল ক্লাসে বেতের বাড়ি তো ছিলই।

সিনিয়র পদের এক ভিজিটিং অফিসার ড্রিল পর্যবেক্ষণে আসতেন। টানা এক ঘণ্টা বন্দুক নিয়ে ড্রিল করার পরে করবেটদের যেতে হত লুকা তাল-এর রাইফেল রেঞ্জে। এখানে, পাহাড়ের ধারে ক্যাডেট কোম্পানিগুলো বসত আর অ্যাডাল্ট কোম্পানি বা প্রাপ্তবয়স্ক ক্যাডেটরা ভিজিটিং অফিসারকে ৪৫০ মার্টিনি রাইফেল দিয়ে লক্ষ্যভেদের দক্ষতা প্রমাণ করে দেখাত। ভারতের অন্যতম সেরা মার্কসম্যান ছিল এই ব্যাটালিয়নের সদস্যরা। টার্গেট ছিল লোহার ভারী একটি প্ল্যাটফর্ম। এক্সপার্টরা বুলেটের তৈরি রিং দেখে বলে দিতে পারত গুলি টার্গেটের মাঝখানে লেগেছে নাকি কিনারে।

প্রতিটি ক্যাডেট কোম্পানির একজন করে হিরো ছিল অ্যাডাল্ট কোম্পানিতে। আর কেউ কারও হিরোর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে কিছু বললেই বেধে যেত মারামারি। অবশ্য ইউনিফর্ম পরে মারামারিটাকে দোষের চোখে দেখত না কেউ। সেরা শটটি ঘোষণার পরে ক্যাডেটদের মার্চ করে যেতে হত রেঞ্জের সামনে। সাধারণত পাঁচশো থেকে আড়াইশো গজ রাস্তা মার্চ করতে হত তাদেরকে। এখানে, প্রতিটি কোম্পানি থেকে চার জন সিনিয়র ক্যাডেট বাছাই করা হত। জুনিয়াররা তাদের নির্দেশে অস্ত্র সাজিয়ে বসে থাকত ফায়ারিং পয়েন্টের পেছনে।

ইন্টার স্কুল প্রতিযোগিতা হত স্পোর্টসের অনুকরণে। রাইফেল রেঞ্জের সবার অসীম কৌতূহল থাকত চার কোম্পানির কে কি রকম গুলি ছোঁড়ে তার দিকে। গুলি ছোঁড়ার স্কোর প্রায় একই রকম হত চার কোম্পানির, সেরা শটগুলো নির্বাচন করতেন সম্মানিত কোম্পানি কমান্ডাররা। করবেটরা খুশিতে আটখানা হতেন যখন শুনতেন তারা মাত্র এক পয়েন্টের ব্যবধানে প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়েছেন।

করবেটরা যখন প্রতিযোগীদের সাম্প্রতিক সাফল্য আর ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনায় মশগুল, ঠিক সেই সময় সার্জেন্ট মেজরের আগমনে তাদের পিলে চমকে যেত। বাজখাঁই গলায় চেঁচাত সার্জেন্ট-মেজর। এক মাইল দূর থেকে

শোনা যেত গলা। 'করবেট! ক্যাডেট করবেট!' তার চিৎকার শুনে আত্মা উড়ে যেত কিশোর করবেটের। ওরে বাবা! ভাবতেন তিনি, কি দোষ করেছেন যে অমন ভাবে হাঁক পাড়ছে সার্জেন্ট। গলা শুনে মনে হত নির্ঘাত শাস্তি আছে করবেটের কপালে। অবশ্য দোষের মধ্যে যা হয়েছে, করবেট বলেছিলেন তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী দল যে এক পয়েন্টে এগিয়ে আছে, ওটা আসলে ঝড়ে বক মরার মত ঘটে গেছে। অপ্রত্যাশিতভাবে গুলি ভেদ করেছে টার্গেট। এ কথা শুনে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের একটি ছেলে নাকি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করেছিল জিমকে। জিম ছেলেটির চেহারাও দেখেননি। তাই দ্বন্দ্ব যুদ্ধও হয়নি। এতে কি করবেটের শাস্তি পাওনা হয়েছে? নইলে সার্জেন্ট মেজর অমন ঘেউ ঘেউ করছে কেন?

'করবেট! ক্যাডেট করবেট!' সার্জেন্টের চিৎকার শুনে অন্য ছেলেরা ঠেলতে শুরু করেছিল করবেটকে। 'এই যাও না। সার্জেন্ট তোমাকে ডাকছে! শিগ্‌গির যাও! নইলে তোমার কপালে দুঃখ আছে।'

চারপাশ থেকে ঠেলা ধাক্কা খেতে খেতে শেষে অত্যন্ত দুর্বল গলায় সাড়া দিতে বাধ্য হন করবেট, 'জ্বী, স্যার।'

আবার ঘেউ করে ওঠে সার্জেন্ট-মেজর। 'এতক্ষণ জবাব দাওনি কেন? তোমার কারবাইন কোথায়? নিয়ে এসো জলদি।' ধমকের তোড়ে করবেটের মাথার মধ্যে তখন তালগোল পাকিয়ে গেছে, যাবেন কি যাবেন না দোটানায় ভুগছেন, পেছন থেকে কে যেন ধাক্কা দেয়, 'আরে যাও না। বোকা কোথাকার!' করবেট অবশেষে দৌড় দেন কারবাইন নিয়ে আসতে।

যারা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করত না তাদের অস্ত্র স্তূপ করা থাকত। করবেটের কারবাইনটা ছিল স্তূপের নিচে। তিনি কারবাইন টেনে বের করতে যেতেই ভেঙে পড়ে স্তূপ, সমস্ত অস্ত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে একাকার। করবেট অস্ত্র সাজিয়ে রাখছেন, পেছন থেকে সার্জেন্ট-মেজরের হুঙ্কার, 'ওগুলো তোমাকে সাজাতে হবে না। তোমারটা নিয়ে চলে এসো।'

করবেট কারবাইন নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হতে না হতেই আবার নির্দেশ, 'শোল্ডার আর্মস, রাইট টার্ন, কুইক মার্চ।' তারপর আবার কারবাইন নিয়ে ছোটা ফায়ারিং পয়েন্টে।

করবেট ছিলেন ব্যাটালিয়নের কনিষ্ঠতম সদস্য। ভিজিটিং অফিসার এ কথা জেনে তাঁকে সবার আগে ফায়ার করতে বলতেন। ভিজিটিং অফিসারের মিষ্টি হাসি করবেটের সমস্ত ভয় আর আতঙ্ক দূর করে দিত। তাঁর মনে হত এতগুলো মানুষের মধ্যে শুধু ভিজিটিং অফিসারই বুঝতে পারেন তিনি কত একা।

৪৫০ মার্টিনি কারবাইন ক্যাডেটদের কাছে ছিল মূর্তিমান আতঙ্ক। অস্ত্রটা ছোঁড়ার সময় ভয়ানক ঝাঁকি লাগত কাঁধে, ঘষা লেগে ছালবাকল উঠে যেত।

আর সবার ছোট বলে ভারী অস্ত্রটা ছুঁড়তে খুব কষ্ট হত করবেটের। কিন্তু সার্জেন্ট-মেজরের ভয়ে সেই কাজটা তাঁকে করতেই হত। সেবারও পাঁচ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ পান তিনি। কারবাইনে গুলি ভরে কাঁধে অস্ত্রটা তুলে নেন জিম, লক্ষ্য স্থির করার চেষ্টা করেন। কিন্তু টেনশনের চোটে টার্গেটই দেখতে পাচ্ছিলেন না ঠিকমত। তাঁর অবস্থা বুঝতে পেরে এগিয়ে আসেন দয়ালু ভিজিটিং অফিসার। বলেন, 'ঠিক আছে, সার্জেন্ট-মেজর। আমি দেখছি।'

ধবধবে পোশাক পরা ভিজিটিং অফিসার এবার নির্দ্বিধায় বসে পড়েন তেল মাখা, নোংরা কম্বলের ওপর, করবেটের ঠিক পাশে। বলেন, 'দেখি তো তোমার কারবাইনটা।'

জিম কারবাইন তুলে দেন অফিসারের হাতে। তাঁর ভয়ডর হঠাৎ কোথায় চলে গেছে। অফিসার ব্যাকসাইট অ্যাডজাস্ট করে আবার ফেরত দেন জিমকে। জিম এবার শান্ত ভাবে টার্গেটে গুলি করতে থাকেন। চারটে গুলিই বিদ্ধ হয় যথাস্থানে। ভিজিটিং অফিসার জিমের পিঠ চাপড়ে উঠে দাঁড়ান, জানতে চান জিম কত স্কোর করেছে। জিম জানান দশ, এর মধ্যে প্রথমটি মিস করেছেন তিনি। শুনে অফিসার মন্তব্য করেন, 'চমৎকার শূটিং।' এরপর তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন অন্য অফিসারদের সাথে কথা বলতে। হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে বন্ধুদের কাছে ফিরে আসেন জিম। কিন্তু খানিক পরে তাঁর উৎসাহ উবে যায় নিরাশাব্যঞ্জক নানা মন্তব্য শুনে। ক্যাডেটরা বলতে থাকে, 'বাজে শট' 'কোম্পানির নাম ও ডুবিয়েছে' 'আমি চোখ বুজে ওর চেয়ে ভাল শট দিতে পারি' ইত্যাদি ইত্যাদি। সমবয়েসী ক্যাডেটরা এমনই। এদের অন্তর যেন পাষাণ দিয়ে তৈরি। কারও ভাল সহ্য করতে পারে না।

যে ভিজিটিং অফিসার সেদিন সুকাতাল রাইফেল রেঞ্জে ভাল ব্যবহার করে জিম করবেটের ভয় দূর করে দিয়েছিলেন, পরে তিনি পরিণত হয়েছিলেন জাতীয় বীরে। নাম তাঁর ফিল্ড মার্শাল আর্ল রবার্টস। জিম করবেট ওই ঘটনার পরে যখন দ্রুত গুলি করার সিদ্ধান্ত নিতেন, মনে পড়ে যেত ভিজিটিং অফিসারের নরম কণ্ঠ। করবেটকে উপদেশ দিয়েছিলেন তিনি, সব সময় ধীরেসুস্থে, টার্গেট ঠিক করে গুলি করা উচিত। ওই উপদেশ জীবনেও ভোলেননি করবেট।

যে সার্জেন্ট মেজর কঠোর হাতে, বছরের পর বছর কড়া শাসন চালিয়েছে নৈনিতাল ভলান্টিয়ারদের ওপর, তার মনটা ছিল কিন্তু বিরাট। ড্রিলের টার্ম শেষে সার্জেন্ট যেবার করবেটকে বলেছিল একটা রাইফেল পেলে করবেটের কেমন লাগবে, বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। জবাবে কিছুই বলতে পারছিলেন না তিনি। সার্জেন্ট মেজর বলে চলছিল, 'ছুটিতে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যেয়ো। আমি তোমাকে একটা সার্ভিস রাইফেল দেব। আর অ্যামুনিশন যা

লাগে তাও। তবে একটাই শর্ত—রাইফেলটা সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে।'

সেবার শীতে সার্জেন্ট-মেজরের দেয়া .৪৫০ রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে নাচতে নাচতে কালাধুঙ্গি ফিরে আসেন জিম করবেট চমৎকার একটি রাইফেলের মালিক হবার পরে জঙ্গল যেন আরও উন্মুক্ত হয়ে পড়ে করবেটের কাছে। যেখানে খুশি যাবার অবাধ প্রবেশাধিকার ঘটে তাঁর।

———

# চিতা শিকার

মাজল-লোডার পেয়ে জিম করবেট শিখেছিলেন কিভাবে অ্যামুনিশন পরিমিত ভাবে ব্যয় করতে হয়। আর সার্জেন্ট-মেজরের দেয়া রাইফেল পেয়ে বুঝলেন স্থির টার্গেটের ওপর প্র্যাকটিস অপব্যয় ছাড়া কিছু নয়। তাই প্র্যাকটিসের জন্যে বেছে নিলেন বন মোরগ এবং ময়ূর। সার্জেন্ট-মেজরের .৪৫০ রাইফেলের বিরাট গুণ, করবেট যেখানে লক্ষ্য স্থির করতে চান, বুলেট গিয়ে ঢোকে ঠিক সে জায়গায়। ফলে আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেল করবেটের। আগে জঙ্গলে যে সব জায়গায় যেতে ভয় পেতেন এখন সেখানে বুক ফুলিয়ে ঢুকে যান।

এ রকম একটি জায়গা হলো ফার্ম ইয়ার্ড। গাছের ঘন সারি আর ঝোপঝাড় নিয়ে বিশাল এক জঙ্গল। এ জঙ্গলে বন মোরগ আর বাঘ ভর্তি। আগে যখন গুলতি চালাতেন করবেট আর মাজ্‌ল লোডার নিয়ে ঘুরতেন, তখন তাঁর ঘোরাঘুরির সীমানা ছিল ফার্ম ইয়ার্ডের আশপাশ পর্যন্ত। ভেতরে ঢোকার সাহস পেতেন না। রাইফেল হাতে আসার পরে সাহস বেড়ে যায় তাঁর, ঢুকে পড়েন জঙ্গলে।

ফার্ম ইয়ার্ডের জঙ্গলে গভীর এবং খাড়া একটি খাদ আছে। এক সন্ধ্যায় গ্রামবাসীর জন্যে শিকারে বেরিয়েছেন করবেট, পাখি বা শুয়োর যা জোটে শিকার করে নিয়ে যাবেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন তাঁর ডান পাশের জঙ্গলে মরা পাতা আঁচড়াচ্ছে বন মোরগ। খাদের ধারে একটা পাথরে উঠে বসলেন করবেট, সাবধানে মুখ তুলে তাকাতেই দেখলেন বিশ/ত্রিশ গজ দূরে একটি বন মোরগ। ছুটে আসছে তাঁর দিকে। আরেকটা মোরগ ধাওয়া করেছে ওটাকে। দ্বিতীয় মোরগটা বেশ নাদুসনুদুস, গায়ে প্রচুর মাংস। শিকার হিসেবে দ্বিতীয় মোরগটাকে পছন্দ হলো করবেটের। ট্রিগারে আঙুল রেখে অপেক্ষা করছেন মোরগটা কখন গাছের ধারে আসবে। সলিড ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া করবেট কখনও পাখি শিকার করেন না। হঠাৎ বাম দিকে একটা শব্দ হলো, যেন খাদের বাম ধারে ভারী কিছু একটা লাফিয়ে পড়েছে। ওদিকে তাকালেন করবেট। দেখলেন একটা চিতা পাহাড় থেকে নামছে, সোজা এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। কোটা-কালাধুঙ্গি রোড বাঁক নিয়ে ফার্ম ইয়ার্ডের ভেতর দিয়ে চলে গেছে, মিশেছে পাহাড়ে। পাহাড়ী রাস্তাটা করবেটের কাছ থেকে দুশো গজ উঁচুতে। করবেট বুঝতে পারেন কোন কারণে চিতাটা ভয় পেয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটে এসেছে, আশ্রয়ের জন্যে এদিকে আসছে। বন-মোরগ দুটোও বাঘটাকে দেখেছে। তারা ডানা ঝটপটিয়ে ছুটে

পালাল। পাথর খণ্ডের ওপর ঘুরে বসলেন করবেট। মুখোমুখি হলেন চিতার। করবেটের আক্রমণাত্মক ভঙ্গি দেখে তাজ্জব বনে গেল চিতা, খাদের কিনারে এসে ব্রেক কষল।

খাদটা এখানে পনেরো ফুট চওড়া, বাম পাশের খাড়া ঢাল বারো ফুট উঁচু আর ডান দিকেরটা আট ফুট। ডান পাশের কিনারার দুই ফুট নিচে একটা পাথরের ওপর বসেছেন করবেট। চিতাটা তাঁর মাথার কাছ থেকে খানিক ওপরে। খাদের কিনারে এসে মাথা ঘুরিয়ে পেছন দিকটা দেখল চিতা। একটু আগে ওদিক থেকে এসেছে সে। এই ফাঁকে কাঁধে রাইফেল রেখে ওটাকে তাক করলেন শিকারী। যেই চিতা তার দিকে ফিরল সাথে সাথে বুক লক্ষ্য করে টিপে দিলেন ট্রিগার। কালো বারুদের কার্তুজ বিস্ফোরিত হয়ে ধোঁয়ার মেঘ সৃষ্টি করল করবেটের সামনে, অস্পষ্টভাবে শুধু একটা ঝিলিক দেখলেন। চিতাটা তাঁর মাথার ওপর দিয়ে লাফ দিল, ছিটকে পড়ে গেল পেছনে। পাথরে ছিটিয়ে পড়ল রক্ত, করবেটের জামা-কাপড়েও রক্তের ছিটা লাগল।

করবেট নিশ্চিত ছিলেন জায়গা মত বুলেট বিঁধিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু হতাশ হয়ে দেখলেন মারতে পারেননি তিনি চিতাটাকে, মারাত্মক আহত করেছেন শুধু। শঙ্কিত হলেন ভেবে জন্তুটাকে তক্ষুণি অনুসরণ না করলে ওটা কোন গুহা বা ঘন ঝোপে আত্মগোপন করতে পারে। তখন চিতাটাকে খুঁজে পাওয়া খুবই মুশকিল হবে। তাই করবেট রাইফেল আবার লোড করে নেমে পড়লেন খাদের ওপর থেকে, রক্তের দাগ দেখে অনুসরণ শুরু করলেন চিতাকে।

শ'খানেক গজ দূরে জঙ্গল প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে, অল্প ক'টা গাছ আর বিচ্ছিন্ন কিছু ঝোপঝাড় জায়গাটাতে। ওটার পরের জমিন ঢালের আকার নিয়ে ঝপ করে নেমে গেছে পঞ্চাশ গজ। তারপর আবার সমতল ভূমির আকার পেয়েছে। খাড়া ঢালের ধারে প্রচুর ঝোপ আর বড় বড় পাথর। ওগুলোর পেছনে চিতাটা সহজে আশ্রয় নিতে পারে, ধারণা করলেন করবেট। মাটিতে পায়ের ছাপ পরীক্ষা করতে করতে অত্যন্ত সাবধানে এগোলেন তিনি। ঢালের আধাআধি রাস্তা পার হয়েছেন, এমন সময় বিশ গজ দূরে, একটা পাথরের আড়ালে চিতাটার লেজ এবং পেছনের একখানা পা দেখতে পেলেন করবেট। চিতাটা মরে গেছে না বেঁচে আছে বুঝতে পারলেন না তিনি। তাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন নিজের জায়গায়। খানিক পরে নড়ে উঠল পেছনের পা-টা, অদৃশ্য হয়ে গেল পাথরের আড়ালে। শুধু লেজটা রইল আগের জায়গায়। তার মানে চিতাটা বেঁচে আছে। এখন ওটাকে গুলি করতে হলে করবেটকে ডানে বা বামে সরে আসতে হবে। করবেট আগেই ওটার গায়ে গুলি লাগিয়েছেন। এবার মাথায় মারবেন ঠিক করলেন। ইঞ্চি ইঞ্চি করে বাম দিকে সরে আসতে লাগলেন তিনি। অবশেষে ওটার মাথাটা নজরে

এল। পাথরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে চিতাটা, চেয়ে আছে অন্য দিকে। করবেট কোন শব্দ করেননি। কিন্তু চিতাটা কিভাবে যেন টের পেয়ে গেল তাঁর উপস্থিতি। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল করবেটের দিকে। সাথে সাথে গুলি খেল। কানের মধ্যে ঢুকে গেল বুলেট। মারা গেল চিতাটা। ওটার লেজ ধরে রক্তাক্ত পাথরের ওপর থেকে সরিয়ে আনলেন করবেট।

জীবনের প্রথম চিতা শিকার জিম করবেটের। অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল তাঁর। যখন চিতাটা ঢাল বেয়ে নেমে আসছিল তাঁর দিকে এবং গুলি করেছিলেন করবেট, ওই সময় একটুও হাত কাঁপেনি তাঁর। অথচ এ মুহূর্তে শুধু হাত নয়, গোটা শরীর কাঁপছে থরথর করে। ভয়ে। করবেটের মনে পড়েছে চিতাটার লাফ দেয়ার দৃশ্য। যদি ওটা তাঁর পেছনে না পড়ে মাথার ওপর এসে পড়ত? ভয়ের সাথে আনন্দও হচ্ছিল তাঁর। খবরটা গ্রামের লোকজন জানার পরে তাদের চোখে হিরো হয়ে উঠবেন ভেবে পুলক জাগছিল মনে। ইচ্ছে করছে নেচেকুঁদে, গান গেয়ে অস্থির হয়ে ওঠেন। কিন্তু কিছুই করলেন না। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উত্তেজনা, ভয় এবং আনন্দে কাঁপতে থাকলেন।

চিতার ওজন সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না জিম করবেটের। তবু ওটাকে বাড়ি বয়ে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। রাইফেল রেখে বউহিনিয়ার ঝাড়ের ধারে গেলেন। লতা ছিঁড়ে শক্ত রশি বানালেন। তারপর সামনের এবং পেছনের পা জোড়া বেঁধে ফেললেন রশি দিয়ে। চিতাটাকে কাঁধে তুলে নেয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু ভয়ানক ভারী। তোলা গেল না। চিতাটাকে রেখে যেতে হবে বুঝতে পারলেন করবেট। তাড়াতাড়ি কতগুলো ডাল ভেঙে চিতার শরীর ঢেকে দিলেন। তারপর এক দৌড়ে বাড়ি। তিন মাইল রাস্তা, উত্তেজনার চোটে কিভাবে পার হলেন টেরই পেলেন না। সোৎসাহে বাড়ির সবাইকে জানিয়ে দিলেন তিনি একটা চিতা বাঘ শিকার করেছেন। বোন ম্যাগী এবং দুই জোয়ান চাকর নিয়ে আবার ছুটলেন তিনি ফার্ম ইয়ার্ডের উদ্দেশে জীবনের প্রথম চিতা বাড়ি বয়ে নিয়ে আসার জন্যে।

চিতা শিকারের আগে মাজল লোডার দিয়ে বড় ধরনের প্রাণী মাত্র একটি শিকার করেছেন করবেট—একটা চিতল হরিণ। আর .৪৫০ রাইফেল দিয়ে শিকার করেছেন তিনটে শুয়োর এবং একটি কাকর। সবগুলোকেই বুকে গুলি মেরে ধরাশায়ী করেছেন। ভেবেছিলেন চিতার বুকেও গুলি করলে ওটা এক গুলিতেই অক্কা পাবে। এখানেই ভুল হয়েছিল তাঁর। ভুল থেকে শিক্ষা নেন চিতা বা এ জাতীয় হিংস্র প্রাণীর বুকে নয়, প্রথম সুযোগেই মাথায় গুলি করা উচিত। তাঁর বিরাট ভাগ্য সেদিন চিতাটা তাঁর গায়ে পড়েনি। বুকে গুলি করলে চিতা যে মরে না তা নয়। তবে সেটা কদাচিৎ ঘটে।

বুকে গুলি করে চিতা শিকারের আরেকটি ঘটনার কথা বলা যাক।

তখন শীতকাল। মঙ্গোলিয়া খাট্টায় ম্যাগীকে নিয়ে ক্যাম্প করেছেন জিম করবেট। মঙ্গোলিয়া খাট্টা একটি চারণভূমি। কালাধুঙ্গির জঙ্গলে ঘাসের অভাব দেখা দিলে এ এলাকায় গরু-বাছুর পাঠিয়ে দেয় গ্রামবাসী। এক সকালে নাস্তা করছেন করবেট এবং ম্যাগী, খবর পেলেন একটি চিতল হরিণ মারা পড়েছে চিতার কবলে পড়ে। মঙ্গোলিয়া খাট্টায় করবেট এসেছিলেন চিতা শিকার করতে। তাঁদের গ্রামের গরু-বাছুরের পালের ওপর হামলা করছিল জন্তুটা। চিতল মরার কথা শুনে তখুনি বেরিয়ে পড়লেন তিনি সঙ্গে .২৭৫ বোর রাইফেল নিয়ে।

হরিণের পালের ডাক শোনা যাচ্ছিল চারশো গজ দূরে, পশ্চিম দিক থেকে। ওদিকে পৌঁছুতে হলে ঘুরপথে যেতে হবে করবেটকে। কারণ সামনে একটি বাঁশঝাড় এবং জলা। করবেট ঘুরপথেই এগোলেন। গন্তব্যে পৌঁছে দেখলেন পোড়া জমিতে পঞ্চাশটি হরিণের একটি পাল চরে বেড়াচ্ছে। ওগুলো মাঝে মাঝে ফিরে চাইছে বাঁশঝাড়ের দিকে। বাঁশঝাড় এবং জলার মাঝখানে খোলা এক টুকরো ঘাসে ছাওয়া জমি, দুশো গজ চওড়া, করবেটের কাছ থেকে ষাট গজ দূরে। করবেট দেখলেন বড় একটা হরিণকে টানতে টানতে ঘাসের জমিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে একটা চিতা। সামনে এগোবার উপায় নেই করবেটের। তাহলে হরিণের পাল দেখে ফেলবে তাঁকে। ডেকে উঠলে সতর্ক হয়ে যাবে চিতা। কাজেই তিনি বসে পড়লেন রাইফেল তাক করে। অপেক্ষায় রইলেন সুযোগ পেলেই গুলি চালাবেন।

হরিণটা বিশাল আকারের বলে ওটাকে শক্ত মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিতে বেশ পরিশ্রম হচ্ছিল চিতার। এক সময় ওটাকে ছেড়ে দিল বাঘ, সিধে হলো। দাঁড়াল করবেটের দিকে মুখ করে। চিতার কালো ফুটকিঅলা সাদা বুক ষাট গজ দূর থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন করবেট। চমৎকার টার্গেট। বুক লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপে দিলেন তিনি।

শূন্যে লাফিয়ে উঠল চিতা, পরক্ষণে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল মাটিতে, চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল ঘাস-জমিতে। চিতাটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সে-জায়গায় এসে দাঁড়ালেন করবেট। রক্তের দাগ চলে গেছে কোমর সমান উঁচু ঘাসের আড়ালে। শকুনের হাত থেকে রক্ষা করতে হরিণটাকে ডালপালা দিয়ে ঢেকে দিলেন করবেট। গ্রামের লোকেরা হরিণটাকে পেলে খুশি হবে। মখমলের মত চামড়া ওটার। ক্যাম্পে ফিরে এলেন করবেট। ধীরে সুস্থে আধখাওয়া নাস্তা সারলেন। তারপর চার মজুরকে নিয়ে চললেন মরা হরিণ উদ্ধার এবং আহত চিতার সন্ধানে। যেখান থেকে গুলি করেছিলেন করবেট, ওখানে আসতে এক মজুর তাঁর কাঁধ চেপে ধরে ডান দিকে তাকাতে ইশারা করল। ওদিকে পোড়া জমি

শেষ হয়ে ঘাস-জমি শুরু। একটু পরে করবেট বুঝতে পারলেন লোকটা কি দেখাতে চেয়েছে তাঁকে। আরেকটা চিতা বাঘ। আড়াইশো গজ দূরে, ঘাসের চাপড়ার ধারে শুয়ে আছে।

ক্যাম্পে করবেটের সাথে যে ক'জন মজুর ছিল এরা বাঘ শিকারে গেলে সাধারণত মজুরি নিতে চায় না। তবে এরা যদি করবেটের আগে শিকার দেখে ফেলে তখন করবেট বকশিশ হিসেবে কিছু দিলে খুশি হয়। এবার দুই মজুর দাবি করে বসল তারা আগে চিতাটাকে দেখেছে। তাদেরকে সমান বকশিশ দিয়ে চুপ করে থাকতে বললেন করবেট। কারণ বাঘটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে, আসছে করবেটদের দিকে। করবেট বুঝতে পারলেন যে চিতাটিকে তিনি গুলি করেছেন এটা তার সঙ্গী। দেখতে এসেছে তার সঙ্গী কি শিকার করেছে। করবেটদের কাছ থেকে একশো গজ দূরে, খোলা জমিনে দাঁড়িয়ে পড়ল ওটা। দেখছে মরা হরিণটাকে। অনেকক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইল চিতাটা। ইচ্ছে করলেই ওটার বুকে গুলি করা যায়। খানিক আগে আরেকটা চিতাকে আহত করেছেন করবেট। এটাকে তাই আর বুকে গুলি করলেন না।

চিতাটা সন্দেহ নিয়ে দেখছে ডালপালা দিয়ে ঢাকা হরিণটাকে। চারদিকে সতর্ক ভঙ্গিতে নজর বোলাল একবার, তারপর শিকারের দিকে পা বাড়াল। ঠিক তখন গুলি করলেন করবেট। বাম কাঁধের ইঞ্চি দুয়েক নিচে সেঁধিয়ে গেল বুলেট। পড়ে গেল চিতাটা। আর উঠল না। করবেট গিয়ে দেখলেন মারা গেছে জানোয়ারটা। মজুরদের ডাকলেন তিনি। বললেন চিতাটাকে বাঁশে ঝুলিয়ে গ্রামে রওনা হয়ে যেতে। নিজে অস্বস্তি নিয়ে ঢুকে পড়লেন কোমর সমান লম্বা ঘাসের জঙ্গলে, আহত চিতার সন্ধানে।

শিকারীদের অলিখিত নীতি হলো যে ভাবেই হোক আহত পশুকে, বিশেষ করে সে যদি হয় মাংসাশী, তাকে হত্যা করতে হবে। অনেকে আহত পশুর খোঁজে জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দেয়। এমন নিষ্ঠুরতা পছন্দ নয় করবেটের। এতে তেমন লাভ আছে বলেও মনে করেন না তিনি। জঙ্গলে আগুন লাগালে, আহত পশুটা যদি নড়াচড়া করতে সক্ষম হয়, তাহলে ওটার মৃত্যু কটা দিন বিলম্বিত হয় মাত্র অন্য কোথাও সরে যাবার কারণে। কিন্তু মারাত্মক আহত হলে জানোয়ারটাকে পুড়ে রোস্ট হতে হয়।

লম্বা ঘাসের জঙ্গলে মাংসাশী প্রাণীর খোঁজে বেরুনো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। বিশেষ করে সে যদি আহত হয়ে পড়ে। সামান্য শব্দ হলেও প্রাণীটি হয় হামলা করে বসবে নয়তো নিজের অবস্থান থেকে সরে গিয়ে ধন্ধে ফেলে দেবে শিকারীকে। করবেট রক্তের দাগ দেখে সাবধানে পা ফেলছেন। তাঁর রাইফেল লোড করা। এটুকু যা স্বস্তি করবেটের।

আহত বাঘটাকেও খুঁজে বের করলেন তিনি। মরে পড়ে আছে।

চিতাটা কেন হরিণ শিকারে এসেছিল উপলব্ধি করার পরে মনটাই খারাপ হয়ে গেল তাঁর। মা চিতা বাচ্চাদের খাবার জোগাড় করতে না পেরে হরিণ শিকারে এসেছিল। কিন্তু নিজেই শিকার হয়ে গেছে।

গুলি ভরা রাইফেল ছাড়া জঙ্গলে পথ চলা আর জানটা বেঘোরে খোয়ানো একই কথা। রাইফেলে সবসময় গুলি ভরা থাকে বলে বহুবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছেন করবেট।

তরুণ বয়সে একবার তাঁর দুই বন্ধু এসেছিল কালাধুঙ্গিতে করবেটের আমন্ত্রণে। সিলভার এবং ম্যান নামের ওই দুই তরুণের ওটাই প্রথম ভারত আগমন। কেউই জীবনেও জঙ্গলে শিকার করেনি। তারা আসার পরের দিন সকালে দু'জনকে নিয়ে চিতা শিকারে বেরিয়ে পড়েন করবেট। তখন তিনি মোকাম ঘাটে কাজ করছেন। মোকাম ঘাট থেকে মাইল দুয়েক দূরে হলদোয়ানি রোডের পাশের জঙ্গলে চিতা একটি চিতল হরিণ শিকার করেছে শুনেছেন করবেট। তাই দুই বন্ধুকে নিয়ে চিতা শিকারে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি। সিলভারের হাতে ধার করা .৫০০ ডি.বি রাইফেল। ম্যানের কাছে .৪০০ এস.বি ব্ল্যাক পাউডার রাইফেল। এটাও ধার করা। আর করবেট সঙ্গে নিয়েছেন .২৭৫ বোরের রাইফেল। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখলেন মৃত্যু যন্ত্রণায় তখনও কাতরাচ্ছে হরিণটা। সিলভার এবং ম্যানকে একটা গাছে বসিয়ে দিয়ে চিতা বাঘের দিকে পা বাড়ালেন করবেট। চিতাটা ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে হামলা চালাচ্ছিল হরিণের ওপর। করবেট হাঁকডাক করে ওটাকে তাড়ালেন। ওদিকে গাছে বসে থাকতে খুবই অস্বস্তি লাগছিল সিলভারের। সে কোনদিন গাছে ওঠেনি। করবেট সোৎসাহে তাকে জানালেন চিতাটা বেশ বড় আকারের, পুরুষ। তবে খবরটা শুনে সিলভার তেমন উৎসাহ পেয়েছে বলে মনে হলো না। তাকে হুঁশিয়ার করে দিলেন করবেট যেন সাবধানে গুলি চালায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছেন বলে ম্যানকে নিয়ে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

চিতল হরিণটা যেখানে পড়ে আছে তার থেকে শ'খানেক গজ দূরে একটা ফায়ার ট্র্যাক। ডান দিকে কোণাকুণি ভাবে মিশেছে হলদোয়ানি রোডের সাথে। এই ট্র্যাক ধরে তার সঙ্গীকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকলেন করবেট। হঠাৎ সিলভারের বন্দুক গর্জে ওঠার শব্দ শুনলেন। পরপর দু'বার। করবেট ম্যানকে নিয়ে ফিরে আসছেন, চিতাটাকে দেখতে পেলেন ট্র্যাকের মধ্যে লাফ মেরে চলে যাচ্ছে। সিলভার জানাল সে বলতে পারবে না চিতার গায়ে গুলি লেগেছে কিনা। কিন্তু ম্যানকে নিয়ে স্পটে গিয়ে করবেট রক্তের চিহ্ন দেখতে পেলেন। সঙ্গীদের বললেন ট্র্যাকে অপেক্ষা করতে। তিনি একাই চিতার খোঁজে বেরুবেন। এর মধ্যে বীরত্বের

কিছু ছিল না। আহত, মাংসাশী প্রাণীকে অনুসরণ করতে হয় একা। সমস্ত মনোযোগ তখন ওদিকে দিতে হয়। গুলি ভরা রাইফেল হাতে সঙ্গী পাশে থাকলে মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিছুদূর না যেতেই দৌড়ে এল সিলভার, বলল তাকে সঙ্গে নিতে। কিন্তু রাজি হলেন না করবেট। করবেট নমনীয় হবেন না বুঝতে পেরে সিলভার অনুরোধ করল তাহলে অন্তত তার রাইফেলটা যেন নিয়ে যান করবেট। কারণ করবেটের রাইফেলটা হালকা। হালকা রাইফেল দিয়ে করবেট প্রয়োজনের সময় হয়তো আত্মরক্ষা করতে পারবেন না। বন্ধুর কিছু হলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না সিলভার। তাকে খুশি করতে তার রাইফেলটা নিলেন করবেট। নিজেরটা দিয়ে দিলেন সিলভারকে। সিলভার ফায়ার ট্র্যাকে ফিরে যেতে যাত্রা শুরু করলেন করবেট। তার আগে ব্রিচ খুলে দেখলেন চেম্বারে দুটো কার্তুজ পোরা আছে।

একশো গজ জমিন স্রেফ খোলা, তারপর রক্তের দাগ চলে গেছে জঙ্গলের মধ্যে। জঙ্গলের দিকে পা বাড়িয়েছেন করবেট, এমন সময় টের পেয়ে গেলেন চিতার উপস্থিতি। ওটা আসছে তাঁর দিকে। এক সেকেন্ডের জন্যে মনে হলো বাঘটা তাঁকে হামলা করবে। এরপর আর ওটার সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। সাবধানে ঢুকে পড়লেন তিনি জঙ্গলে। বিশ গজ এগোবার পরে জন্তুটার চিহ্ন চোখে পড়ল তাঁর। একটু আগেও এখানে শুয়ে ছিল। উঠে যাবার সময় ওটার নড়াচড়া টের পেয়েছেন। এবার পা টিপে টিপে এগোতে শুরু করলেন করবেট। দেড়শো গজ যাবার পরে ট্রেইলটা শেষ হয়ে গেল খোলা একটা মাঠে। মাঠ ধরে দ্রুত চলতে লাগলেন। শ'গজ যাবার পরে বিরাট একটা হালদু গাছ চোখে পড়ল। ওটার নিচে, ডান দিকে বাঘটাকে দেখতে পেলেন শিকারী। লেজ বেরিয়ে আছে। চিতাটা নিশ্চয়ই টের পেয়েছিল তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। সে তাই শিকারীকে টেনে এনেছে এমন এক জায়গায় যেখান থেকে সহজে হামলা করা যাবে। ওটা যে হামলা করতে যাচ্ছে সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই করবেটের।

হালদু গাছের বাম দিকে চলে এলেন করবেট। এবার চিতাটাকে পরিষ্কার দেখা গেল। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, থাবার ওপর থুতনি রেখে চেয়ে রয়েছে করবেটের দিকে। ওটার কানের ডগা এবং গোঁফ কাঁপছে তিরতির করে। গাছের ধারে আসার সময় বাঘটা সহজেই লাফিয়ে পড়তে পারত করবেটের গায়ে। কিন্তু তা করেনি দেখে তিনি রাইফেল প্রস্তুত করলেন। মাথায় নয়, শরীরে গুলি করবেন। মাথায় পরে গুলি করবে সিলভার। ট্রফি জেতার আনন্দ থেকে তাকে বঞ্চিত করতে চান না করবেট। স্থির দৃষ্টিতে চিতার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন শিকারী, আপনাআপনি বুজে এল ওটার চোখ। করবেট বুঝতে পারলেন মারা গেছে জানোয়ারটা। তিনি যখন ওটার দিকে চেয়েছিলেন তখনই পটল তুলেছে।

নিশ্চিত হবার জন্যে কাশি দিলেন জোরে। কোন সাড়া এল না ওই তরফ থেকে। একটা নুড়ি তুলে ছুঁড়ে মারলেন মাথায়। স্থির হয়ে রইল চিতা।

সিলভার এবং ম্যান চলে এল করবেটের ডাক শুনে। সিলভারের রাইফেল তাকে ফেরত দেয়ার আগে ব্রিচ খুলে পেতলের কার্তুজ জোড়া বের করে নিলেন করবেট। আতঙ্কিত হয়ে দেখলেন দুটো কার্তুজই খালি। খালি রাইফেল চালাতে গিয়ে বহু শিকারীকে তার পরিণাম ভোগ করতে হয়েছে। আজ যদি রক্তের দাগ অনুসরণ করার সময় ধীরে সুস্থে না এগোতেন করবেট তাহলে তাঁকেও করুণ পরিণতির শিকার হতে হত। ভাগ্য গুণে বেঁচে গেছেন। প্রতিজ্ঞা করলেন আর কোনদিন গুলি ভরা রাইফেল ছাড়া শিকারে বেরুবেন না। তারপর থেকে যখনই জঙ্গলে গেছেন করবেট, বন্দুক পরীক্ষা করে দেখেছেন ভাল করে। ডাবল ব্যারেল রাইফেল হলে কার্তুজ এক চেম্বার থেকে অন্য চেম্বারে ভরেছেন, আর এক ব্যারেলের রাইফেলের কার্তুজ বের করে পরীক্ষা করেছেন বোল্ট ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা। তারপর চেম্বারে কার্তুজ ঢুকিয়েছেন।

---

# দাবানল

কুনওয়ার সিং ভারতের এক সাহসী শিকারীর নাম। এই মানুষটির কাছ থেকে জিম করবেট শিকারের অনেক কিছু শিখেছেন। অজানা বেশ কিছু বিষয়ে করবেটের ভয় ছিল। সে সব ভয় দূর করে দিয়েছে কুনওয়ার সিং। এরমধ্যে একটি হলো দাবানল বা জঙ্গলের আগুন। জঙ্গলে আগুন লাগার সত্য মিথ্যা নানা রোমহর্ষক গল্প শুনে করবেটের মনে ভয় ধরে গিয়েছিল কবে না জানি তিনি দাবানলের কবলে পড়ে জ্যান্ত রোস্ট হয়ে যান। কুনওয়ার সিং তাঁর মন থেকে এই ভয়টা দূর করেছে।

কুমায়ূনের পাহাড়ের পাদদেশের গ্রামগুলোতে লোকজন সব সময় মুখিয়ে থাকে তাদের প্রতিবেশীদের খবর শোনার জন্যে। এ সব গ্রামের মানুষ কোনদিন খবরের কাগজ চোখেও দেখেনি। আশপাশের গ্রামে মজাদার কোন ঘটনা ঘটলে তা শোনার জন্যে সবাই হাঁ করে থাকে। তাই ফার্ম ইয়ার্ডে জিম করবেটের চিতাবাঘ শিকারের গল্প বিদ্যুৎ গতিতে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা খুবই স্বাভাবিক ছিল। আরও স্বাভাবিক ছিল খবর শোনা মাত্র কুনওয়ার সিং-এর জিম করবেটের কাছে যাওয়া এবং তাঁকে অভিনন্দিত করা। কুনওয়ার সিং-এর জানা ছিল করবেটকে সার্জেন্ট-মেজর একটি রাইফেল ধার দিয়েছেন। তবে ওটা যে করবেট সত্যি কাজে লাগাতে পারবেন তেমন ভরসা সিংজীর ছিল না। কাজেই চিতাবাঘ শিকারের কথা শুনে দৌড়ে এসেছিল কুনওয়ার সিং। করবেট এবং রাইফেলের অনেক প্রশংসা করল সে। যাবার আগে পইপই করে বলে গেল পরদিন সকাল পাঁচটার মধ্যে যেন করবেট গুরুপ্পু রোডের চার নম্বর মাইলস্টোনের ধারে হাজির থাকেন। শিকারে যাবেন তাঁরা।

পরদিন খুব ভোরে, তখনও পিচ কালো অন্ধকারে ডুবে আছে প্রকৃতি, ম্যাগীর হাতের এক কাপ চা খেয়ে করবেট রওনা হয়ে গেলেন কুনওয়ার সিং-এর সাথে দেখা করতে। নির্জন ওই জঙ্গুলে রাস্তায় একাকী বহুবার হেঁটেছেন করবেট। তাই অন্ধকারে আজকেও হেঁটে যেতে ভয় করল না তাঁর। চার নম্বর মাইলস্টোনের কাছাকাছি আসতে দেখলেন রাস্তার পাশে, একটা গাছের নিচে আগুন জ্বলছে। কুনওয়ার সিং করবেটকে দেখে এগিয়ে এল। বসাল অগ্নিকুণ্ডের পাশে। আগুনের তাপে হাত শেঁকছেন করবেট, কুনওয়ার সিং বলে উঠল, 'দ্যাখো ছেলের কাণ্ড! তাড়াহুড়োর চোটে প্যান্ট পরতেই ভুলে গেছ।'

কুনওয়ার সিংকে অনেক কষ্টে বোঝাতে সক্ষম হলেন জিম যে তিনি ন্যাংটো নন, যে জিনিসটি পরে আছেন তাকে বলে শর্টস। কুনওয়ার সিং বেজার মুখে বলল জঙ্গলে এ ধরনের জাঙ্গিয়া পরে আসা মোটেই উচিত হয়নি করবেটের। গ্রামের মানুষ যদি এ মুহূর্তে তাকে করবেটের সাথে দেখে ফেলে তাহলে সবাই ছিঃ ছিঃ করবে। অবশ্য কুনওয়ার সিংকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কারণ সে এই প্রথম শর্টস নামের বস্তুটি দেখেছে। আর নিম্নাঙ্গ প্রায় উন্মুক্ত হয়ে থাকা পোশাকটি আব্রু ঢাকতে সক্ষম নয় বলে বিরক্ত হয়েছে সে।

হাঁড়িপানা মুখ করে রাখল কুনওয়ার সিং। অনেকক্ষণ একটি কথাও বলল না কেউ। তবে থমথমে পরিবেশটা তরল করে দিল বনমোরগের ডাক। কাছের এক গাছের আড়াল থেকে ডাকতে শুরু করল বনমোরগ। ডাক শুনে লাফ মেরে সিধে হলো কুনওয়ার সিং। চট করে নিভিয়ে দিল আগুন। বলল এবার যাত্রার সময় হয়েছে।

রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন দু'জনে। জঙ্গল তখন জেগে উঠতে শুরু করেছে। বনমোরগের ডাক ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে অন্যান্য পাখিদের। ছোট-বড় সব রকমের পাখি বিচিত্র স্বরে কোরাস শুরু করে দিল। সবার গলা ছাড়িয়ে সবচে' তীক্ষ্ণ শোনাল ময়ূরের ডাক। সামাল গাছের মগডালে বসে জানান দিল রাত বিদায় নিয়েছে। এসেছে নতুন দিন।

শুধু পাখি নয়, জেগে উঠল পশুরাও। করবেটদের সামনে দিয়ে দৌড়ে চলে গেল চিতল হরিণের ছোট একটা পাল। দুশো গজ দূরে, রাস্তার ধারে একটি সম্বর হরিণী মা ও তার বাচ্চাকে দেখা গেল ঘাস খাচ্ছে। পুব দিক থেকে ভেসে এল বাঘের গর্জন। আত্মা কাঁপিয়ে দিল ময়ূরদের। চিৎকার করে উঠল তারা। করবেটরা যখন গারুপ্পু পৌঁছুলেন ততক্ষণে সূর্য রশ্মি ছুঁই ছুঁই করছে গাছের মাথা। কাঠের একটা সেতু পার হয়ে ফুটপাথে নেমে পড়লেন। রাস্তাটা চলে গেছে সরু একটা জঙ্গলের মাঝ দিয়ে। জঙ্গলের পাশে শুকনো একটা খাল। এখন খালে পানি নেই। তবে বর্ষার সময় এটাই ফুলেফেঁপে নদী হয়ে ওঠে। এই খালে সব ধরনের প্রাণী আসে পানি খেতে। একটা সময় খালটা শিকারের জন্যে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিল করবেটের।

খালের পাড় ধরে আধা মাইলটাক হাঁটার পরে দুই শিকারী চলে এলেন সিকি মাইল চওড়া এবং কয়েক মাইল লম্বা নাল ঘাসের ঝোপের ধারে। নাল ঘাসের ভেতরটা ফাঁপা, বাঁশের মত গিঁঠ গায়ে, একেকটা চোদ্দ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। গ্রামবাসী কুঁড়েঘর তৈরিতে নাল ঘাস ব্যবহার করে। স্যাঁতসেঁতে এলাকায় জন্মায় বলে নাল ঘাস সারা বছর সবুজ থাকে। মাঝে মাঝে খরার সময় নাল ঘাসে আগুন ধরে যায়। তখন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঘাসগুলোর গিঁঠ বা

জয়েন্ট একেকটা অন্যের সাথে জড়িয়ে থাকে, তীব্র উত্তাপে জয়েন্ট ছুটে যাবার সময় পিস্তলের গুলির আওয়াজ তোলে। আর লক্ষ লক্ষ ঘাসের গিঁঠ যখন আগুনের তাপে বিস্ফোরিত হতে শুরু করে, সেই গগনবিদারী আওয়াজ কয়েক মাইল দূর থেকেও শোনা যায়।

কুনওয়ার সিং-এর সাথে খালের তীর ধরে হেঁটে যাচ্ছেন জিম করবেট, হঠাৎ দেখতে পেলেন আকাশে কালো ধোঁয়ার মেঘ জমছে। একটু পরেই দূর থেকে ভেসে এল শোঁ শোঁ গর্জন। দূরে কোথাও আগুন লেগেছে বুঝতে পারলেন তিনি। খালটা মোড় নিয়ে চলে গেছে দক্ষিণ দিকে। আর আগুনটা জোরাল বাতাস নিয়ে ধেয়ে আসছে পুব বা বাম দিকের তীর ঘেঁষে। আগে আগে চলছিল কুনওয়ার সিং। সে ঘাড় ঘুরিয়ে জানাল দশ বছর পরে আবার নাল ঘাসের রাজ্যে আগুন লেগেছে। সে হন হন করে হাঁটতেই লাগল। ভীত করবেট বাধ্য হলেন তার পিছু নিতে। কিছুদূর এগোবার পরে মোড় নিতেই দেখা গেল আগুন। খাল থেকে একশো গজ দূরে দাউ দাউ জ্বলছে।

আগুনের প্রকাণ্ড চাদর কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশে। ওগুলোকে গ্রাস করেছে কালো ধোঁয়ার মেঘ। ধোঁয়ার পাশে উড়ছে শত শত স্টার্লিং, মিনা, রোলার এবং ফিঙ্গের ঝাঁক। গরম উত্তাপ সইতে না পেরে হাজার হাজার পোকা উঠে পড়েছে শূন্যে। সেগুলোকে মনের সুখে টপাটপ মুখে পুরে চলেছে পাখির দল। যে সব পোকা প্রাণ বাঁচাতে লাফিয়ে পড়ছে খালের বালুময় তীরে, তারাও রক্ষা পাচ্ছে না। ওখানে মহা ভোজের লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে হাজির হয়ে গেছে ময়ূর, বনমোরগ আর কালো প্যাট্রিজ। মাটিতে পড়া মাত্র টপ করে মুখে পুরে নিচ্ছে পোকাদের। ঝড়ো বাতাসে প্রকাণ্ড এক সামাল গাছ থেকে বড় বড়, মাংসল লাল ফুল ঝরে পড়ছিল। সেগুলো দিয়ে ভোজ লাগিয়ে দিয়েছে গোটা বিশেক চিতল হরিণ।

জঙ্গলে ওই প্রথম দাবানল দেখার অভিজ্ঞতা জিম করবেটের। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ঝেড়ে দৌড় দেয়ার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে সামাল দিয়েছেন কুনওয়ার সিং তাঁকে কাপুরুষ ভেবে বসবে বলে। তবে লক্ষ করলেন তিনি ছাড়া আর কেউ জঙ্গলের আগুন ভয় পাচ্ছে না। আগুনের মাত্রা ক্রমে বেড়ে চলছিল। তীব্র গর্জনের সাথে কালো ধোঁয়ার মেঘগুলোও ছড়িয়ে পড়ছিল মাথার ওপরে। নাল ঘাসের ঝোপ থেকে কখন শিকার করার মত প্রাণী বেরিয়ে আসবে তার অপেক্ষা করছিল কুনওয়ার সিং। একটা সময় করবেট লক্ষ করলেন তাঁর আর ভয় লাগছে না। আগুনের তাপ লাগছে গায়ে অথচ জ্যান্ত পুড়ে রোস্ট হবার ভয়টা হঠাৎ করেই চলে গেছে করবেটের। হরিণ, বনমোরগ, প্যাট্রিজ আর ময়ূরের ঝাঁক খালের ডান পাড় ধরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে জঙ্গলে। শিকারের আশা

ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ল কুনওয়ার সিং। করবেটকে নিয়ে পা বাড়াল গারুপ্পুর পথে। বাড়ি ফিরবে।

দাবানল সংক্রান্ত অনেক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছে জিম করবেটের। তিনি লক্ষ করেছেন বেশিরভাগ দাবানলের সৃষ্টি মানুষের হাতে। তবে সেটা ইচ্ছে করে নয়, প্রয়োজনে। হিমালয়ের পাদদেশে সরকারী অনুমতি নিয়ে যারা ফসল ফলায় তারা মাঝে মাঝে অরক্ষিত বনভূমির ঘাস পুড়িয়ে ফেলে গরু-বাছুর চরানোর জন্যে। এসব জঙ্গলে নানা জাতের ঘাস জন্মায়। সব ঘাস একই সময় শুকিয়ে যায় না। তখন ঘাস পোড়ানো শুরু হয়। সাধারণত ফেব্রুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এ কাজ চলে। এ সময়ে ঘাস জমিতে প্রায়ই আগুন জ্বলতে দেখা যায়।

এক সকালে ব্ল্যাক প্যান্থ্রিজ শিকার করে গাঁয়ের চৌকিদার বাহাদুরকে নিয়ে কালাধুঙ্গিতে ফিরছিলেন জিম করবেট।

বাহাদুর তাঁর পুরানো বন্ধু। গ্রামে ত্রিশ বছর ধরে চৌকিদারি করছে। গাঁয়ের সবাই তাকে মানে, সম্মান করে। করবেট হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ করছিলেন ওই এলাকার বেশিরভাগ ঘাস জমি পুড়ে ছাই হয়ে আছে। কোথাও কোথাও অক্ষত ঘাসের চাপড়াও চোখে পড়ল, আগুনের লেলিহান শিখা ছুঁতে পারেনি। এরকম একটি চাপড়ার দিকে হাঁটছেন দু'জনে, হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা জানোয়ার চাপড়ার পাশ দিয়ে চকিতে চলে গেল। লেজ দেখে বোঝা গেল চিতাবাঘ। ওই সময় কমিশনার উইন্ডহ্যাম তরাইতে গেছেন চিতাবাঘ শিকার করতে। আর তরাই থেকে নিজের গাঁয়ে ফিরে আসছিলেন করবেট। তিনি জানতেন মাইল দশেক দূরে হাতি নিয়ে বাঘ খুঁজে বেড়াচ্ছেন উইন্ডহ্যাম। বাহাদুর সে কথা করবেটকে মনে করিয়ে দিয়ে আফসোসের সুরে বলল, 'সাহেব, কমিশনার সাব তাঁর হাতি নিয়ে বাঘ খুঁজছেন। আর বাঘ চলে এসেছে এখানে। ওটাকে গুলি করেন।'

বাঘটা চোখের আড়াল হয়ে গেছে। ওটাকে গুলি করতে হলে ঘাসের চাপড়ায় আগুন দেয়া ছাড়া বিকল্প নেই। পরিকল্পনাটা বাহাদুরকে খুলে বললেন তিনি। ঘাসে আগুন লাগিয়ে দিলে বাঘ বাধ্য হবে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে। তখন ওটাকে গুলি করবেন করবেট। বাহাদুর করবেটকে সাহায্য করতে রাজি হলো। যদিও তার সন্দেহ হচ্ছিল পরিকল্পনাটা কাজে লাগবে কিনা।

গরুর গাড়ি চলার একটা ট্র্যাক ধরে ঘাসের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেছে চিতাবাঘ। করবেট ট্র্যাকটা একবার চক্কর মারলেন। মোচা আকারের ঘাস জমিটা কমপক্ষে দশ একর জায়গা নিয়ে বিস্তৃত। ট্র্যাকটা ঢুকে গেছে এই মোচার মধ্যে।

করবেটের অনুকূলেই বাতাস বইছে। তিনি ট্র্যাক থেকে দুশো গজ দূরের

ঘাসের চাপড়ার ধারে চলে এলেন। দুই গোছা শুকনো ঘাস কেটে নিলেন। আগুন ধরিয়ে একটা থোকা বাহাদুরকে দিয়ে বললেন ডান দিকের জমিতে আগুন লাগিয়ে দিতে, নিজে গেলেন বাঁ দিকে। এই জমির ঘাসের নাম এলিফ্যান্ট গ্রাস। লম্বায় বারো ফুট, খটখটে শুকনো। এক মিনিটের মধ্যে দাউ দাউ জ্বলতে শুরু করল ঘাসের জঙ্গল। দৌড়ে ট্র্যাকে ফিরে এলেন করবেট, উবু হয়ে শুয়ে পড়লেন মাটিতে। কাঁধে ফিট করলেন .২৭৫ রিগবি রাইফেল। এদিকে বাহাদুর তাঁর পরামর্শ মত গাছে চড়ে বসেছে।

খানিক পরে ঘাসের জঙ্গল থেকে এক্সপ্রেস ট্রেন চলার শব্দ ভেসে আসতে লাগল। আগুনের ভয়ানক গর্জনকে তাই মনে হলো করবেটের। তিনি রাইফেলের সাইটে চোখ রেখে চুপচাপ শুয়ে আছেন। ঘাসের জঙ্গল থেকে বেরুলেই গুলি করবেন বাঘটাকে। হঠাৎ ডান কাঁধের পাশে নগ্ন একটা পা দেখতে পেলেন তিনি। মুখ তুলে দেখেন এক লোক দাঁড়িয়ে আছে তাঁর পাশে। চেহারা এবং বেশভূষা দেখে মনে হলো মুসলমান রাখাল। হারানো গরু খুঁজছে। লোকটার হাত ধরে টান দিলেন করবেট। চেঁচিয়ে বললেন তাঁর পাশে শুয়ে পড়তে। লোকটা যাতে নড়াচড়া না করে এজন্যে তার গায়ে একটা পা তুলে দিলেন। এমন সময় এক ঝলকের জন্যে বাঘটাকে দেখা গেল। পঁচিশ গজ দূরের একটা ঘাসের চাপড়ায় তখনও আগুন ধরেনি। ওটার পাশের ট্র্যাক দিয়ে বেরিয়ে এল বাঘ, পরক্ষণে বিদ্যুৎ গতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল করবেটের বাম পাশে পোড়া ঘাসের স্তূপের আড়ালে। করবেট ততক্ষণে ট্রিগার টিপে দিয়েছেন। কিন্তু বাঘটার গায়ে কোথায় গুলি লেগেছে বুঝতে পারেননি তিনি। তবে তিনি নিশ্চিত যেখানেই গুলি লাগুক মারাত্মক আহত হয়েছে বাঘ। কারণ ওটার লেজ দারুণভাবে ঝাঁকি খেতে দেখেছেন তিনি অদৃশ্য হয়ে যাবার সময়। এক লাফে খাড়া হলেন করবেট, মুসলমান রাখালকে এক হাতে ধরে দৌড় দিলেন ট্র্যাকের দিকে। গরুর গাড়ি চলার ট্র্যাক বা আলটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে ঘন ধোঁয়ায়। মাথার ওপর তখনও লকলক করছে আগুনের শিখা। বাঘটাকে পড়ে থাকতে দেখা গেল আলের ওপর। আগুনের তীব্র উত্তাপে শরীর যেন ঝলসে যাচ্ছিল। করবেট আর সময় নষ্ট না করে বাঘটার লেজ চেপে ধরলেন। টেনে নিয়ে যাবেন। রাখালও হাত লাগাল। কিন্তু লেজে হাত পড়তেই হুড়ুম করে লাফিয়ে উঠল বাঘ। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল করবেটদের ওপর। সাথে সাথে ওটার ঘাড়ে গুলি চালিয়ে দিলেন করবেট। স্থির হয়ে গেল বাঘ। এবার ওটাকে আগুনের ধার থেকে, পঞ্চাশ গজ দূরে লেজ ধরে টেনে আনা গেল। করবেট দেখলেন মারা গেছে জানোয়ারটা। রাখালকে এবার যেতে দিলেন তিনি। সে ঝেড়ে দৌড় দিল। যেন ওকে কামড়ে দিয়েছেন করবেট।

বাহাদুর ইতিমধ্যে গাছ থেকে নেমে এসেছে। সে বলল, 'লোকটা আজকের বাঘ শিকারের গল্প বলে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। যদিও কেউ তার গল্প বিশ্বাস করবে না।'

বিপজ্জনক বলে পরিচিত প্রাণীগুলোকে যখন পায়ে হেঁটে শিকার করা সম্ভব হয় না তখন হাতি বা লোকজন নিয়ে শিকারে বের হয় শিকারীরা। এ ধরনের শিকারকে বলে 'বিট'। এ শিকারের মজা অন্যরকম। এরকম শিকারে গিয়ে কেমন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা হয়েছিল জিম করবেটের সে গল্প পরের অধ্যায়গুলোতে।

---

# বিট কাহিনি

জিম করবেট একদিন সকালে তাঁদের স্প্রিংগার স্প্যানিয়েল কুকুর রবিনকে নিয়ে ঘুরতে বেরুলেন। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন বোয়ার ব্রিজের পশ্চিমে, আধ মাইল দূরের একটা ফায়ার-ট্র্যাকে। রবিন সামনে, করবেট পেছনে। রবিন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ঘাসে ছাওয়া একটা ছোট্ট ট্র্যাকের সামনে। তারপর মাথা ঘুরিয়ে তাকাল প্রভুর দিকে। করবেট রবিনকে ইশারা করলেন গন্ধ শুঁকে সামনে এগোতে। সাথে সাথে বামে মোড় নিল রবিন, ট্র্যাকের শেষ প্রান্তে, ঘাসের একটা চাপড়ার ধারে এসে দ্রুত একবার তাকাল করবেটের দিকে। যেন বলতে চাইল, 'ঠিকই আছে। ভুল করিনি আমি।' তারপর আঠারো ইঞ্চি লম্বা ঘাস জঙ্গলে ঢুকে গেল। গন্ধ শুঁকে শুঁকে একশো গজ এগোল রবিন, ওখানে ভেজা কাদায় বাঘের পায়ের ছাপ চোখে পড়ল করবেটের। রক্তও পড়ে আছে অনেকখানি। অভিজ্ঞ শিকারী চোখ দিয়ে দেখেই বুঝলেন তাজা রক্ত। আজ সকালে এদিকে গুলির আওয়াজ শোনেননি করবেট। ধরে নিলেন বাঘটা চিতল কিংবা বড় শুয়োর হত্যা করেছে। কয়েক গজ দূরে ক্লেরোডেনড্রনের ঘন ঝোপ। ওখানে গিয়ে দাঁড়াল রবিন। নির্দেশের অপেক্ষা করছে।

ভেজা মাটিতে পায়ের ছাপ দেখে জানোয়ারটার আকার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেছেন করবেট। বড় বাঘ। বোয়ার নদীর দূর প্রান্তের ঘন জঙ্গলে ওটার আস্তানা। মাস তিনেক ধরে এই বাঘটাকে নিয়ে খুব শঙ্কিত জিম এবং ম্যাগী। সকাল-সন্ধ্যায় ম্যাগীকে নিয়ে নিয়মিত হাঁটতে বেরুতেন তিনি। মাঝে মাঝে ওটাকে চোখে পড়েছে তাদের। রবিন শেষে ম্যাগীকে আর বেরুতে দিতে চাইত না। ব্রিজের ওপারে যেতে দিত না ম্যাগীকে। দুর্ঘটনা ঘটার ভয়ে করবেট সিদ্ধান্ত নেন বাঘটাকে মেরে ফেলা দরকার। এখন সুযোগটা এসে গেছে। কাজেই তার সদ্ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। রবিনকে নিয়ে ক্লেরোডেনড্রনের ঝাড় থেকে ত্রিশ গজ সামনে এগোতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল কুকুরটা, মাথা তুলে গন্ধ শুঁকল বাতাসে, তারপর ঘুরে তাকাল। করবেট বুঝতে পারলেন বাঘটা ফায়ার-ট্র্যাকের আশপাশে কোথাও আছে। তিনি এরপর রবিনকে নিয়ে দ্রুত ফিরে এলেন বাড়িতে।

নাস্তা সেরে বাহাদুরকে খবর পাঠালেন করবেট। বাহাদুর এলে তাকে বাঘটার কথা খুলে বললেন। জানালেন তাঁর আরও দু'জন লোক চাই। ধনবান এবং

ধর্মানন্দকে নিয়ে আসতে বললেন করবেট। দু'জনেই বিশ্বস্ত, করবেট এদের ওপর ভরসা করতে পারেন। তাঁর এবং বাহাদুরের মত এরাও গাছ বাইতে ওস্তাদ। দুপুরের খাওয়া সেরে ওরা তিনজন চলে এল করবেটের কটেজে। করবেটের নির্দেশে জুতো খুলে ফেলল সবাই। ৪০০/৪৫০ রাইফেল কাঁধে ফেলে দলটাকে নিয়ে বাঘ শিকারে বেরিয়ে পড়লেন জিম করবেট।

বাঘ শিকারে 'বিট' পদ্ধতি অবলম্বন করবেন ঠিক করেছেন তিনি। তাই তিনজনকে সাথে নিয়েছেন। ওরা করবেটের মতই জঙ্গল ভাল চেনে। করবেট জানালেন বাঘটা কোথায় আছে। কি করতে হবে বলে দিলেন। সবাই বেশ উৎসাহ বোধ করল। উৎসাহিত হবার অবশ্য কারণও আছে। করবেট এজন্যে ওদেরকে পয়সা দিয়েছেন।

করবেটের প্ল্যান হলো ক্লেরোডেনড্রনের ঝাড়ের তিন দিকে ওরা তিনজন গাছের ওপর উঠে বসবে। করবেট পাহারা দেবেন চতুর্থ দিকটা। বাহাদুর থাকবে মাঝের গাছে। করবেটের কাছ থেকে চিতার গলায় ডেকে ওঠার সঙ্কেত পেলেই সে লাঠি দিয়ে গাছে বাড়ি মারতে শুরু করবে। বাঘটাকে বেরিয়ে আসতে দেখলে বাকি দু'জন জোরে জোরে তালি দিতে থাকবে। সবাইকে খুব সাবধানে গাছে চড়তে বললেন করবেট। কারণ বাঘটা ওদের তিনজনের কাছ থেকে বড় জোর ত্রিশ/চল্লিশ গজ দূরে থাকার কথা। গাছে চড়ার সময় সামান্য শব্দ হলেও সাবধান হয়ে যাবে বাঘ। ভেস্তে যাবে প্ল্যান।

যেখানে রবিন বাঘের গায়ের গন্ধ পেয়েছে, ওখানে পৌঁছে করবেট ধনবান এবং ধর্মানন্দকে চুপচাপ বসে থাকতে বললেন। ক্লেরোডেনড্রন থেকে বিশ গজ দূরে একটা গাছে উঠিয়ে দিলেন বাহাদুরকে। বিপরীত দিকে তিনি থাকবেন। তারপর এক এক করে বাহাদুরের ডাইনে এবং বামের গাছে চড়ে বসল ওরা দু'জন। একে অন্যকে ওরা দেখতে পাচ্ছে। তবে সবার নজর রইল ক্লেরোডেনড্রনের ঝাড়ের দিকে। ওখানে বাঘটার যে কোন নড়াচড়া চোখে পড়বে ওদের।

শেষ লোকটাও গাছে উঠে পড়ল কোন শব্দ না করে। করবেট ফিরে এলেন ফায়ার-ট্র্যাকে। শ'খানেক গজ এগোবার পরে ডান পাশে, পাহাড়ের নিচে আরেকটা ফায়ার-ট্র্যাক পড়ল। দ্বিতীয় এই ফায়ার-ট্র্যাকটা ক্লেরোডেনড্রনের ঝাড়টাকে ঘিরে আছে চতুর্থ দিক থেকে। বিপরীত দিকের যে গাছটাতে উঠে বসেছে বাহাদুর, তারপাশে সরু, গভীর একটা খাদ। খাদের ডান দিকে, পাহাড় থেকে দশ গজ দূরে প্রকাণ্ড এক জাম গাছ। করবেট ঠিক করেছেন এ গাছটায় উঠবেন। খাদের পাশ দিয়ে বাঘ যাবার চেষ্টা করলেই গুলি করবেন। কিন্তু গাছের ধারে এসে দেখলেন ভারী রাইফেল হাতে এতে চড়া তাঁর কম্মো নয়। আশপাশে

আর কোন গাছ না থাকায় মাটিতে বসার সিদ্ধান্ত নিলেন করবেট। কাণ্ড থেকে শুকনো পাতা ঝেড়ে, গাছের গায়ে পিঠ দিয়ে বসলেন।

দুটো কারণে চিতার ডাক ডাকবেন করবেট। সঙ্কেত পেলে বাহাদুর লাঠি দিয়ে বাড়ি মারতে শুরু করবে গাছে। আর অন্য কারণটি হলো—চিতার ডাক শুনলে বাঘ বুঝতে পারবে ফায়ার ট্র্যাকে আসা তার জন্যে বিপজ্জনক নয়। মাটিতে আরাম করে বসে রাইফেলের বাঁট কাঁধে ঠেকালেন করবেট। অবিকল চিতার গলায় ডেকে উঠলেন। কয়েক সেকেন্ড পরে লাঠি দিয়ে গাছে বাড়ি দিতে শুরু করল বাহাদুর। মাত্র কয়েকবার বাড়ি দিয়েছে, এমন সময় ঝোপ গলে বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড এক বাঘ। দাঁড়াল ফায়ার-ট্র্যাকে।

গত দশ বছর ধরে বিভিন্ন ভাবে জিম করবেট চেষ্টা করেছেন বাঘের ছবি তুলতে। কিন্তু মনের মত ছবি তুলতে পারেননি। আর এখন, খোলা ফায়ার-ট্র্যাকে, তাঁর কাছ থেকে বিশ গজ দূরে ছবি তোলার চমৎকার উপাদান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাঘ। ওটার চকচকে পিঠে রোদ যেন পিছলে পড়ছে। বাঘটার ছবি তোলার জন্যে এই মুহূর্তে নিজের যা কিছু দিয়ে দিতে রাজি করবেট। কিন্তু আফসোস, তাঁর কাছে ক্যামেরা নেই। আর বাঘটাকে তাঁর হত্যা করতেই হবে। কারণ এদিকে জঙ্গলে রাখাল বালকরা গরুর পাল নিয়ে আসে ঘাস খাওয়াতে, শিশু এবং মহিলারা আসে শুকনো পাতা আর ডাল কুড়োতে। এরা যে কেউ বাঘটার দ্বারা যে কোন মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে। কাজেই এটাকে বাঁচিয়ে রেখে ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না।

ফায়ার-ট্র্যাকে পা রেখে মিনিট খানেক স্থির দাঁড়িয়ে রইল বাঘটা। ঘাড় ঘুরিয়ে ডান আর বাম পাশ দেখল। তারপর ধীরে সুস্থে খাদের বাম দিকে, পাহাড় অভিমুখে হাঁটা দিল। ক্লেরোডেনড্রনের ঝোপ থেকে বের হয়ে আসার পর থেকে বাঘটাকে রাইফেলের নাগালে লক্ষ্য স্থির করে রেখেছেন করবেট। ওটা তাঁর কাছাকাছি আসতে টিপে দিলেন ট্রিগার। ঝাঁকি খেলো বাঘ, ভাঁজ হয়ে গেল পা। তারপর পিছলে নেমে এল খাদের ধার দিয়ে। স্থির হয়ে গেল জিম করবেটের পায়ের কাছে এসে।

---

# জিমের বাঘ

জিন্দ-এর হিজ হাইনেস মহারাজাকে তাঁর রাজ্যের সবাই খুব পছন্দ করত। তাঁর মৃত্যুতে, জিম করবেট বলেছেন, ভারত হারিয়েছে দেশের সেরা একজন স্পোর্টসম্যানকে।

জিন্দ-এর মহারাজার রাজ্য সীমা ছিল ১২৯৯ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। অধিবাসীর সংখ্যা ৩২৪,৭০০। মহারাজার শখ ছিল বাঘ শিকার এবং কুকুরদের শিকার ধরার জন্যে ট্রেইনড করে তোলা। অত্যন্ত ধৈর্য নিয়ে দ্বিতীয় কাজটি করতেন তিনি। কুকুরগুলো তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। কখনও ওদের গায়ে হাত তুলতেন না।

একবার মহারাজার সঙ্গে পাখি শিকারে বেরুলেন জিম করবেট। ঘাস আর ঝোপের লম্বা জঙ্গলে হাতির পাল নিয়ে মহারাজার লোকজন আগে আগে 'বিট' করে যাচ্ছিল। জঙ্গলের শেষ মাথায় পঞ্চাশ গজ জায়গা নিয়ে খোলা একটুকরো জমিন। জমিনের এক কোণে, খাটো ঘাসের সামনে মহারাজাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন করবেট। মহারাজার বাম পাশে এক সারিতে বসে আছে তিনটি তরুণ ল্যাব্রাডর। এর মধ্যে সোনালি রঙের স্যান্ডি হলো মহারাজার সবচে' প্রিয় কুকুর। বাকি দুটো কালো। বিট-এর লোকজন এবং হাতির পাল তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল একটা কালো তিতির। মহারাজা পাখিটিকে গুলি করে ফেলে দিলেন। তারপর তাঁর কালো এক ল্যাব্রাডরকে পাঠালেন পাখিটিকে নিয়ে আসতে। একটু পরে করবেট একটা জাঙ্গল-ফাউলকে গুলি করলেন। ওটা ছিটকে পড়ল পেছনে, ঘাসের জঙ্গলে। দ্বিতীয় কালো ল্যাব্রাডর ওটাকে খুঁজে নিয়ে এল। বন্দুকের শব্দ শুনে ছুটে পালাল কয়েকটা ময়ূর। গুলি করার সুযোগ মিলল না। তবে একটা খরগোশ মারার সুযোগ পেলেন করবেট। মহারাজার ডানদিকে, ত্রিশ গজ সামনে ওটা ডিগবাজি খেয়ে পড়ে রইল। স্যান্ডি ছুটল খরগোশের দিকে। মহারাজা 'স্যান্ডি, স্যান্ডি' করে ডাকলেন। শুনল না। তার দুই ল্যাব্রাডর সঙ্গী যে যার ভাগের শিকার ধরে এনেছে, স্যান্ডি কম যায় কিসে? সে এক ছুটে খরগোশটাকে নিয়ে এল। করবেটের পায়ের কাছে শিকার ফেলে রেখে ফিরে গেল নিজের জায়গায়। মহারাজা স্যান্ডিকে হুকুম করলেন খরগোশটাকে আগের জায়গায় রেখে আসতে। স্যান্ডি তাই করল। মহারাজা এবার ওকে ফিরে আসতে বললেন। তীরবেগে চলে এল স্যান্ডি। মহারাজা অবশ্য রাগ করেছিলেন স্যান্ডির

ওপর। কারণ তিনি শুরুতে ওকে খরগোশ আনতে যেতে নিষেধ করেছিলেন। স্যান্ডি নিষেধ মানেনি। মহারাজা চাকরের কাছে নিজের বন্দুক দিয়ে একটা বেত হাতে নিলেন। তারপর স্যান্ডিকে আচ্ছাসে 'ধোলাই' দিলেন। যদিও বেতের বাড়ি একটাও স্যান্ডির গায়ে পড়ল না। সব ক'টা মাটিতে। বলা বাহুল্য, এটা ছিল স্রেফ শো। মহারানী মহারাজাকে পরে যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন স্যান্ডির অবাধ্যতার কারণে মহারাজা তাকে খুব বেশি শাস্তি দিয়েছিলেন কিনা, মহারাজা জবাবে বলেছিলেন, 'বেয়াদবটাকে আচ্ছা ধোলাই করেছি।'

জিম করবেট মহারাজাকে চিরকুটে লিখেছিলেন (মহারাজা কানে শুনতেন না। তাই তাঁকে লিখে দিতে হত) 'স্যান্ডি বাহাদুর আজ আপনার সাথে বেয়াদবি করলেও, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, ও ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কুকুর। দেখবেন আগামী গান-ডগ ট্রায়ালে ও চ্যাম্পিয়ন হবে।'

ওই বছরই মহারাজার একটি টেলিগ্রাম পান করবেট। তাতে লেখা ছিল, 'আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। স্যান্ডি ওপেন চ্যাম্পিয়নশিপে জিতেছে।'

লম্বা দিনগুলো কিছুতেই যেন ফুরোতে চাইছিল না। আর বেশ গরমও পড়ছিল। হাতে তেমন কাজ না থাকায় একদিন খুব ভোরে বেরিয়ে পড়লেন জিম করবেট। চলে এলেন মোহনে, মহারাজার ক্যাম্পে। মহারাজা তখন সপরিবারে নাস্তা করছেন।

মহারাজা করবেটকে দেখে বললেন, 'খুব ভাল সময়ে এসে পড়েছেন। আজ আমরা বুড়ো বাঘটাকে শিকার করতে যাব। গত তিন বছর ধরে ওটার নাগাল পাচ্ছি না আমি। ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছে।'

'বুড়ো' বাঘটার কথা জানা ছিল করবেটের। জানতেন ওটাকে শিকার করার জন্যে কি রকম ব্যাকুল হয়ে আছেন মহারাজা। মহারাজা জানালেন তিনটে মাচা তৈরি করা হয়েছে 'বিট'-এর জন্যে। করবেটকে শিকারে আহ্বান করলেন তিনি। একটা রাইফেলও ধার দিতে চাইলেন। কিন্তু প্রস্তাবটি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে করবেট বললেন এ যাত্রা শিকারী নয়, স্রেফ দর্শকের ভূমিকা পালন করতে চান তিনি। সকাল দশটা নাগাদ মহারাজা, মহারানী, তাদের দুই কন্যা এবং এক বান্ধবীসহ বাঘ শিকার অভিযানের সহযাত্রী হয়ে গাড়িতে চড়ে বসলেন করবেট। গাড়ি চলে এল যেখান থেকে বিট শুরু হবে সে-জায়গায়।

যে উপত্যকায় বিট শুরু হবে ওটা মিশে গেছে পাহাড়ের পাদদেশে, ছোট একটি জলধারা বয়ে চলেছে মাঝখান দিয়ে। দু'পাশে তিনশো ফুট উঁচু পাহাড়। ওটার নিম্ন প্রান্তে, (Lower end) যেখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে, সেখানে উপত্যকাটি পঞ্চাশ গজের মত বিস্তৃত, তারপর আধা মাইল গিয়ে আবার পঞ্চাশ গজের মত জায়গা সংকুচিত হয়ে এসেছে। এই দুটি পয়েন্টের মাঝখানে

উপত্যকা ছড়িয়ে পড়েছে তিন/চারশো গজ জায়গা নিয়ে। এখানে ঘন জঙ্গলে বাঘটার থাকার কথা। বাঘটা আগের রাতে একটা মোষ শিকার করেছে এ জায়গায়। উপত্যকার উচ্চতর প্রান্তে, (Upper end) ডান দিকের পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসেছে ছোট একটি পাথুরে শাখা। এটার ওপরে, গাছে, উপত্যকার দিকে মুখ করে তৈরি করা হয়েছে একটি মাচা। এই মাচা থেকে পাহাড়ের দু'পাশের ঢালও দেখা যায়। শাখার নিচে এবং জলধারার দূর প্রান্তে, ডান দিকে, ত্রিশ গজ ব্যবধানে, গাছের ওপর আরও দুটি মাচা বানানো হয়েছে।

রাস্তার ওপর গাড়ি রেখে উপত্যকার দিকে পায়ে হেঁটে এগোলেন করবেটেরা। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল হেড শিকারী এবং বিটের দায়িত্বে থাকা সহকারী। মহারাজা উঠে বসলেন পাথুরে শাখার মাচায়, করবেট এবং চার রমণীর জায়গা হলো জলধারার পাশের বাকি দুটি মাচায়। তারপর হেড শিকারী এবং সহকারী চলে গেল রাস্তায়। বিট শুরু করবে।

দুই রাজকুমারীর সাথে যে মাচায় উঠেছেন করবেট, ওটা পুরু কার্পেটে মোড়া, মখমলের কুশন আছে বসার জন্যে। গাছের শক্ত ডালে বসে অভ্যস্ত করবেটের মাচার কার্পেটের আরামে এবং খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগরণ ও লম্বা হাঁটার ক্লান্তিতে চোখ বুজে এল। তিনি ঘুমিয়েই পড়েছিলেন, জেগে গেলেন দূরাগত রাম শিঙার শব্দে। শুরু হয়ে গেছে বিট। বিটে অংশ নিয়েছে দশটি হাতি, হেড শিকারী এবং তার সহকারীরা, মহারাজার বাড়ির কাজের লোকজন সহ আশপাশের গ্রাম থেকে নিয়ে আসা কমপক্ষে দুশো মানুষ। জঙ্গল বিট করে এগোবে হাতির দল, আর দুশো মানুষ পাহাড়ের দু'পাশের ঢাল বিট করবে। এদের কয়েকজন আবার দল বেঁধে পাহাড়ে উঠেছে। বাঘ পাহাড়ে যাবার চেষ্টা করলে তাড়িয়ে আনবে।

বাঘ শিকারের জন্যে এই বিট-এর মহা আয়োজনে বেশ মজা লাগছিল জিম করবেটের। বাঘ বাবাজীর পালিয়ে যাবার উপায় নেই। কারণ চারদিকে কড়া পাহারা। বিটের তাড়া খেয়ে জঙ্গল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে কালিগি, জাঙ্গল-ফাউল, ময়ূর সহ নানা পাখি বেরিয়ে এল। মহারাজা অবশ্য বিটের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলেন না। তবে তাঁর সহকারী ভাল শিকারী। মহারাজার মাচার দিকে তাকিয়ে করবেট দেখলেন মহারাজার সহকারী ডান দিকে হাত তুলে কি যেন দেখাচ্ছে। মহারাজা ওদিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন। একটু পরে একটি সম্বর হরিণ জলধারা পার হয়ে, মহারাজার মাচার নিচ দিয়ে উপত্যকার দিকে ছুটতে ছুটতে চলে গেল।

বিট যারা করছে, তারা সবাই এক সাথে চিৎকার চেঁচামেচি করছে, হাততালি দিচ্ছে। তবে তারা যত এগিয়ে আসছিল, বাঘের দেখা পাবার আশা

ততই উবে যাচ্ছিল করবেটের মন থেকে। কারণ এখন পর্যন্ত তিনি কোন পশু বা পাখিকে সতর্ক ভঙ্গিতে ডেকে উঠতে শোনেননি। ওদিকে রাজা রাইফেল বাগিয়ে রেডি। বাঘ দেখলেই গুলি ছুঁড়বেন। কিন্তু বিটের আয়োজন বৃথা গেল। বাঘের দেখা মিলল না। ভেবে অবাক হলো সবাই বাঘটা তাহলে কোথায় গেল। গাড়িতে চড়ে ফিরে আসার মুহূর্তে করবেটরা শুনতে পেলেন বাঘের গর্জন। কেউই বুঝতে পারছিল না বিট পরিচালনায় কি এমন ত্রুটি ছিল যার জন্যে বাঘের দেখা পাওয়া যায়নি। করবেট অবশ্য একটা সন্দেহ করছিলেন। কিন্তু এবার দর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন বলে এ ব্যাপারে কিছু বলছিলেন না।

লাঞ্চ শেষে সবাই ফিরে এল ক্যাম্পে। অন্যান্যরা বিশ্রাম নিচ্ছে, করবেট চলে গেলেন কুশি নদীতে মাছ ধরতে। এপ্রিলের শেষাশেষি বলে নদীতে মাছও তখন প্রচুর।

রাতে, ডিনার শেষে মহারাজা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোদের নিয়ে বিট-এর ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে আলোচনায় বসলেন। এর আগে অন্তত পাঁচ বার বাঘটাকে শিকার করার জন্যে 'বিট' করা হয়েছে। কোনবারই সফল হতে পারেননি মহারাজা। সাঙ্গোপাঙ্গোরা নানা মত ব্যক্ত করছে, করবেট তখন ভাবছিলেন বিট কেন ব্যর্থ হলো তা নিয়ে। তিনি বুঝতে পারছিলেন মাচায় অত লোকজন নিয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি মহারাজার। তবে এ কারণেই যে বিট ব্যর্থ হয়েছে তা নয়। আসলে মহারাজা তাঁর দলবল নিয়ে উপত্যকায় ঢোকার সময়ই বাঘ ওই জায়গা ছেড়ে চলে যায়। খালি জঙ্গলে বিট করা হয়েছে। করবেট ঠিক করলেন আবার যাবেন উপত্যকায়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস বাঘটা ওখানেই আছে। কারণ ওখানে গাড়ি রেখে যাত্রা শুরুর খানিক পরে একটা কাকর-এর সতর্ক ডাক শুনতে পেয়েছিলেন করবেট। কাকরটা ডাকছিল উপত্যকার উচ্চতর প্রান্তের ল্যান্ড স্লাইডের কাছ থেকে। ওখানে, জঙ্গলের ধারে যদি কোন গেম-ট্র্যাক থাকে, তাহলে এটা খুবই সম্ভব যে বিট-এর শব্দ শুনে ওই গেম-ট্র্যাক ধরে পালিয়ে গেছে বাঘ।

পরদিন আবার উপত্যকায় করবেট যাচ্ছেন, এ কথা জানালেন মহারাজাকে। এক টুকরো কাগজে লিখলেন, 'কাল সকাল পাঁচটায়, যদি রেডি হতে পারেন, তাহলে একসঙ্গে বাঘ শিকারে যাওয়া যাবে।'

মহারাজার পারিষদরা সবাই একযোগে না না করে উঠল। কিন্তু পারিষদদের নিষেধ মানলেন না মহারাজা। জানালেন তিনি করবেটের সঙ্গে যাবেন। তবে সঙ্গী হিসেবে থাকবে দু'জন। ওরা মহারাজার বন্দুক বহন করবে।

পরদিন কাঁটায় কাঁটায় সকাল পাঁচটায় মহারাজা, তাঁর দুই বন্দুকবাহী এবং জিম করবেট চড়ে বসলেন গাড়িতে। তিন মাইল দূরে, মাহুত তার হাতি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। হাতির পিঠে বাঁধা ছোট একটি মাচা। রাজা এবং তাঁর দুই

বন্দুকবাহীকে হাতির পিঠে তুলে দিয়ে পায়ে হেঁটে এগোতে শুরু করলেন করবেট।

কয়েক মাইল রাস্তা পার হতে হলো তাদেরকে। এদিকে আগে কখনও না এলেও করবেটের পথ চিনে চলার ক্ষমতা অসীম। মোটামুটি ঠিক রাস্তা ধরেই এগোচ্ছিলেন তিনি। সূর্য উঠি উঠি করছে, এমন সময় পাহাড়ে এসে পৌঁছুলেন তাঁরা। এখান থেকে ল্যান্ড স্লাইডটা শুরু হয়েছে। করবেট খুশি হয়ে উঠলেন একটা গেম-ট্র্যাক দেখে। উপত্যকা থেকে বেরিয়ে এসেছে। ট্র্যাকের কাছে মাচা বাঁধলেন তিনি। মহারাজাকে এক বন্দুকবাহী সহ মাচায় তুলে দিলেন করবেট। মাহুতকে বললেন হাতি নিয়ে চলে যেতে। অপর বন্দুকবাহীকে তিনি পাহাড়ের ধারে আরেক গাছে উঠতে বললেন। এসব কাজ শেষ হবার পরে 'ওয়ান-ম্যান বিট' শুরু করলেন জিম করবেট।

উপত্যকার ঢাল খুব খাড়া। তবে রাইফেল সঙ্গে নেই বলে খাড়া ঢাল বেয়ে নামতে তেমন বেগ পেতে হলো না করবেটকে। আগের দিন তৈরি করা মাচা দুটি পার হয়ে নিঃশব্দে উপত্যকা ধরে এগোলেন তিনি। দুশো গজ দূরে, জঙ্গলের ধারে এসে দাঁড়ালেন। বাঘটা যেখানে মোষটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, ওখানে একটা গাছ পড়ে ছিল। ভেতরটা ফাঁপা। করবেট সন্দেহ করলেন বাঘটা জঙ্গলেই আছে। সিগারেট জ্বালিয়ে গাছটার ওপর বসলেন তিনি। কান খাড়া। জঙ্গল তাঁকে কিছু বলে কিনা শুনতে চাইছেন। কিন্তু চারদিক আশ্চর্য সুনসান। করবেট খকখক কাশলেন বার কয়েক, ফাঁপা গাছে জুতোর হিল দিয়ে ঠকঠক শব্দ করলেন। তারপর বাঘের খাওয়া শিকার খুঁজতে বেরুলেন। ঘন একটা ঝোপের নিচে আধ-খাওয়া মোষটাকে দেখে খুশি হয়ে উঠলেন তিনি। বুঝতে পারলেন কয়েক মিনিট আগেই তার অর্ধভুক্ত শিকারকে আবার খেয়ে গেছে বাঘ। কারণ মোষের শরীর এখনও গরম। ফাঁপা গাছটার ধারে দৌড়ে গেলেন করবেট, পাথর দিয়ে জোরে জোরে বাড়ি দিতে শুরু করলেন। সেই সাথে গলার স্বর উঁচু লয়ে তুলে মহারাজাকে সাবধান করে দিলেন—বাঘ আসছে। এক মিনিট পরেই গুলির আওয়াজ শুনতে পেলেন করবেট। পাহাড়ে এসে দেখলেন গেম ট্র্যাকে দাঁড়িয়ে আছেন মহারাজা, তাকিয়ে রয়েছেন বাঘটার দিকে। গুলি করে হত্যা করেছেন তিনি ওটাকে।

মহারাজার জিন্দ-এর প্রাসাদের দেয়ালে মৃত বাঘটির ছাল ছাড়িয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। নিচে লেবেল সাঁটানো 'জিমের বাঘ।' মহারাজা তাঁর গেম-বুকে দিনক্ষণ সব কিছু উল্লেখ করে বর্ণনা করেছিলেন কিভাবে বাঘটিকে হত্যা করেন তিনি।

---

# ভাইসরয়ের বাঘ শিকার

মার্চ মাসের শেষ হপ্তার কোনও এক দিন। জিম করবেট তাঁর কালাধুঙ্গির বাড়ি থেকে বেরুবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। দুপুরের রান্নার জন্যে মাছ শিকারে যাবেন। এমন সময় রাম সিংকে দেখলেন দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে। রাম সিং ডাক পিয়ন। দুই মাইল দূরের ডাক ঘর থেকে চিঠিপত্র দিয়ে যায়। তবে আজ চিঠি নয়, টেলিগ্রাম নিয়ে এসেছে সে। পোস্টমাস্টার তাকে বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন খুবই জরুরী টেলিগ্রাম। নৈনিতাল থেকে রিডাইরেক্ট হয়ে এসেছে ওটা। পাঠিয়েছেন ভারতের ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো'র মিলিটারি সেক্রেটারি হিউ স্ট্যাবল। বলছেন ভাইসরয়ের দক্ষিণ ভারত সফরে যাবার কথা ছিল। বিশেষ কারণে যাত্রা স্থগিত। শীঘ্রি তিনি সিমলা যাবেন। তবে হাতে এখনও দিন দশেক সময় আছে। এ সময়টা তিনি শিকার করে কাটাতে চান। জিম করবেট কি এ ব্যাপারে কোন পরামর্শ দিতে পারবেন যে কোথায় গেলে ভাইসরয় শিকারের আনন্দ পাবেন। হিউ স্ট্যাবল চিঠির দ্রুত জবাব চেয়েছেন। কারণ বিষয়টি জরুরী এবং হাতে সময় খুবই কম। রাম সিং ইংরেজী বলতে না পারলেও বুঝতে পারে। ত্রিশ বছর ধরে ডাক বিভাগে কাজ করছে সে। ম্যাগীকে করবেট টেলিগ্রাম পড়ে শোনাচ্ছেন, রাম সিং জানাল সে সাহেবের জবাবের অপেক্ষায় আছে। করবেটের জবাব নিয়ে তাকে এখুনি আবার হলদোয়ানি ছুটতে হবে। হলদোয়ানি করবেটদের সবচে' কাছের টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন অফিস, ১৪ মাইল দূরে। জবাব লিখে দিলেন করবেট। হিউ স্ট্যাবলকে পরদিন সকাল এগারোটায় হলদোয়ানিতে ফোন করতে বলেছেন।

রাম সিং যাবার পরে ছিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন করবেট। ভাবছেন হিউ স্ট্যাবলকে কিভাবে সাহায্য করা যায়। মাছ ধরার সময় মাথায় বুদ্ধিটা এল তাঁর। ভাইসরয়কে কালাধুঙ্গিতে আসার আমন্ত্রণ জানালেই হয়। শিকারের জন্যে কালাধুঙ্গির মত জায়গা হয় না।

পরদিন সকালে, সূর্য ওঠার আগেই কালাধুঙ্গি রওনা হয়ে গেলেন জিম করবেট। তবে টেলিফোন অফিসে যাবার আগে জিওফ হপকিন্সের সঙ্গে দেখা করলেন। জিওফ স্পেশাল ফরেস্ট অফিসার। তার সাহায্য ছাড়া হিউ স্ট্যাবলকে কোন কথা দেয়া যাবে না। জিওফ অত্যন্ত ভদ্র মানুষ। করবেট জানালেন ভাইসরয়ের শিকারের জন্যে জিওফের জঙ্গলের দুটি ব্লক তাঁর দরকার হবে। জিওফ বলল করবেটের পছন্দের ব্লক দুটি সে রিজার্ভ করে রাখবে। শুনে খুশি

মনে হলদোয়ানি চলে এলেন করবেট।

হিউ স্ট্যাবল সময়ানুবর্তি মানুষ। কাঁটায় কাঁটায় সকাল এগারোটায় ফোন করলেন কালাধুঙ্গি টেলিগ্রাফ অ্যান্ড টেলিফোন অফিসে। কোন বিরতি ছাড়াই দীর্ঘ আলাপ চলল দুজনের। হিউ জানতেনই না হিমালয়ের কোলে কালাধুঙ্গি নামে ছোট একটি গ্রাম আছে। জানা ছিল না এ গ্রামে আছে গভীর জঙ্গল যেখানে পছন্দসই শিকারের কমতি নেই। হিউ জানালেন ভাইসরয় সদলবলে আসবেন শিকারে। তাঁর দলে লেডি লিনলিথগো ছাড়াও থাকছেন তাঁদের তিন কন্যা লেডি অ্যান, জোন এবং ডোরিন (বান্টি) হোপ। হিজ এক্সেলেন্সির সঙ্গে আসবেন তাঁর ব্যক্তিগত স্টাফ। কারণ ছুটিতে গেলেও ভাইসরয়ের কিছু না কিছু কাজের চাপ থাকেই। করবেট শুনলেন তাঁর হাতে মোট পনেরো দিন সময় আছে। এরমধ্যে শিকারের সমস্ত বন্দোবস্ত করতে হবে।

পরদিন দিল্লী থেকে গাড়িতে কালাধুঙ্গিতে চলে এলেন ভাইসরয়ের কন্ট্রোলার অভ দা হাউজহোল্ড মাউজ ম্যাক্সওয়েল। তাঁর সঙ্গে এলেন পুলিশ প্রধান, সি.আই.ডি প্রধান, সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রধান, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট প্রধান। এরকম আরও বিভিন্ন বিভাগ প্রধান। এক পাহারাদার জানাল ভাইসরয়কে পাহারা দিতে এক কোম্পানি সৈন্যও আসছে।

করবেটের শিকারী বন্ধু বাহাদুর বলেছিল ভাইসরয় আসছেন শুনে আগেই কালাধুঙ্গিতে হুলস্থূল পড়ে যাবে। তার কথাই অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। তবে এমন বিপুল আয়োজন করা হবে কল্পনাও করেননি করবেট। যাহোক, ভাইসরয়ের নির্বিঘ্নে বাঘ শিকারের জন্যে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হলো নিখুঁতভাবে। চারটে বিটের ব্যবস্থা করা হলো। বিটে মারা পড়ল চারটে বাঘ। তবে শেষ দিনের বিটটি স্মরণীয় হয়ে রইল করবেটের কাছে। কারণ এদিন বাঘ শিকারে বেরুল ভাইসরয়ের কন্যারা। বাঘ শিকারের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও তাদের সাহস রীতিমত মুগ্ধ করে তুলল বিশ্বখ্যাত শিকারীটিকে।

মোট পাঁচটি মাচান তৈরি করা হলো নদীর তীরে। বাঘকে বিট করে এই মাচানের ধারে নিয়ে আসা হবে। এক নম্বর মাচানে উঠবে লেডি অ্যান। দুই নম্বর মাচায় উঠে পড়লেন হার এক্সেলেন্সি। তিন নম্বর মাচা তৈরি করা হয়েছে একটি বেঁটে কুলগাছের ওপরে। এখানে থাকবে বাহাদুর। এটা একটা 'stop' হিসেবে কাজ করবে। এই মাচানের ধারে বাধা পেলে বাঘ বাম দিকে ঘুরে যাবে ভেবে চার নম্বর মাচানটি করবেট নির্বাচন করলেন ডরিন হোপ ওরফে বান্টির জন্যে।

করবেটের মোটামুটি একটা ধারণা ছিল বাঘটার অবস্থান সম্পর্কে। বাঘটা যেখানে কভার নিয়েছে সেদিক দিয়ে একটি গেম-ট্র্যাক চলে গেছে নদীর তীর ঘেঁষে, সোজা তিন নম্বর মাচানের নিচে ঢুকেছে। করবেট নিশ্চিত বাঘটা এই ট্র্যাক

ধরেই আসবে। তাই তিনি মাটি থেকে ছয় ফুট উঁচুতে মাচান বেঁধেছেন। কম উচ্চতা থেকে গুলি করতে সুবিধা হবে।

ভাইসরয়ের দুই কন্যা, হিজ এক্সেলেন্সির এ.ডি.সি পিটার বরউইক এবং বাহাদুরকে নিয়ে মাচার ধারে চলে এলেন জিম করবেট। বাহাদুর তার মাচানে উঠতে যাচ্ছে, তাকে বাধা দিলেন শিকারী। সিদ্ধান্ত বদলেছেন তিনি। বান্টিকে ফিসফিস করে এই মাচানে উঠে পড়তে বললেন পিটারকে নিয়ে। অনুরোধ করলেন বাঘ তাঁর (করবেট) চিহ্নিত স্পটটিতে না আসা পর্যন্ত বান্টি যেন জানোয়ারটাকে গুলি না করে। আর গুলি করতে হবে গলা লক্ষ্য করে। বান্টি বলল করবেটের নির্দেশ সে মেনে চলবে। তারপর পিটার এবং করবেটের সাহায্যে মাচানে উঠে পড়ল বান্টি। পিটারকে করবেট তাঁর ৪৫০/৪০০ ডাবল ব্যারেল রাইফেলটি দিলেন। একই অস্ত্র বান্টির কাছেও রইল। এরপর নদীর ধারে চলে এলেন করবেট। গেম-ট্র্যাক ধরে হেঁটে, মাচান থেকে বিশ হাত দূরে একটি শুকনো কাঠি পুঁতলেন ট্র্যাকে। তাকালেন বান্টির দিকে। বান্টি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল কাঠিটা সে দেখতে পাচ্ছে।

লেডি জোন, বাহাদুর এবং করবেট এবার চললেন চার নম্বর মাচানে। মাটি থেকে কুড়ি ফুট উঁচুতে এই মাচানটি। তিন নম্বর মাচান এটার কাছ থেকে ত্রিশ গজ দূরে। পরিষ্কার দেখা যায়। মই বেয়ে ওপরে উঠলেন করবেট লেডি জোনকে তাঁর রাইফেল দিতে। বললেন বান্টি এবং পিটার যদি গুলি করতে ব্যর্থ হয়, তিনি যেন মিস না করেন। বাঘটাকে তিন নম্বর মাচানের কাছে আসতে দেয়া যাবে না। 'যথাসাধ্য চেষ্টা করব,' বললেন জোন। 'আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না।' এদিকে ঝোপঝাড় কিছুই নেই। অল্প ক'টা গাছ শুধু ছিটিয়ে আছে এদিক-সেদিক। বাঘ তার কভার বা আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে আসার পরে এই মাচান দুটি পরিষ্কার দেখতে পাবে। করবেট আশা করলেন বান্টিরই আগে চোখে পড়বে বাঘ। সে-ই গুলি করতে পারবে। পাঁচ নম্বর মাচানে বাহাদুরকে তুলে দিলেন করবেট। ওর মাচানটা প্রয়োজনে বাধা হিসেবে কাজ করবে। করবেট বিটের বাইরে একবার চক্কর দিয়ে বোয়ার নদীতে চলে এলেন।

বিট করার জন্যে ষোলোটি হাতি জোগাড় করা হয়েছে। হাতিগুলোর দায়িত্বে আছে মোহন। করবেটের বহুদিনের পরিচিত মানুষ। ত্রিশ বছর সে উইন্ডহ্যামের হেড শিকারীর দায়িত্ব পালন করেছে। ভারতের যে কারও চেয়ে বাঘ সম্পর্কে বেশি জ্ঞান রাখে মোহন। করবেটকে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল মোহন। করবেট মাথার হ্যাট খুলে নাড়ছেন। এটা একটা সঙ্কেত। মোহন তার হাতিবাহিনী নিয়ে নদীর তীর উদ্দেশ্য করে চলতে শুরু করল। বিটের জায়গায় পৌঁছুতে সিকি মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে হবে ষোলোটি হাতিকে। একটা পাথরের ওপর বসে

ধূমপান করতে লাগলেন করবেট হাতে সময় আছে ভেবে। ভাবছেন তিনি। ভাবছেন দু'জন মানুষের জীবন বিপন্ন করে তুলতে যাচ্ছেন। ভাবনাটা অস্বস্তিতে ফেলে দিল তাঁকে। কালাধুঙ্গিতে আসার আগে লর্ড লিনলিথগো করবেটকে ছক বেঁধে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। সেই নির্দেশ ক্যাম্পের তিনশোরও বেশি মানুষ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে নিশ্চিন্তে শিকার করেছে। কারও গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। অথচ শেষ দিনে, যাঁকে সবাই বিশ্বাস করে, সেই করবেট এমন একটি কাজ করে বসেছেন যে রীতিমত অনুতাপ হচ্ছে তাঁর।

মাটি থেকে ছয় ফুট উঁচুতে, একটা পলকা মাচানের ওপর তিনি ষোলো বছরের এক কিশোরীকে উঠিয়ে দিয়েছেন। তাকে গুলি করতে বলেছেন। অথচ বাঘ সরাসরি তার ওপর হামলে পড়তে পারে। গুলি মিস হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে মেয়েটির। বান্টি এবং পিটার দু'জনেই যথেষ্ট সাহসী। তারা বিপদের তোয়াক্কা না করেই মাচানে উঠেছে। কিন্তু শুধু সাহস দিয়ে বাঘের মত প্রাণীকে হত্যা করা যায় না। এজন্যে গুলি করার দক্ষতা থাকা চাই। আর ওরা এ কাজে কেমন দক্ষ জানা নেই করবেটের। এজন্যেই ভাবনা হচ্ছে বেশি।

মোহন তার হাতির দল নিয়ে পৌঁছে গেল। করবেট তখনও ঠিক করতে পারেননি বিট চালাবেন নাকি বন্ধ করে দেবেন। কি কাণ্ড করেছেন মোহনকে বললে লোকটা আঁতকে উঠল। চোখ বন্ধ করে ফেলল সে। তারপর চোখ খুলে বলল, 'ঘাবড়াবেন না, সাহেব। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মাহুতদের ডেকে করবেট পইপই করে বলে দিলেন এমনভাবে এগোতে হবে যাতে ভয় না পায় বাঘ। আর নদীর তীরে দাঁড়াবে তারা। অপেক্ষা করবে করবেটের কাছ থেকে সঙ্কেত পাবার জন্যে। করবেট মাথা থেকে হ্যাট খুলে ফেললে তারা জোরে একটা চিৎকার দেবে। তারপর জোরে তালি বাজাতে শুরু করবে। করবেট হ্যাট মাথায় না দেয়া পর্যন্ত একভাবে তালি বাজিয়েই যাবে তারা। এভাবে একটু পরপর চলতে থাকবে। এতে কাজ না হলে অর্থাৎ বাঘ বের হয়ে না এলে করবেট হাতি বাহিনীকে এগোবার নির্দেশ দেবেন। তবে এগোতে হবে নিঃশব্দে এবং খুব ধীরে। চিৎকার করার কারণ দুটো। এক, এতে বাঘের ঘুম ভেঙে যাবে আর সতর্ক হয়ে যাবেন শিকারীরা।

জঙ্গলের একটা অংশ তিনশো গজ চওড়া এবং পাঁচশো গজ লম্বা। এই অংশটাকে বিট করার জন্যে বেছে নেয়া হয়েছে। হাতিগুলো করবেটের দু'ধারে লাইন করে দাঁড়িয়েছে, তিনি মাথা থেকে হ্যাট খুলে নিয়ে নাড়তে শুরু করলেন। জোরে একটা চিৎকার দিয়ে মাহুতের দল হাততালি দিতে লাগল। তিন চার মিনিট হাততালি চলার পরে করবেট মাথায় আবার হ্যাট পরলেন। এই এলাকায় সম্বর,

চিতল, কাকর, ময়ূর এবং বন-মোরগের বাস। করবেট কান পাতলেন কেউ সতর্ক ভঙ্গিতে ডেকে ওঠে কিনা শোনার জন্যে। কিন্তু কেউ ডাকল না। পাঁচ মিনিট পরে আবার হ্যাট তুললেন করবেট, মিনিটখানেক নাড়লেন ওটা। একটু পরে বন্দুকের গুলির আওয়াজ শোনা গেল। এর পরপর আরেকটা। তারপর আরেকটা। করবেট গুনলেন তিন···চার···পাঁচ। একটু বিরতি। তারপর আবার পরপর দুটি গুলির শব্দ। আবার এক, দুই, তিন, চার; চারটা গুলি হলো। প্রথম এবং চতুর্থ গুলি হয়েছে রাইফেলের মাজ্‌ল্‌ করবেটের দিকে ঘুরিয়ে। বাকি গুলি দুটো হয়েছে অন্য দিকে রাইফেলের মাজ্‌ল্‌ ঘুরিয়ে। এর একটাই মানে হতে পারে কোন ঝামেলা হয়েছে এবং লেডি জোনের সাহায্য দরকার। হার এক্সেলেন্সি যে মাচানে আছেন ওটা বান্টির মাচান থেকে দেখা যায় না।

ভয়ে বুকের ভেতর কলজেটা দাপাদাপি শুরু করে দিল করবেটের। হাতির মাহুত আজমতকে ডেকে বললেন গুলির শব্দ যেখান থেকে শোনা গেছে সেদিকে যেন সে যত দ্রুত পারে ছুটে যায়। আজমতও উইন্ডহ্যামের হাতে মানুষ। অকুতোভয়। তার মত মাহুত করবেট দ্বিতীয়টি দেখেননি। আজমতের হাতিও তার প্রভুর মত সুশিক্ষিত, সাহসী। ঝোপঝাড়, বড়বড় পাথর, গর্ত পেরিয়ে ছুটল আজমত হাতি নিয়ে। দুশ্চিন্তায় মুখ শুকিয়ে গেছে করবেটের। হাতিটি বারো ফুট লম্বা নল ঘাসের একটা চাপড়ার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভেতরে ঢুকতে ইতস্তত করছে। আজমত করবেটের কানে ফিসফিস করে বলল, 'ও বাঘের গন্ধ পেয়েছে, সাহেব। আপনার হাতে তো অস্ত্র নেই। তাই সাবধানে থাকুন।'

আর একশো গজ যেতে হবে। শিকারীদের কাছ থেকে কোন সঙ্কেতও আসছে না। মেয়েদেরকে রেলম্যানের হুইস্‌ল দেয়া হয়েছে। করবেট বলে দিয়েছেন বিপদে পড়লে বা সাহায্যের দরকার হলে হুইস্‌ল বাজাতে। কিন্তু হুইস্‌ল্‌ বাজছে না। এতে আরও বেশি ভয় লাগছে করবেটের। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানেন উত্তেজনা এবং ভয়ের চোটে হুইস্‌ল তো ভাল, মানুষই পড়ে যায় মাচান থেকে। এমন সময় গাছের ফাঁক দিয়ে লেডি জোনকে দেখতে পেলেন করবেট। হাঁটুতে রাইফেল রেখে নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে আছেন মাচানে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন করবেট। করবেটকে দেখে দু'হাত তুলে কি যেন ইশারা করে দেখালেন জোন। করবেট বুঝলেন জোন হাত দিয়ে বড় বাঘ বোঝাতে চাইছেন। তারপর বান্টির মাচানের দিকে ইঙ্গিত করল জোন।

এরপর গল্পটা শুনলেন করবেট। তিনি তাঁর জাঙ্গল লোর বইতে মন্তব্য করেছেন, 'ওই ঘটনা ঘটার পনেরো বছর পরে যখন ওটার কথা লিখছি, আমার হার্টের বিট মিস করছে সেদিনের কথা মনে পড়তেই। তিনজন সাহসী মানুষের দুর্দান্ত গুলি চালানোর ক্ষমতা না থাকলে সেদিন ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে যেত।'

জিম করবেটের বিট শুরু করার জন্যে চিৎকার এবং হাততালির শব্দ সবই ওই তিন শিকারী শুনতে পেয়েছে। হাততালির বিরতির সময় বাঘ বেরিয়ে এসেছিল তার কভার ছেড়ে। চলে এসেছিল তিন নম্বর মাচানের প্রায় ষাট গজের কাছাকাছি। ধীর গতিতে বাঘ চলে আসে গেম-ট্র্যাকে। ওটা নদীর তীরে পৌঁছেছে, এমন সময় আবার হাতিদের হাঁকডাক শুরু হয়ে যায়। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে বাঘ, মাথা ঘুরিয়ে তাকায়। তাড়াহুড়োর কিছু নেই ভেবে জানোয়ারটা মিনিটখানেক হাঁক ডাক শুনেছে, তারপর তীর ধরে হাঁটা দিয়েছে। ট্র্যাকের যেখানে একটা শুকনো কাঠি পুঁতে রেখে গিয়েছিলেন করবেট, বাঘ সেখানে পৌঁছানো মাত্র তাকে গুলি করে বান্টি। তবে বাঘ মাথা নিচু করে রেখেছিল বলে গলায় নয়, বুকে গুলি করেছিল। গুলি জায়গামতই লেগেছিল। তবে বান্টি বা পিটার দ্বিতীয় গুলি করার আগেই প্রচণ্ড গর্জন ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে বাঘ, ধেয়ে যায় ওদের মাচান লক্ষ্য করে। বেঁটে গাছের ওপর পলকা মাচান বিশালদেহী বাঘের হামলায় থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। যে কোন মুহূর্তে ওটা ভেঙে পড়ত। বাঘের শিকার হত বান্টি এবং পিটার। ওরা মাচানের মেঝের ফুটো দিয়ে রাইফেল তাক করার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। কিন্তু ঝাঁকুনির চোটে পারছিল না। বান্টির মাচান থেকে ত্রিশ গজ দূরে জোনের মাচান। তিনি ওখান থেকে গুলি করেন। গুলি খেয়ে পড়ে যায় বাঘ। আবার গুলি করেন জোন। দ্বিতীয় গুলি বিদ্ধ হয়ে বাঘ ছুটে পালাচ্ছিল নদীর দিকে। ঘন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু তার আগেই বান্টি বাঘটির মাথার পেছনে গুলি করে। পড়ে যায় বাঘ। আর নড়েনি।

ভাইসরয় ওই প্রথম কালাধুঙ্গি সফরে এসেছিলেন। পরে আরও কয়েকবার এসেছেন। তবে ভাইসরয় এবং তাঁর সঙ্গীদের জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে, এমন ঝুঁকি আর কোনদিন নেননি করবেট।

---

# বসন্তের দিন

হিমালয়ে নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত আবহাওয়ার সাথে কোন কিছুর তুলনা হয় না। আর এই পাঁচ মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো ফেব্রুয়ারি। ফেব্রুয়ারি মাসে বাতাস থাকে তাজা, ফুরফুরে। নভেম্বরে উঁচু উঁচু পাহাড় থেকে যে সব পাখি অভিবাসী হয়ে চলে গিয়েছিল তারা ফিরে আসে হিমালয়ের কোলে। শরৎ এবং শীতে কাবু হয়ে যাওয়া ন্যাড়া গাছের ডাল পল্লবিত হয়ে ওঠে নতুন পাতায়। ফেব্রুয়ারির বাতাস ঘোষণা করে বসন্ত আসছে। প্রতিটি গাছ ভরে ওঠে প্রাণশক্তিতে, বুনো জীবনে টগবগ করে ওঠে রক্ত। উত্তরের পাহাড় বা দক্ষিণের সমতল ভূমি, কিংবা হিমালয়ের কোল, যেখানেই বলুন, বসন্ত চলে আসে এক রাতের মধ্যে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে রাতের বেলা বিছানায় যাবেন আপনি। পরদিন ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখবেন বসন্ত দাঁড়িয়ে দুয়ারে। চারদিকে শুধু বসন্তের উচ্ছ্বাস আর আনন্দ। অভিবাসী পাখিরা দল বেঁধে কিচিরমিচির করে। এরা অন্যদের সাথেও যোগ দেয়। পাখিদের নেতৃত্বে থাকে কবুতর, প্যারাকিট (লম্বা লেজের টিয়ে) আর গায়ক পাখি থ্রাশ। ফল খেকো অন্যান্য পাখিদের নিয়ে এরা উড়ে চলে যায় উপত্যকায়, নির্ধারিত আস্তানায়। আর পোকা খেকো পাখির দল একই সময় একই দিকে যায় গাছে গাছে পোকা খেয়ে পেট ভরাতে ভরাতে। এক দিনে কয়েক মাইল রাস্তা এভাবে পার হয়ে যায় তারা। অভিবাসী পাখিরা যখন যাবার জন্যে প্রস্তুত ওই সময় হিমালয়ের কোলের পাখিরা ব্যস্ত যে যার সঙ্গী খুঁজে নিতে। সেই সাথে সন্ধান করে আস্তানা তৈরির উপযুক্ত জায়গা। বসন্তের এই সময়টাতে জঙ্গল থাকে পাখির কিচিরমিচিরে ভর্তি। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একটানা ডেকেই চলে নানা পাখির দল। কে কত জোরে ডাকতে পারে তার প্রতিযোগিতা যেন শুরু হয়ে যায়। এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় শিকারী পাখিরাও। এদের মধ্যে আছে সার্পেন্ট ঈগলও। দূরের নীল আকাশে ফুটকির মত উড়ে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তীক্ষ্ণ ডাক ছেড়ে জানান দেয় তার উপস্থিতি।

বসন্তের এক দিনে বৃটেন থেকে একদল লোক এল জিম করবেটের কাছে। বার্মা যাচ্ছে তারা। তাদের খুব খায়েশ সার্পেন্ট ঈগল দেখার। এই পাখিটিকে চাক্ষুস করার সৌভাগ্য নাকি কারোরই হয়নি। দলটাকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ফাঁকা একটা জায়গায় চলে এলেন করবেট। আঙুল তুলে আকাশের দিকে দেখালেন। একটা ফুটকি দেখা গেল চকচকে নীল আকাশের গায়ে। কিন্তু ফিল্ড গ্লাস চোখে

লাগিয়েও ফুটকিটাকে ভালভাবে দেখতে পেল না অভিযাত্রীরা। তাঁদেরকে স্থির হয়ে থাকতে বলে পকেট থেকে তিন ইঞ্চি লম্বা একটি নলখাগড়ার বাঁশি বের করলেন করবেট। ফুঁ দিলেন ওতে। বাঁশিটির এক মাথা বন্ধ, অন্য মাথা খোলা। বাঁশি থেকে হরিণের ডাক বেরিয়ে এল। বিপদে পড়লে হরিণ এভাবে ডাকে। তীক্ষ্ণ ডাক শুনতে পেল আকাশে ভেসে বেড়ানো সার্পেন্ট ঈগল। সাপ খায় বলে এদের নাম সার্পেন্ট ঈগল বা সাপ-খেকো ঈগল। তবে বাচ্চা হরিণের মাংসেও তাদের অরুচি নেই। ডানা মুড়ে ঝাঁপ দিল সে।

সাঁ করে নেমে এল একশো ফুট নিচে। তারপর বৃত্তাকারে আবার উঠতে লাগল উঁচুতে। তবে করবেটের প্রতি বার বাঁশির ফুঁয়ে কাছিয়ে এল সে, এক সময় গাছের মগডাল বরাবর চক্কর দিতে শুরু করল। ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা গেল সার্পেন্ট ঈগলকে। শখ মিটল বৃটিশ অভিযাত্রীদের।

জিম করবেটদের বাড়ির উত্তর বাউন্ডারির দিকে একটি খাল আছে। মেয়েরা ওই খালে গোসল করে। ওখানে ছিল একটি কৃত্রিম নালা। নালাটি খনন করেছিলেন স্যার হেনরী রামসে। তবে বহু বছর আগে বজ্রপাতে ধ্বংস হয়ে যায় নালাটি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্থানীয় লোকজনের বিশ্বাস ছিল শয়তানী শক্তি সাপের রূপ ধরে ধ্বংস করেছে নালাটা। তারপর থেকে ওই নালা আর কেউ ব্যবহার করে না। তবে একই রকম আরেকটি নালা খনন করা হয় অর্ধ শতাব্দী আগে। জঙ্গল থেকে রাতের বেলা যে সব প্রাণী বেরিয়ে আসে গ্রামে যাবার উদ্দেশে, এদের অনেকেরই দশ ফুট চওড়া খালটি লাফ মেরে পার হবার ব্যাপারে অনীহা রয়েছে। তখন কৃত্রিম নালাটির পাশ ধরে যায়। বসন্তের এক সকালে এই নালার ধার ঘেঁষেই ব্রিটিশ দলটিকে নিয়ে নতুন অভিযাত্রা শুরু হলো জিম করবেটের।

নালার পাশের বালু মিশ্রিত রাস্তায় খরগোশ, কাকর, শুয়োর, শজারু, হায়েনা এবং শেয়ালের পায়ের ছাপ পরিষ্কার ফুটে থাকে। নালা ছেড়ে কয়েকশো গজ গেলে খালের পাথুরে বেড চোখে পড়ে। খালের ওপর দিয়ে চলে গেছে একটি গেম ট্র্যাক। গেম ট্র্যাক ছাড়িয়ে যাবার পরে পলি মাটির লম্বা একটি রাস্তা, বেরিয়ে এসেছে পাহাড় থেকে। এই রাস্তার দু'পাশে ঘন ল্যানটানার ঝোপ। দিনের বেলায় এই ঝোপে বিচরণ করে হরিণ, শুয়োর, ময়ূর আর বনমোরগের দল। রাতের বেলা ওখানে যায় চিতা, বাঘ এবং শজারুরা। ল্যানটানার ঝোপ থেকে ভেসে আসে বনমোরগের মরা পাতা আঁচড়ানোর খসখস শব্দ। ওখান থেকে শ'খানেক গজ দূরে, পাতাশূন্য সামাল গাছের মগডালে বসে থাকে বনমোরগের ভয়ংকরতম শত্রু ঝুঁটিওয়ালা ঈগল। শুধু বনমোরগ নয়। ময়ূরেরও বড় শত্রু এই ঈগল। ঝুঁটিওয়ালা ঈগল সুযোগ পেলে চিতল হরিণের বাচ্চাও ছিনতাই করে নিয়ে যায় তার মা'র কাছ থেকে। ভয়ানক শক্ত, ধারাল ঠোঁট এবং নখ দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে

মাথা। বার্মাগামী অভিযাত্রীদের ঝুঁটিওয়ালা ঈগল দেখার খায়েশ ছিল। সে খায়েশও পূরণ করলেন করবেট।

ঝুঁটিওয়ালা ঈগল খুব হিংস্র প্রকৃতির হয়। করবেট ছেলেবেলায় একবার দেখেছিলেন একটি ঝুঁটিওয়ালা ঈগল খরগোশ ভেবে ভুল করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল একটি মেছো বেড়ালের ওপর। এরপরে দু'জনে রীতিমত লড়াই শুরু হয়ে যায়। দুই প্রতিপক্ষই ধারাল অস্ত্রে সজ্জিত। মেছো বেড়ালের আছে দাঁত এবং থাবা, ঈগলের প্রচণ্ড শক্ত ঠোঁট এবং ধারাল নখ। করবেট খুব আফসোস করেছিলেন ওই সময় তঁর কাছে কোন ক্যামেরা ছিল না বলে। ছবি তুলতে মানুষকে তখন যেতে হত স্টুডিওতে। আর মুভি ক্যামেরার নাম লোকে শোনেইনি। করবেটের কাছে ক্যামেরা থাকলে দুর্দান্ত একটি লড়াইয়ের দৃশ্য তুলে রাখতে পারতেন তিনি। মেছো বেড়াল আর ঈগলের মারামারি দেখে করবেটের মনে হয়েছিল, বেড়ালের যদি নয়টা জীবন থাকে তো ঈগলের রয়েছে দশটা। ওই লড়াইতে সেদিন জিতে গিয়েছিল ঝুঁটিওয়ালা ঈগল। বেড়ালটাকে মেরে ফেলেছিল ঈগল। তারপর ভাঙা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে নদীতে গিয়েছিল পানি খেতে। ওখানে তার দশম জীবনের অবসান ঘটে। পানি খাওয়ার পর পরই মারা যায় ঈগলটা।

ল্যানটানার ঝোপ থেকে বেশ কয়েকটি গেম-ট্র্যাক বেরিয়ে গেছে খোলা জমিনের দিকে। ঝুঁটিওয়ালা ঈগলটাকে দেখছেন করবেটেরা, চোখে পড়ল অল্প বয়েসী একটি পুরুষ কাকর ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসছে। পঞ্চাশ গজ দূরের খালের দিকে পা বাড়াল ওটা। করবেটদেরকে খেয়াল করল না। তবে সতর্ক। বিপদের আশঙ্কা টের পেলেই ঝেড়ে দৌড় দেবে। কাকরকে অনেকেই ভীতু প্রাণী বলে। তবে করবেট কাকরদের ভীতু মনে করেন না। এদের ওপরের চোয়ালে দুটি লম্বা শ্বদন্ত আছে। হাতির দাঁতের মত। দাঁত জোড়া খুবই ধারাল। নিরীহ কাকরের আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র। এদের ছোট ছোট শিং ভেতরের দিকে বাঁকানো বলে আত্মরক্ষায় তেমন কাজে লাগে না। শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শ্বদন্ত জোড়াই একমাত্র ভরসা।

ঝুঁটিওয়ালা ঈগলটা কাকরটার ওপর হামলা চালাবে ভেবে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলেন করবেটেরা। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। নিরাপদেই খাল পার হয়ে গেল কাকর।

সারাটা দিন সঙ্গীদের নিয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেন জিম করবেট। জঙ্গলের বসন্ত উপভোগ করল বৃটিশরা। প্রাণভরে দেখল বিচিত্র বর্ণের নানা পাখি আর পশুদের। তারপর সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে চলল নিজেদের আস্তানায়।

---

# ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়

জঙ্গলের বিদ্যা হজম করতে পারলে একটি ইন্দ্রিয়ের উন্নয়ন ঘটে যা আদিম মানুষের কাছ থেকে পেয়েছি আমরা—তার নাম ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। এ ইন্দ্রিয় শক্তিশালী হয়ে ওঠে জঙ্গলের বুনো জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার সুযোগ থাকলে। আসন্ন বিপদ সম্পর্কে অবচেতন মনই তখন সাবধান করে দেয়।

অনেকের মধ্যেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে অবচেতন ভাবেই, বেশির ভাগ সময় মানুষ বুঝতেই পারে না আসন্ন বিপদ সম্পর্কে তাকে সচেতন করে দিয়েছে অবচেতন মন। রাস্তায় হাঁটছেন আপনি, ওই রাস্তা ছেড়ে চলে আসার পরপরই বোমা ফাটল ওখানে; কিংবা শেলের আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেল কোন বিল্ডিং যেখান থেকে এক মুহূর্ত আগে বেরিয়ে এসেছেন আপনি। অথবা বৃষ্টির জন্যে আশ্রয় নিয়েছেন গাছের নিচে, আশ্রয় ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন, প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হলো গাছের মাথায়, পুড়িয়ে দিল ওটাকে। অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেলেন আপনি।

এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় অজানা কোন কারণে খুঁতখুঁত করেছে মন তাই হয়তো শেল পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে বিল্ডিং ছেড়ে চলে এসেছেন আপনি। বিপদটা যে ধরনেরই হোক না কেন, অবচেতন মন সাবধান করে দেয় আগেভাগে। আর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাবধানতার কারণে প্রাণে বেঁচে যান আপনি। চোগড়ের মানুষ খেকো বাঘের কবল থেকে জিম করবেট দু'বার প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কারণেই। অবচেতন মনের সাবধান বাণী বিশ্বখ্যাত শিকারীটিকে কিভাবে অপ্রত্যাশিত এক বিপদ থেকে রক্ষা করেছিল নিচের ঘটনা তার অন্যতম প্রমাণ।

শীতের সময় জিম করবেটের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল গ্রামবাসীদের জন্য সম্বর কিংবা চিতল হরিণ শিকার করে আনা। এক বিকেলে গ্রামের এক প্রতিনিধি এসে করবেটকে মনে করিয়ে দিল বেশ কিছুদিন ধরে তিনি কোন শিকার করছেন না। লোকটা জানাল পরদিন গ্রামে স্থানীয় উৎসব হবে। অনুরোধ করল করবেট সাহেব যেন তাদের জন্যে একটা চিতল শিকার করে আনেন। ওই সময় জঙ্গল ছিল অত্যন্ত শুকনো, পায়ের ছাপ খুঁজে শিকার করা বেশ কঠিন। তবে সূর্য অস্ত যাবার আগেই একটা হরিণ শিকার করতে পারলেন করবেট। রাত হয়ে আসছে। হরিণটাকে এখন বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় ভেবে ওটাকে লুকিয়ে রাখলেন যাতে

চিতা, ভল্লুক বা শুয়োরের চোখে না পড়ে। তারপর বাড়ির পথ ধরলেন তিনি। কাল সকাল সকাল লোকজনসহ আসবেন, হরিণটাকে গ্রামে নিয়ে যাবেন।

গ্রামবাসী শুনতে পেয়েছিল বন্দুকের আওয়াজ। করবেট বাড়ি ফিরে দেখলেন তাঁর দাওয়ায় জনাদশেক লোক বসে আছে হাতে রশি আর বাঁশের শক্ত খুঁটি নিয়ে। ওদের প্রশ্নের জবাবে করবেট জানালেন তিনি গ্রামবাসীর পছন্দ মত একটা হরিণ শিকার করেছেন, পরদিন সকালে ওরা যদি তাঁর সঙ্গে গ্রামের ফটকের ধারে দেখা করে তিনি ওদেরকে লুকিয়ে রাখা হরিণটার কাছে নিয়ে যাবেন। কিন্তু লোকগুলো ওই রাত্তিরেই হরিণ নিয়ে যেতে চায়। সেরকম প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে তারা। করবেট সাহেব হরিণ কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন জানালে তারা নিজেরাই ওটাকে খুঁজে বের করে নেবে। জিম করবেটের মত গ্রামবাসীও জঙ্গল খুব ভাল চেনে। এর আগে ওদের জন্যে যখনই হরিণ শিকার করেছেন তিনি, একটা ট্রেইল রেখে এসেছেন। ফায়ার-ট্র্যাক, গেম-পাথ কিংবা গরু-বাছুরদের চরার পথে রেখে আসা চিহ্ন ধরে এগিয়ে তারা করবেটের ট্রেইলে পৌঁছে যেত। এভাবে লুকিয়ে রাখা শিকার খুঁজে পেতে তারা কখনও ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু আজ সাঁঝের দিকে হরিণ শিকার করেছেন করবেট, আকাশে চাঁদ ওঠেনি বলে কোন ট্রেইলও রেখে আসতে পারেননি। অথচ গ্রামবাসী আজকেই শিকারটা পেতে চাইছে কারণ কাল তাদের ভোজের উৎসব। রাতেই সব প্রস্তুতি সেরে রাখতে চায় তারা। ওদেরকে হতাশ করতে মন চাইল না করবেটের। নির্দেশ দিলেন আড়াই মাইল দূরে পোয়ালগড় ফায়ার-ট্র্যাকে গিয়ে প্রাচীন হালদু গাছটার নিচে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে। হালদু গাছের ল্যান্ডমার্ক সবার চেনা। লোকগুলো চলে যাবার পরে তাদের ম্যাগীর নিয়ে আসা চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়ালেন জিম করবেট।

দল বেঁধে যাবার চেয়ে একা এগোলে অনেক দ্রুত যাওয়া যায়। তাই ধীরে সুস্থে চা পান করলেন করবেট, রাইফেল হাতে যখন রওনা হলেন ততক্ষণে রাত নেমে গেছে। কিছুক্ষণ আগে আড়াই মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে এসেছেন তিনি। কিন্তু হাঁটাহাঁটির অভ্যাস আছে বলে পাঁচ/ছয় মাইল রাস্তা করবেটের জন্যে কিছু নয়। গ্রামবাসী অনেক দূর চলে গিয়েছিল। তবে ওরা হালদু গাছের ধারে পৌঁছাবার আগেই ওদেরকে ধরে ফেললেন তিনি। হরিণটাকে খুঁজে পেতে কষ্ট হলো না। জানোয়ারটাকে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে নেয়ার পরে শর্টকাট রাস্তা ধরে গ্রামে ফিরে এলেন করবেট। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সময় হয়ে গেল ডিনারের। ম্যাগীকে ডেকে খাবার দিতে বললেন করবেট। গোসল করার জন্যে ঢুকলেন বাথরুমে।

গোসলের জন্যে জামা-কাপড় খুলছেন, চোখ আটকে গেল হালকা রাবার-সোলের জুতোতে। লালচে ধুলোয় মাখামাখি জুতো, পায়েও লেগেছে। যেন শুকিয়ে আছে রক্ত। পা কেটে বা ছড়ে যায়নি করবেটের। তাহলে শুকনো রক্তের মত এ

জিনিসে পা ভরে গেল কিভাবে? ঘটনা কি তা নিয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি।

পুরানো ট্রাঙ্ক রোডটা চলে গেছে পাহাড়ের দিকে। কাথগোডাম রেলওয়ের আগে রাস্তাটা। করবেটদের বাড়ির ফটকের সামনে দিয়ে বোয়ার ব্রিজ পর্যন্ত সটান রাস্তাটার বিস্তৃতি। ব্রিজ ছাড়িয়ে তিনশো গজ দূরে ট্রাঙ্ক রোড মোড় নিয়েছে বামে। মোড়ের ডান দিকে পোয়ালগড় ফায়ার-ট্র্যাক, তার কয়েকশো গজ পরে পোয়ালগড় মোটর রোড। বোয়ার সেতুর পঞ্চাশ গজ দূরে ট্রাঙ্ক রোড ডান দিকে মিলিত হয়েছে উত্তরের কোটা রোডের সঙ্গে। এই দুই রাস্তার সংযোগস্থলে এবং বাঁকে, রাস্তাটা চলে গেছে অগভীর একটা নিচু জায়গা বা খাত দিয়ে। ওই খাত বা গর্তের লাল মাটি গরুর গাড়ি চলার সময় চাকার সাথে উঠে আসে, রাস্তার এখানটাতে সৃষ্টি করেছে ছয় ইঞ্চি গভীর ধুলোর নদী। ধুলো এড়াতে পায়ে হাঁটা লোকজন ধুলোময় রাস্তা আর জঙ্গলের বাম দিকে মাঝখানে সরু আরেকটা পথ ব্যবহার করে। বাঁকে ত্রিশ গজের কাছে, রাস্তা এবং সরু পথটা চলে গেছে একটা ছোট কালভার্টের ওপর দিয়ে। কালভার্টের পাশে ফুটখানেক গভীর, আঠারো ইঞ্চি উঁচু নিচু একটা পাঁচিল আছে গরু বা মোষের গাড়ি যাতে পিছলে কালভার্ট থেকে পড়ে না যায় সে জন্যে। তবে কালভার্টটা বহুদিন কেউ ব্যবহার করে না। এটার নিম্ন প্রান্তর অর্থাৎ সরু ফুটপাথের শেষ সীমানার কাছে রাস্তার সাথে সমান উচ্চতায় দশ ফিট চওড়া একটা বালুর বেড আছে।

জিম করবেটের মনে পড়ে গেল চা খেয়ে গ্রামবাসীদের সাথে যোগ দেয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়ে তিনি সরু ফুটপাথ এবং কালভার্টের ধার ঘেঁষে কয়েক কদম রাস্তা হেঁটেছেন; বাম থেকে ডানে রাস্তা পার হয়েছেন ছয় ইঞ্চি গভীর ধুলো মাড়িয়েই; রাস্তার ডান দিক দিয়ে হেঁটেছেন এবং কালভার্ট পার হবার পরে রাস্তাটা আবার ক্রস করেছেন, এগিয়েছেন ফুটপাথ ধরে। কিন্তু এমন কাজ কেন করতে গেলেন করবেট? বাড়ি থেকে বেরুবার পরে, হালদু গাছের নিচে লোকগুলোর সাথে মিলিত হবার সময় এমন কোন শব্দ শোনেননি যা তাঁর মনে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে কিংবা অস্বস্তি জাগিয়ে তুলতে পারে। অস্বাভাবিক কোন দৃশ্যও তাঁর চোখে পড়েনি। অবশ্য ঘোর অন্ধকার ছিল রাস্তায়। কিছু চোখে পড়ার কথাও নয়। তাহলে রাস্তা পার হয়ে, কালভার্ট হয়ে আসার পরে আবার ওটার ক্রস করতে গেলেন কেন?

এ বইতে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ডানসে'র পেত্নীর বাঁশি রহস্য উদ্‌ঘাটন করার পরে করবেটের নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল জঙ্গলে অস্বাভাবিক কিছু ঘটলেই সে রহস্যের সমাধানের জন্যে এগিয়ে যেতেন। তো এবারের ব্যাপারটাও তাঁর কাছে অস্বাভাবিক মনে হওয়ায় পরদিন খুব সকালে ওই রাস্তায় চলে এলেন তিনি। ঘটনাটার একটা যুৎসই ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর মন খচখচ করতেই থাকবে।

আগের দিন সন্ধ্যায় করবেটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে এগিয়েছিল গ্রামবাসী, গ্রামের ফটকে আরও তিনজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাদের। সব মিলে লোক সংখ্যা দাঁড়ায় তের/চোদ্দজনে। বোয়ার সেতু পার হয়ে দলটা ফুটপাথ ধরে এগিয়ে যায়, পার হয় কালভার্ট, রাস্তার বাম থেকে ডানে চলে যায়, এগোতে থাকে ফায়ার-ট্র্যাক ধরে। এর খানিক পরে একটা বাঘ আসে কোটা রোডে, দুই রাস্তার মোহনায়, একটা ঝোপের কাছে মাটিতে থাবা দিয়ে মাটি আঁচড়ায়, পার হয় ট্রাঙ্ক রোড, এগিয়ে যায় ফুটপাথ ধরে। এখানে গ্রামবাসীর পায়ের ছাপের ওপর বাঘের পায়ের ছাপ ফুটেছিল। বাঘ যখন ফুটপাথ ধরে ত্রিশ গজ রাস্তা এগিয়েছে, ওই সময় সেতুর ধারে চলে আসেন করবেট।

লোহার তৈরি সেতু পার হবার সময় করবেটের পায়ের শব্দ নিশ্চয় শুনতে পেয়েছিল বাঘ। কারণ করবেট দ্রুত হাঁটছিলেন, নিঃশব্দে এগোবার প্রয়োজনও বোধ করেননি। বাঘ যখন দেখে করবেট কোটা রোডে যাচ্ছেন না, এগোচ্ছেন তার দিকে, দ্রুত ফুটপাথ ধরে এগিয়ে, কালভার্টের কাছে, বালুর বেডের ওপর শুয়ে পড়ে সে। ফুটপাথ থেকে তার দূরত্ব তখন ছিল মাত্র এক গজ। করবেটও ফুটপাথ ধরে এগোচ্ছিলেন, কিন্তু তবে কালভার্টের পাঁচ গজের মধ্যে আসতে তিনি মোড় নেন ডান দিকে, রাস্তা পার হন ছয় ইঞ্চি গভীর ধুলো পেরিয়ে, রাস্তার ডান দিক ধরে চলতে থাকেন। তারপর কালভার্ট পেরিয়ে ফুটপাথের সাথে লাগোয়া রাস্তা আবার ক্রস করেন। এ কাজটা তিনি করেছেন অবচেতন মনে, বাঘের সামনে পড়ে যাননি এ কারণেই।

তবে করবেটের ধারণা, তিনি ফুটপাথ ধরে সোজা চললেও বাঘের সামনে থেকে নিরাপদেই রাস্তা পার হতে পারতেন। কারণ—(ক) তিনি সোজা এগোচ্ছিলেন, (খ) হাঁটার সময় গলা দিয়ে কোন রকম শব্দ করেননি, (গ) ভীতিকর কোন আচরণও করেননি। করবেটকে হত্যার কোন ইচ্ছে ছিল না বাঘের। তবে ওটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় যদি তিনি থেমে দাঁড়াতেন জঙ্গলের কোন শব্দ শোনার জন্যে কিংবা কাশি দিতেন অথবা নাক ঝাড়তেন কিংবা রাইফেলটা এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধে তুলে নিতেন, বাঘ ভয় পেয়ে গিয়ে তাঁকে হামলা করে বসতে পারত। করবেটের অবচেতন মন তাঁকে এ ধরনের ঝুঁকি নিতে বাধা দিয়েছে, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বাঁচিয়ে দিয়েছে আসন্ন বিপদ থেকে।

জিম করবেট তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সতর্কতার জন্যে এভাবে বহুবার জঙ্গলের নানা বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে তিনি অভিহিত করেছেন তাঁর 'গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল' বলে। যে দেবদূত তাঁকে অসংখ্যবার জীবনের নিরাপত্তা দিয়েছে।

***

# লোটি ও লিসা

## মূলঃ এরিখ কেস্টনার

## রূপান্তরঃ এ. টি. এম. শামসুদ্দীন

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯২

## এক

তোমরা বোরলেকেন চেন? ঐ যে, পাহাড়ের মধ্যে লেক বোরেনের তীরে ঐ গ্রামটা। চেন না? বড় অদ্ভুত ব্যাপার তো! যাকে জিজ্ঞেস করি সে-ই দেখা যায় চেনে না। হয়ত যাদের জিজ্ঞেস করি না তারাই শুধু চেনে। আশ্চর্যের কিছু নেই এতে। এরকমই হয়।

তা—লেক বোরেনের তীরে বোরলেকেন গ্রাম না চিনলে তোমাদের জানার কথা নয় যে ওখানে একটা ছুটি-নিবাস আছে। ছোট্ট মেয়েদের বিখ্যাত ছুটি-নিবাস। কি দুঃখের কথা, তোমরা জান না। কিন্তু এ নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই। ছোটদের ছুটি-নিবাসগুলো সবই এক রকম। একটা কেমন জানলে সবগুলোকেই জানা হয়ে যায়। কোন ছুটি-নিবাসের সামনে দিয়ে গেলে মনে হতে পারে ওটা এক মস্ত বড় মৌচাক। মৌমাছিদের গুঞ্জনের মত চেঁচামেচি, হাসি, ফিসফিসানির শব্দ আসবে কানে। এই হলিডে-হোম বা ছুটি-নিবাসগুলো হচ্ছে সুখের আর আনন্দ-ফুর্তির মৌচাক।

সন্ধের দিকে অবশ্য একেক সময় 'বাড়ির জন্য মন কেমন করার' গোমড়ামুখো বামনটা এসে বসে ছোট্টমণিদের বিছানায়। পকেট থেকে তার ধূসর রঙের নোট বইটা আর পেন্সিলটা বের করে নেয়। গোমড়া মুখে বসে বসে হিসেব করতে থাকে চারদিকে ক'টা চোখে অশ্রু জমেছে, ক'ফোঁটা অশ্রু ঝরল, ক'ফোঁটা ঝরেনি।

কিন্তু পরদিন সকালে সব হাওয়া! বামনটি অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন শোনা যায় দুধের পেয়ালার টুংটাং, কচিকণ্ঠের কল-কাকলি। তারপর স্নানের পোশাক পরে ঝাঁকে ঝাঁকে ওরা ছুটে যায় লেকের শীতল বোতল-সবুজ পানির দিকে। ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝপাস ঝপাস করে। পানি ছিটায়, চিৎকার-চেঁচামেচি করে। ডুব দেয়। সাঁতার কাটে। কিংবা, অন্তত সাঁতারের ভান করে।

এরকমই ঘটে বোরলেকেন-এ। আমার গল্পটা ওখানেই শুরু হচ্ছে। গল্পটা একটু জটিল বটে। কি ঘটছে তার হদিস রাখতে হলে মাঝেমধ্যে তোমাদেরকে একটু

সতর্ক মনোযোগ দিতে হবে। নইলে খেই হারিয়ে ফেলবে। শুরুটা এগিয়ে গেছে সোজা-সরলভাবে। জটিল হয়ে উঠেছে পরের দিকে। জটিল এবং উত্তেজনাকর।

এখন ওরা গোসল করছে লেক এ। বরাবরের মতই, সবচেয়ে বেশি দুষ্টুমি আর হইচই করছে দশ-এগার বছরের একটি মেয়ে। কোঁকড়ানো চুলে ঢাকা ওর মাথাটায় রাজ্যের সব দুষ্টুমি বুদ্ধি। নামটা ওর লিসা-লিসা প্যালফি। ভিয়েনা থেকে এসেছে।

ঘণ্টা বেজে উঠল হাউসে। এক, দুই, তিন। ছোট্ট মেয়েরা এবং ওদের তরুণী সাহায্যকারীরা তাড়াতাড়ি করে উঠে পড়ল তীরে।

'সবাইকে উঠতে হবে,' বললেন মিস উলরিকা। 'তোমাকেও, লিসা।'

'আসছি,' চেঁচিয়ে বলল লিসা। 'আমার তো আর জেট-প্রপেলার নেই!' তার পরে লিসাও উঠে এল।

মিস উলরিকা তাঁর হাঁসের মত প্যাঁকপ্যাঁক করা মেয়ের ঝাঁকটিকে খোঁয়াড়ে—মাফ কর, মানে—হাউসে ঢোকালেন। কাঁটায় কাঁটায় বেলা বারটায় লাঞ্চ খেল ওরা। তার পরে আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগল বিকেলের জন্য। কেন?

বিকেলে বিশজন নতুন মেয়ে আসছে। বিশটি ছোট্ট মেয়ে আসছে দক্ষিণ জার্মানী থেকে। ওরা পুতুলের মত সেজেগুজে আসবে? ক'জন বাচাল থাকবে ওদের মধ্যে? তের-চোদ্দ বছরের বুড়ি-ধাড়ি নয় তো ওরা? সুন্দর খেলনা-টেলনা আনবে তো? ভাগ্য ভাল হলে তাদের কাছে হয়ত একটা বড় রবারের বল থাকবে। ট্রুডিরটা ফুটো হয়ে গেছে। বাতাস থাকে না ভেতরে। ব্রিজিতের একটা ছিল। কিন্তু সে ওটা বের করবে না। লকারে বন্ধ করে তালা মেরে রেখেছে। যদি চুরি যায়—এই ভয়ে। ওরকম ঘটনাও ঘটে।

বিকেল হতেই লিসা, ট্রুডি, ব্রিজিত এবং অন্যরা গিয়ে দাঁড়াল প্রকাণ্ড, খোলা লোহার গেটে। অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল বাসের জন্য। কারণ, কাছের রেল-স্টেশন থেকে বাসেই আসবে নতুন মেয়েগুলো। অবশ্য, ট্রেন যদি সময় মত এসে থাকে।

গাড়ির হর্ন শোনা গেল। 'ওরা আসছে!' দ্রুত গতিতে এসে সাবধানে গেট-এর ভেতরে ঢুকে থেমে গেল বাসটি। ড্রাইভারটি নামল। একটা একটা করে ছোট্ট মেয়েগুলোকে তুলে নামাল বাস থেকে। নামাল কেবল মেয়েদেরকে নয়—ট্রাঙ্ক, বাক্স, পুতুল, ঝুড়ি, কাগজের ব্যাগ, উলের কুকুর, পোটলা-পুঁটলি, ছাতা, থার্মোফ্লাস্ক, বর্ষাতি, রাকস্যাক, কম্বল, ছবির বই, প্রজাপতি ধরার নেট—আরও কত কি।

অবশেষে বিশ জনের শেষ মেয়েটি ওর জিনিসপত্র সহ এসে দাঁড়াল বাসের দরজার মুখে। গম্ভীর লাজুক মেয়েটি। ড্রাইভার হাত বাড়াল।

মাথা ঝাঁকিয়ে অনিচ্ছা জানাল মেয়েটি। পেছনের বেণি দু'টো লাফিয়ে উঠল।

'না, ধন্যবাদ,' বলল মেয়েটি, দৃঢ় অথচ নম্রভাবে। তারপর নেমে গেল সিঁড়িতে পা রেখে শান্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে। লাজুক হাসি হেসে তাকাল চারদিকে এবং হঠাৎ চোখ দু'টো তার বড় বড় হয়ে গেল বিস্ময়ে। লিসাকে দেখেছে ও। লিসার চোখও বিস্ফারিত হল নতুন মেয়েটির মুখ দেখে।

অন্য মেয়েরা এবং মিস উলরিকা বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল একবার এর দিকে একবার ওর দিকে। ড্রাইভারটি টুপি পেছনে ঠেলে মাথা চুলকাতে লাগল মুখটা হাঁ করে। কিন্তু কেন?

লিসা আর নতুন মেয়েটি একে অপরের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। সত্য বটে একজনের মাথায় কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুল, অন্যের চুলগুলো শক্ত বিনুনিতে বাঁধা। কিন্তু দু'জনের মধ্যে পার্থক্য শুধু এটুকুই!

লিসা ঘুরে ছুটল বাগানের দিকে। যেন সিংহ আর বাঘ তাড়া করেছে ওকে।

'লিসা!' ডাকলেন মিস উলরিকা। 'লিসা!' লিসা শুনল না। তিনি শ্রাগ করে বিশজন নতুন মেয়েকে নিয়ে চললেন হাউসে। সবার পেছনে চলল অনিশ্চিত এবং অত্যন্ত বিস্মিত বিনুনিঅলা মেয়েটি।

হলিডে-হোমের প্রধান সুপারভাইজার মিসেস মুটেসিয়াস তাঁর অফিসে বসে বাবুর্চির সাথে পরবর্তী কয়েকদিনের রান্নার বিষয়ে আলাপ করছিলেন।

দরজায় ঘা পড়ল। মিস উলরিকা এসে জানালেন যে নতুন মেয়েরা নিরাপদে এসে পৌঁচেছে।

'খুব ভাল। ধন্যবাদ।'

'আরেকটা কথা আছে...'

'বলুন?'

'কথাটা লিসা প্যালফির ব্যাপারে,' বললেন মিস উলরিকা। 'সে দরজার বাইরে অপেক্ষা করছে।'

'নিয়ে আসুন ছোট্ট বাঁদরটাকে,' বললেন মিসেস মুটেসিয়াস হাসি চাপতে চাপতে। 'আবার কি দুষ্টুমি করল সে?'

'কিছু না,' বললেন মিস উলরিকা। 'শুধু...'

সাবধানে দরজাটা খুলে ডাকলেন তিনি, 'এস, দু'জনই এস! ভয় পেয়ো না!'

মেয়ে দু'টি ঘরে এল। দাঁড়াল নিজেদের মধ্যে বেশ দূরত্ব রেখে।

'ঈশ্বর বাঁচাক আমাকে,' বলে উঠল বাবুর্চি দারুণ বিস্ময়ে।

মিসেস মুটেসিয়াস বিভ্রান্ত হয়ে শুধু তাকিয়ে রইলেন মেয়ে দু'টির দিকে। মিস উলরিকা বললেন, 'নতুন মেয়েটির নাম লোটি হর্ন। এসেছে মিউনিক থেকে।'

'তোমরা কি পরস্পরের আত্মীয়?'

দু'জনেই দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করল মাথা ঝাঁকিয়ে।

'আজকের আগে ওরা একে অন্যকে চোখেও দেখেনি কোনদিন। আশ্চর্য কাণ্ড, না?' বললেন মিস উলরিকা।

'আশ্চর্যের কি আছে এতে?' প্রশ্ন করল বাবুর্চি। একজনের বাড়ি মিউনিকে, অন্যজনের ভিয়েনায়। দেখা হবে কেমন করে?'

বন্ধুত্বের সুরে মিসেস মুটেসিয়াস বললেন, 'যাদের চেহারায় এত মিল ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব হবেই। অমন আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এস, হাতে হাত মেলাও দু'জনে।'

'না,' বলে চেঁচিয়ে উঠে হাত দু'টি পেছনে লুকাল লিসা।

মিসেস মুটেসিয়াস শ্রাগ করলেন। ভাবলেন মিনিট খানেক। তারপর বললেন, 'তোমরা যেতে পার।'

লিসা ছুটে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। লোটি নত হয়ে সেলাম জানিয়ে ঘুরে দাঁড়াল যাবার জন্য।

'একটু দাঁড়াও লোটি,' বললেন মিসেস মুটেসিয়াস। একটা খাতা খুললেন তিনি। 'তোমার নামটা এখুনি লিখে ফেলি। কোথায় জন্ম হয়েছে তোমার, কখন? মা-বাবার নাম কি?'

'আমার কেবল মা আছেন,' বলল লোটি নরম সুরে।

দোয়াতে কলম ডুবিয়ে মিসেস মুটেসিয়াস জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রথমে জন্মের তারিখটা বল।'

করিডর দিয়ে হেঁটে সিঁড়ি বেয়ে উঠল লোটি। দরজা খুলে ঢুকল লকার-রুমে। ওর ট্রাঙ্ক থেকে মালপত্র বের করা হয়নি। সে তার কাপড়-চোপড় নির্দিষ্ট লকারে রাখতে লাগল। খোলা জানালা দিয়ে দূর থেকে ওর কানে আসছে বাচ্চাদের হাসির শব্দ।

লোটির হাতে এক তরুণী মহিলার ছবি। মমতা ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে ছবিটাকে সে সযত্নে রেখে দিল একটা জামার ভেতরে। লকার বন্ধ করতে গিয়ে ওর নজর পড়ল দরজার ভেতর দিয়ে লাগানো একটা আয়নার ওপর। নিজের মুখটা সে দেখল খুঁটিয়ে। তারপর হঠাৎ খেয়ালবশে বেণিগুলো খুলে চুলগুলোকে মাথার

ওপর সাজাল লিসার মত করে।

কোথায় দড়াম করে একটা দরজা বন্ধ হল। লোটি হাত দুটো এমনভাবে নামিয়ে ফেলল মাথা থেকে, যেন কোন খারাপ কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

লিসা বসেছিল বাগানের দেয়ালের ওপর বন্ধুদের সঙ্গে, বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে।

ট্রুডি, ভিয়েনার স্কুলসাথী, বলল, 'আমি হলে এটা সহ্য করতাম না। কি সাহস—তোর মুখ নিয়ে এখানে আসা!'

'আমি কি করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল লিসা ক্রুদ্ধভাবে।

মনিকা বলল, 'ওর মুখটা আঁচড়ে দে।'

ক্রিস্টাইন পরামর্শ দিল, 'সবচেয়ে ভাল হয় ওর নাকটা কামড়ে তুলে নিলে। তাহলে তোর ঝামেলা একেবারেই মিটে যাবে!' বলে নিশ্চিন্তে পা দোলাতে লাগল সে।

'এভাবে আমার ছুটিটা বরবাদ করে দেয়া!' রাগে গরগর করতে করতে বলল লিসা।

'কিন্তু ওর দোষ কি?' বলল গোলগালমুখো স্টেফি। 'আমার চেহারার কেউ যদি এসে হাজির হয়, আমি···'

হেসে ফেলল ট্রুডি। 'তুই নিশ্চয় ভাবিস না যে তোর চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়াবার মত মোটা বুদ্ধি কারও মগজে ঢুকবে!'

স্টেফি রেগে গেল মনে মনে। অন্যেরা হেসে উঠল হো হো করে। এমনকি লিসার মুখেও হাসি ফুটল একটুখানি।

এমন সময় ঘণ্টা বাজল।

'খাবার সময় হল বন্য পশুদের,' চেঁচিয়ে উঠল ক্রিস্টাইন। লাফিয়ে নামল সবাই দেয়াল থেকে।

ডাইনিং হলে মিসেস মুটেসিয়াস বললেন মিস উলরিকাকে, 'ষাঁড় ধরতে হলে শিং চেপেই ধরা উচিত। দিন ওই দু'জনকে একসাথে বসিয়ে।'

হই হই করতে করতে মেয়েরা এল ডাইনিং হলে। শব্দ উঠল চেয়ার টানাটানির। যে মেয়েদের ডিউটি পড়েছে ওরা গরম গরম ধূমায়িত সুপের গামলা এনে রাখল টেবিলে। অন্যেরা আগ্রহের সঙ্গে বাড়িয়ে ধরা প্লেটে খাবার দিতে লাগল।

মিস উলরিকা লিসা আর ট্রুডির পেছনে এসে দাঁড়ালেন।ট্রুডির কাঁধে হালকা চাপড় দিয়ে বললেন, 'তুমি হিল্ডা স্টর্মের পাশে গিয়ে বস।'

ট্রুডি ঘাড় ফিরিয়ে বলতে গেল, 'কিন্তু···'

'আপত্তি কোরো না, প্লীজ।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অভিমানে ঠোঁট উল্টিয়ে চলে গেল ট্রুডি।

চামচের টুংটাং শুরু হয়েছে। লিসার পাশের চেয়ারটা খালি। সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করল ঐ খালি চেয়ারটি।

তারপর, যেন কারও হুকুমে, সবার দৃষ্টি চলে গেল দরজার দিকে। লোটি এসে পা দিল হলে।

'অবশেষে তুমি এলে,' বললেন মিস উলরিকা। 'এগিয়ে এস। আমি জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে,' বিনুনিঅলা গম্ভীর, লাজুক মেয়েটিকে নিয়ে গেলেন তিনি টেবিলে। লিসা তাকাল না চোখ তুলে। জোরে জোরে চামচ নাড়তে লাগল সুপের মধ্যে। লোটি বিনীতভাবে বসল লিসার পাশে। চামচ তুলে নিল হাতে। তবে ওর মনে হল কেউ যেন দড়ি পেঁচিয়ে দিয়েছে গলায়।

অন্য মেয়েরা কৌতূহল বশে দেখতে লাগল ওই অসাধারণ জোড়াটিকে। দুই কি তিন মাথাঅলা গরুর বাছুরও এতটা কৌতূহল জাগাতে পারত না। মোটা গোলগাল চেহারার স্টেফি এত উত্তেজনা বোধ করল যে হাঁ করা মুখটা বন্ধ করতে ভুলে গেল।

লিসা আর পারল না ওর রাগ দমন করতে। আসলে, দমন করার ইচ্ছাও তার ছিল না। সকল শক্তি একত্র করে টেবিলের নিচে দিয়ে সে লাথি মারল লোটির হাঁটুর নিচে।

ব্যথায় ছটফট করে উঠল লোটি। ঠোঁট দু'টি শক্ত করে চেষ্টা করল ব্যথাটা সয়ে নিতে।

বড়দের টেবিলে অন্যতম সহকারী মিস গার্ডা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'বুঝে উঠতে পারছি না। কেউ কাউকে চেনে না ওরা, অথচ চেহারায় এরকম অদ্ভুত মিল!'

মিস উলরিকা বললেন চিন্তিতভাবে, 'ওরা হয়ত অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল যমজ।'

'অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল যমজ? সেটা আবার কি জিনিস?' জিজ্ঞেস করলেন মিস গার্ডা।

'এমন সব লোকের কথা আমি শুনেছি যারা দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ও নয়, অথচ দেখতে একেবারে এক রকম। ওদের জন্ম হয়েছে একই খণ্ড মুহূর্তে।'

'তাই নাকি?' বললেন মিস গার্ডা।

মিসেস মুটেসিয়াস বললেন, 'আমি লণ্ডনের এক দর্জির কাহিনি পড়েছিলাম। সে ছিল দেখতে অবিকল রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের মত। দু'জনকে আলাদা করে

চেনার উপায় ছিল না। বিশেষত যেহেতু দর্জিটি রাজার মতই সূচালো দাড়ি রাখত। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড তাকে বাকিংহ্যাম প্রাসাদে ডেকে নিয়ে যান এবং অনেকক্ষণ কথা বলেন তার সঙ্গে।'

'দু'জনের জন্ম কি একই সেকেণ্ডে হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। ঘটনাক্রমে তাঁরা ওটা যাচাই করতে পেরেছিলেন।'

'তারপরে কি ঘটেছিল?' প্রশ্ন করলেন মিস গার্ডা গভীর আগ্রহী হয়ে।

'রাজার আদেশে দর্জিটি তার দাড়ি কামিয়ে ফেলেছিল।'

সবাই হাসতে লাগল। মেয়ে দু'টি যে টেবিলে বসে আছে সেদিকে তাকিয়ে চিন্তামগ্নভাবে মিসেস মুটেসিয়াস বললেন, 'লোটি হর্নকে লিসা প্যালফির পাশের বিছানায় শুতে দেয়া উচিত। ওদেরকে মানিয়ে নিতে হবে পরস্পরের সঙ্গে।'

রাত হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েরা সবাই। ঘুমায়নি কেবল দু'জন। এই দু'জন পরস্পরের দিকে পিঠ দিয়ে শুয়েছে এবং গভীর ঘুমের ভান করছে। কিন্তু চোখ দু'জনেরই খোলা। লিসার বিছানার একটা জায়গায় চাঁদের আলো এসে পড়েছে। বিরক্তির সঙ্গে সে তাকিয়ে ছিল ওদিকে। হঠাৎ তার কান খাড়া হয়ে গেল। কেউ কাঁদছে। নীরবে, গুমরে গুমরে।

লোটি মুখে হাত চাপা দিল কান্না থামাতে। ওর মনে পড়ল বিদায়ের সময় মা কি বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'অতগুলো সুখী মেয়ের সঙ্গে কয়েক সপ্তা কাটাতে যাচ্ছ বলে আমি খুশি। বয়সের তুলনায় তুমি বড় বেশি গম্ভীর, লোটি। বড় বেশি গম্ভীর। জানি, দোষটা তোমার নয়, আমার। আমার কাজ আর ব্যস্ততার জন্যই এমন হয়েছে। আমি বড় বেশি বাইরে থাকি। আর, বাড়ি ফিরে আসি ক্লান্তি নিয়ে। অন্য বাচ্চাদের মত খেলতে পার না তুমি। ধোয়ামোছা কর, রান্না কর, টেবিলে খাবার দাও। বাড়িতে যখন ফিরে আসবে তোমার মুখে হাসির রেখা দেখতে চাই, বুঝলে, খুদে গিন্নি?' আর এখন সে পড়ে আছে এক অপরিচিত ঘরে। একটা বদমেজাজী মেয়ের পাশে। মেয়েটি ওকে ঘৃণা করে, যেহেতু ওর চেহারা মেয়েটির মতই। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। তারপর কাঁদতে লাগল নীরবে।

হঠাৎ লোটি টের পেল যে কার যেন একটা ছোট্ট হাত আনাড়ির মত চাপড় দিচ্ছে ওর চুলে।

ভয়ে শক্ত হয়ে গেল সে। লিসার হাত মৃদু চাপড় দিয়ে চলল।

চাঁদ উঁকি দিল বিরাট জানালাপথে। এবং যা দেখল তাতে আশ্চর্য হয়ে গেল। চাঁদ দেখল—দু'টি ছোট্ট মেয়ে শুয়ে আছে পাশাপাশি। সাহস করছে না একে অন্যের দিকে তাকাবার। যে মেয়েটি একটু আগেই কাঁদছিল সে ধীরে ধীরে একটি হাত বাড়িয়ে ছোঁয়ার চেষ্টা করছে অন্যের হাতটি।

'বেশ, বেশ,' ভাবল রূপালী চাঁদ। 'এবার আমি পরিষ্কার মন নিয়ে অস্ত যেতে পারি।'

## দুই

দু'জনের মধ্যে সত্যি কি যুদ্ধবিরতি হল? এটা কি স্থায়ী হবে? কোন আলাপ-আলোচনা বা বাক্যবিনিময় ছাড়া? হ্যাঁ, আমি মনে করি হবে। কিন্তু যুদ্ধবিরতি থেকে শান্তি পর্যন্ত পৌঁছার পথ দীর্ঘ। এমন কি বাচ্চাদের মধ্যেও।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে পরস্পরের দিকে তাকাবার সাহস ওদের হল না। লম্বা সাদা নাইট-গাউন পরে ওয়াশরুমে মুখ-হাত ধোয়ার সময় না। পাশাপাশি লকারে পোশাক পরার সময়ও না। নাস্তার টেবিলে পাশাপাশি চেয়ারে বসে দুধ খেতে খেতেও একে অন্যের দিকে চাইতে পারল না ওরা। পাশাপাশি দৌড়ে লেকের পাড়ে যাবার সময় এবং পরে সহকারীদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে নাচার সময়ও কেউ কারও দিকে তাকাল না ওরা। শুধু একবার এক পলকের জন্য চোখে চোখ মিলে গিয়েছিল ওদের। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে দু'জনে।

মিস উলরিকা বসে আছেন ঘাসের ওপর। বসে বসে একটা আশ্চর্য উপন্যাস পড়ছেন। বইটার পাতায় পাতায় প্রেমের কাহিনী। মাঝে মাঝেই বইটা নামিয়ে রেখে তিনি ভাবছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মি. র‍্যাভে ম্যাকারের কথা। লোকটার ডাক নাম রুডলফ। আহা রুডলফ!

লিসা বল খেলছে বন্ধুদের সাথে। কিন্তু মনটা খেলার মধ্যে নেই। চোখ দু'টো ঘুরছে চারদিকে, যেন খুঁজছে কাউকে যে নেই ওখানে।

টুডি জিজ্ঞেস করল, 'নতুন মেয়েটির নাকে কামড় দিবি কবে?'

'ইডিয়টের মত কথা বলিস না!' মুখ ঝামটা দিল লিসা।

আশ্চর্য হয়ে ওর দিকে চেয়ে ক্রিস্টাইন বলল, 'হ্যাল্লো! আমি ভেবেছিলাম তুই রেগে আছিস ওর ওপর।'

'রেগে আছি বলে তো কারও নাক কামড়ে নিতে পারি না,' বলল লিসা শীতল কণ্ঠে। 'তাছাড়া, ওর ওপর আমার রাগ নেই।'

'কিন্তু গতকাল তো ছিল,' বলল স্টেফি।

'আর সে কি যেমন-তেমন রাগ!' বলল মনিকা। 'রাতে খাওয়ার সময় টেবিলের তলা দিয়ে তুই এমন লাথি মারলি যে ও প্রায় চিৎকার করতে যাচ্ছিল।'

মেজাজ গরম হয়ে গেল লিসার। ধমক দিয়ে বলল, 'মুখ বন্ধ কর এখনি। নইলে তোরাও হাঁটুর নিচে ওরকম লাথি খাবি!' এর পরে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে চলে গেল সে ওদের কাছ থেকে।

শ্রাগ করে ক্রিস্টাইন মন্তব্য করল, 'লিসা জানে না ও কি চায়।'

লোটি বসে আছে মাঠে, ঘাসের ওপর। একটা ছোট্ট ফুলের স্তবক বানিয়ে গুঁজে দিয়েছে মাথার চুলে। আরেকটা বানাচ্ছে ব্যস্ত হয়ে। হঠাৎ একটা ছায়া পড়ল ওর বর্ষাতির ওপর। চোখ তুলে তাকাল সে।

লিসা এসে দাঁড়িয়েছে ওর সামনে। অনিশ্চিত ও বিব্রতভাবে একবার এ পায়ে দাঁড়াচ্ছে, আরেকবার ওপায়ে।

লোটি সাহস করে হাসল একটুখানি। খুব ক্ষীণ হাসি। আতশী কাচ দিয়ে দেখার মত।

আশ্বস্ত হয়ে লিসাও হাসল।

লোটি ওর সবে-বানানো ফুলের স্তবকটি তুলে ধরল লিসার দিকে। লাজুক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'পছন্দ হয়?'

হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল লিসা। আবেগভরে বলল, 'পছন্দ হবে, যদি তুমি আমার মাথায় লাগিয়ে দাও।'

লোটি গুঁজে দিল ফুলগুলো লিসার কোঁকড়ানো চুলে। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'সুন্দর, দারুণ সুন্দর লাগছে।'

এখন এক চেহারার দুজন ঘাসের ওপর বসে আছে পাশাপাশি। একা, সবার থেকে আলাদা। কথা নেই ওদের মুখে, কিন্তু হাসছে নীরবে একে অন্যের দিকে চেয়ে।

শেষে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে লিসা জিজ্ঞেস করল, 'এখনও রেগে আছ আমার ওপর?'

লোটি মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল যে ওর রাগ আর নেই।

মাটির দিকে চেয়ে লিসা বলল, 'হঠাৎ ঘটল কিনা ব্যাপারটা, তাই। বাসটা এল! নামলে তুমি! কি ধাক্কাই খেলাম!'

'হ্যাঁ, ধাক্কাই বটে,' সায় দিল লোটি।

সামনে ঝুঁকে লিসা বলল, 'কিন্তু আসলে ব্যাপারটা বেশ মজার, তাই না?'

বিস্মিত হয়ে লোটি তাকাল লিসার উজ্জ্বল কৌতুকভরা চোখের দিকে। তারপর নরম সুরে জিজ্ঞেস করল, 'মজার? তোমার কোন ভাই-বোন আছে?'

'নেই।'

'আমারও নেই,' বলল লোটি।

উঠে চলে গেল ওরা ওয়াশরুমে। দাঁড়াল একটা বড় আয়নার সামনে। চটপটে কর্মী লোটি লিসার চুলের গোছা টেনে ধরে ব্রাশ আর চিরুনি চালাতে লাগল।

লিসা চেঁচাতে লাগল 'আহ্, উহ্' করে।

কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে ধমক দিল লোটি, 'চুপ করবে? তোমার মা যখন চুল আঁচড়ে দেন তখনও কি এভাবে চেঁচাও?'

'আমার মা নেই,' বলল লিসা মৃদুস্বরে। 'বাবা বলেন—উহু-আঃ—সেজন্যেই আমি একটুখানি বদমেজাজী।'

লিসার চুলে বিনুনি বানাতে বানাতে লোটি জিজ্ঞেস করল, 'চড়-চাপড় মারেন না কখনও?'

'কক্ষনো না। আমাকে খুবই ভালবাসেন। তাছাড়া, তাঁর করার মত কাজ অনেক রয়েছে।'

'চড়-চাপড় মারতে তো শুধু একটা হাতই লাগে,' বলে হাসল লোটি।

লিসার বিনুনি তৈরি শেষ হল। উৎসুক দৃষ্টিতে মেয়ে দু'টি তাকাল আয়নার দিকে। আয়নায় হুবহু একই রকম দু'টো মুখ। এক বিন্দু পার্থক্য নেই কিছুতে।

'দুই বোনের মত!' বলল লোটি ফিসফিস করে।

দুপুরের ঘণ্টা বাজল।

'দারুণ মজা হবে!' চেঁচিয়ে বলল লিসা। হাত ধরাধরি করে ছুটল ওরা ওয়াশরুম থেকে।

ডাইনিং হলে অন্য মেয়েরা অনেক আগেই বসে পড়েছে যার যার চেয়ারে। কেবল লিসা আর লোটির চেয়ারই খালি।

দরজা খুলে গেল। লোটি ঢুকে বিনা দ্বিধায় বসে পড়ল লিসার চেয়ারে।

মনিকা বলল, 'ওটা লিসার জায়গা। লাথির কথা মনে রেখ।'

লোটি শ্রাগ করে খেতে লাগল।

দরজা আবার খুলে গেল। কিন্তু তাজ্জব কাণ্ড! লোটি—রক্ত মাংসের লোটি—দ্বিতীয়বার এসে ঢুকেছে ডাইনিং হলে! কারও দিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে সে বসে পড়ল খালি চেয়ারটায়।

টেবিলের অন্য মেয়েরা চেয়ে রইল হাঁ করে।

আশপাশের টেবিলের মেয়েরা লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে ভিড় জমাল দুই লোটির চারদিকে।

মেয়ে দু'টি হো হো করে হেসে না ওঠা পর্যন্ত উত্তেজনা কমল না। তারপর গোটা হল জুড়ে বহু কণ্ঠে সে কী চেঁচামেচি, হইহুল্লোড় আর হাসি।

কঠোরভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করে মিসেস মুটেসিয়াস বললেন, 'এত গোলমাল

কেন?' মাপা মাপা পা ফেলে তিনি চলে এলেন ভিড়ের কাছে। কিন্তু বিনুনিঅলা মেয়েদুটির ওপর নজর পড়তেই তাঁর রাগ রোদে রাখা বরফের মত গলে পানি হয়ে গেল। দারুণ মজা পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কে লিসা প্যালফি? আর, লোটি হর্নই বা কোন্‌টি?'

এক লোটি জবাব দিল, 'আমরা বলব না,' আবার উঠল হাসির হররা।

কৃত্রিম হতাশার সুরে মিসেস মুটেসিয়াস বললেন, 'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বলে দাও, তোমাদের নিয়ে যে আমরা কি করব!'

হাসিমুখে উত্তর দিল দ্বিতীয় লোটি, 'শেষ পর্যন্ত হয়ত কেউ না কেউ ধরে ফেলবে।'

বাতাসে দু'হাত দুলিয়ে কবিতা আবৃত্তির ভঙ্গিতে স্টেফি বলল, 'আমি জানি।ট্রুডি একই ক্লাসে পড়ে লিসার সঙ্গে।ট্রুডি বলুক আমাদেরকে।'

সন্দিগ্ধভাবে এসে ট্রুডি দাঁড়াল ভিড়ের মধ্যে। সতর্কভাবে দেখল একবার এক লোটিকে, আবার অন্য লোটিকে। মাথা নাড়ল হতাশভাবে। তারপর একটা দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। খপ করে কাছের লোটির একটি বিনুনি ধরে দিল টান। সঙ্গে সঙ্গে ওর গালে পড়ল চড়।

গালে হাত চাপা দিয়ে বিজয় উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল ট্রুডি, 'এটাই লিসা!' সমবেত কণ্ঠের হাসির দমকে ছাদ ফেটে যাবার উপক্রম হল।

লিসা আর লোটিকে গ্রামে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে। ওদের ছবি তুলে রাখা হবে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে। সেই ছবি ওরা পাঠাতে পারবে বাড়িতে। কি আশ্চর্যই না হবেন ওদের বাবা-মা!

ওদেরকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন ফটোগ্রাফার—জনৈক মি. অ্যাপেলডয়ের। তবে ছবি তিনি ভালই তুললেন। ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিতে তিনি ছবি নিলেন। দশ দিনের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে ছবিগুলো।

মেয়ে দু'টি চলে যাবার পরে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'জান, আমি কি করব? ভাল দেখে কয়েকটি ছবি পাঠিয়ে দেব কোন সচিত্র পত্রিকা বা ম্যাগাজিনে। সম্পাদকরা এরকম জিনিস পছন্দ করেন।'

বাইরে এসে লিসা খুলে ফেলতে লাগল ওর বিনুনি। এরকম চুলের স্টাইল ওর মনের ওপর এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করে। মাথা ঝাঁকিয়ে চুল উড়িয়ে চলতে পারলেই সহজ বোধ করে সে। লোটিকে সে বলল, 'চল, এক গ্লাস লেমোনেড খাই,' লোটি আপত্তি করল। লিসা জোর দিয়ে বলল, 'খেতেই হবে তোমাকে। গত পরশু বাবা আরও কিছু হাত-খরচ পাঠিয়েছেন। এস দিকি!'

ফরেস্টারের বাড়িতে একটা ছোট্ট কাফে আছে। ওরা চলে গেল সেখানে।

বাগানে এক টেবিলে বসে লেমোনেড খেল, গল্প করল। কত কিছু বলার আছে। কত প্রশ্ন করার আছে। কত জবাব দেয়ার আছে। দু'টি ছোট্ট মেয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেলে এসবের আর সীমা থাকে না।

টেবিলের ফাঁকে ফাঁকে মুরগিরা ঘুরঘুর করছে, ঠোকরাচ্ছে, কঁক কঁক করছে। একটা বুড়ো শিকারি কুকুর শুঁকল মেয়ে দু'টিকে। দেখল যে ওদের থাকায় আপত্তির কিছু নেই।

'তোমার বাবা কি অনেক আগেই মারা গেছেন?' প্রশ্ন করল লিসা।

'জানি না,' বলল লোটি। 'মা কখনও বলেন না তাঁর কথা। আমিও জিজ্ঞেস করতে চাই না।'

মাথা নেড়ে লিসা বলল, 'মাকে আমার মনেই পড়ে না। বাবার পিয়ানোর ওপর তাঁর একটা বড় ফটো ছিল। একদিন বাবা এসে দেখেন যে আমি চেয়ে আছি ওটার দিকে। পরদিন সেটা উধাও হয়ে যায়। আমার মনে হয় তিনি ফটোটা তাঁর ডেস্কে তালাবদ্ধ করে রেখেছেন।'

মুরগিরা কঁক কঁক করছে। কুকুরটা ঝিমাচ্ছে। পিতৃহীন একটা মেয়ে লেমোনেড খাচ্ছে মাতৃহীন একটি মেয়ের সাথে।

'তোমার বয়স দশ বছর হল, তাই না?' জিজ্ঞেস করল লিসা।

'না,' বলল লোটি। 'অক্টোবরের চোদ্দ তারিখে আমার বয়স এগার বছর হবে।'

লাঠির মত সোজা হয়ে বসল লিসা। 'অক্টোবরের চোদ্দ তারিখে?'

'হ্যাঁ, অক্টোবরের চোদ্দ।'

লিসা সামনে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, 'সেদিন আমারও এগার হবে।'

বরফের মত জমে গেল লোটি একথা শুনে।

একটা মোরগ ডেকে উঠল বাড়িটার পাশ থেকে। একটা ভ্রমর গুনগুন করে উড়ছিল বুড়ো কুকুরটির চারপাশে, কুকুরটি খপ্ করে কামড়ে ধরতে চাইল ওটাকে। রান্নাঘরের খোলা জানালা পথে ফরেস্টারের বৌ-এর গানের সুর ভেসে এল ওদের কানে।

সম্মোহিতের মত মেয়ে দু'টি তাকিয়ে রইল একে অন্যের দিকে। ঢোক গিলে ধরা গলায় লোটি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি···তুমি কোথায় জন্মেছ?'

দ্বিধার সঙ্গে, নিচু স্বরে, যেন ভয় পাচ্ছে এমনি করে লিসা জবাব দিল, 'ড্যানিয়ুব নদীর তীরে লিঞ্জ শহরে।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে লোটি বলল, 'আমারও জন্ম হয়েছে লিঞ্জ শহরে!'

বাগানে সবকিছু নীরব নিস্তব্ধ। শুধু গাছের পাতার আগাগুলো নড়ছে। বোধহয় ভাগ্যদেবী বাগানের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় ডানা দিয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে

পাতাগুলোকে।

লোটি ধীরে ধীরে বলল, 'আমার লকারের মধ্যে মা-র একটা ছবি আছে।'

লাফিয়ে উঠল লিসা। 'আমাকে দেখাও!' লোটিকে টেনে চেয়ার থেকে তুলে ছুটল সে বাগান থেকে।

পেছন থেকে শোনা গেল ফরেস্টারের বৌ-এর গলা, 'এ তো বড় চমৎকার ব্যাপার! লেমোনেড খেয়ে দাম না দিয়ে চলে যাওয়া!'

লজ্জা পেল লিসা। কাঁপা হাতে ব্যাগ থেকে একখানা দুমড়ানো নোট বের করে মহিলাটির হাতে তুলে দিয়েই ছুটল আবার।

'ভাংতি নেবে না?' চেঁচিয়ে বলল মহিলাটি, কিন্তু ওরা শুনল না।

'না জানি কোথায় যাচ্ছে ছোট্ট বাঁদরগুলো,' বলে ঘরে চলে গেল ফরেস্টারের বৌ। বুড়ো কুকুরটাও গেল তার পিছু পিছু।

হলিডে-হোমে ফিরে লোটি তাড়াতাড়ি করে খুঁজল তার লকারের ভেতর। কাপড়ের স্তূপের নিচে পেল ফটোটা। বাড়িয়ে ধরল ওটা লিসার দিকে। অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল লিসা।

লাজুক, ভীত দৃষ্টিতে তাকাল লিসা ছবিটার দিকে। তারপর মুখটা ওর উজ্বল হয়ে উঠল। একদৃষ্টে চেয়ে রইল সে মহিলাটির দিকে।

লোটির উৎসুক দৃষ্টি লিসার ওপর।

খুশিতে অবসন্ন হয়ে লিসা ফটোটি নামাল। আবার বুকে তুলে চেপে ধরল। ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'আমার মা! আমার মা!'

লিসার গলা জড়িয়ে ধরে লোটি বলল, 'আমাদের মা!' একে অন্যকে বুকে আঁকড়ে ধরে এবার দু'জনে বলতে লাগল, 'আমাদের মা! আমাদের মা!' কিন্তু একটা রহস্যের সমাধান এইমাত্র হলেও আরও রহস্য, নতুন সমস্যা অপেক্ষা করছে ওদের জন্য।

ঘণ্টা বাজল হাউসে। বাচ্চারা হাসতে হাসতে, চিৎকার করতে করতে ছুটে চলেছে নিচে। লিসা ছবিটি রাখতে গেল লকারে। কিন্তু লোটি বলল, 'ওটা তোমার কাছে থাক।'

মিস উলরিকা দাঁড়িয়ে আছেন অধ্যক্ষার অফিসে টেবিলের সামনে। উত্তেজনায় গাল দু'টি তাঁর আপেলের মত লাল হয়ে উঠেছে।

'আমি আর কথাটা চেপে রাখতে পারছি না,' বললেন তিনি। 'আপনাকে বলতেই হচ্ছে। কিন্তু কি করব বুঝতে পারছি না!'

'শান্ত হোন, শান্ত হোন,' বললেন মিসেস মুটেসিয়াস। 'আপনার

মনে কি আছে বলে ফেলুন।'

'ওরা অ্যাস্টোলজিক্যাল যমজ নয়।'

'কারা নয়?' হেসে বললেন মিসেস মুটেসিয়ান। 'রাজা এডওয়ার্ড আর দর্জিটি?'

'না। লিসা প্যালফি আর লোটি হর্ন! আমি রেজিস্টার বই দেখেছি। ওরা দু'জনেই একই বছরের একই দিনে লিঞ্জ শহরে জন্মেছে। এটা কাকতালীয় ব্যাপার হতেই পারে না।'

'আমিও মনে করি না এটা কাকতালীয় ব্যাপার। আসলে বিষয়টা সম্পর্কে আমার নিজস্ব কিছু ধারণা আছে।'

'আপনি তাহলে জানেন?' জিজ্ঞেস করলেন মিস উলরিকা।

'নিশ্চয়ই। লোটি আসার পর ওর জন্ম তারিখ ও জন্মস্থান খাতায় লিখে রেখেছি। তারপর লিসার জন্মতারিখ আর জন্মস্থানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি।'

'এখন আপনি কি করবেন?'

'কিছুই না।'

'কিছুই না?'

'কিছুই না। আপনিও এটা গোপন রাখবেন। নইলে আমি ভীষণ রাগ করব।'

'কিন্তু...'

'কিন্তু-টিন্তু নেই। মেয়ে দু'টির মনে কোন সন্দেহই জাগেনি। ওদের ছবি নেয়া হয়েছে। ওরা ছবি পাঠাবে বাড়িতে। ওতে জটিলতার গেরো খুললে ভাল কথা। কিন্তু আমি আর আপনি ভাগ্যের ভূমিকায় নামতে পারি না। আপনার সহৃদয়তার জন্যে ধন্যবাদ। এখন দয়া করে বাবুর্চিকে পাঠিয়ে দিন আমার কাছে,' বললেন মিসেস মুটেসিয়াস।

# তিন

সময় কেটে যায়। থাকে না। ওটাই তার নিয়ম।

মেয়ে দু'টি মি. অ্যাপেলডয়েরের কাছ থেকে ছবির প্রিন্টগুলো নিয়েছে? অনেক আগেই। কৌতূহলী মিস উলরিকা ছবিগুলো ওরা বাড়িতে পাঠিয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করেছেন? করেছেন। লিসা আর লোটি কি তাঁকে বলেছে যে পাঠিয়েছে? আমার আশঙ্কা, বলেছে।

কিন্তু আসলে সেই প্রিন্টগুলো কুচি কুচি করে ছেঁড়া অবস্থায় পড়ে আছে লেক

বোরলেকেন-এর বোতল-সবুজ পানির তলে। মেয়ে দু'টি মিস উলরিকাকে মিথ্যে বলেছে। ওরা চায় নিজেদের গোপন কথাটা নিজেদের মধ্যেই গোপন রাখতে। দু'জনে মিলে ওরা চায় ওটা লুকিয়ে রাখতে এবং সম্ভব হলে দু'জনে মিলে প্রকাশ করতে। যে-ই বেশি বেশি নাক গলাতে চেয়েছে ওদের ব্যাপারে, ওরা নির্লজ্জভাবে তাকে মিথ্যে বলেছে। ওদের আর কি করার ছিল? বিবেক ওদেরকে দংশন করেনি—এমনকি লোটিকেও নয়।

চোর-কাঁটার মত ওরা লেগে আছে একজন অন্যজনের গায়ে। ট্রুডি, স্টেফি, মনিকা, ক্রিস্টাইন এবং অন্যেরা একেক সময় বিরক্ত হয়েছে লিসার ওপর। ঈর্ষা করেছে লোটিকে। এতে ফল কি হয়েছে? কিছুই না! এখন কোথায় কেটে পড়ল ওরা?

কেটে পড়েছে লকার-রুমে। একই রকমের দু'টি বর্ষাতি লকার থেকে বের করে নিল লোটি। একটা দিল বোনকে, একটা জড়িয়ে নিল নিজের গায়ে।

'মা কিনেছিলেন এগুলো,' বলল সে। 'পলিঙ্গারের দোকান থেকে।'

'আহা,' বলে উঠল লিসা। 'নেউহসার স্ট্রীটের সেই দোকানটা না? কি যেন গেটটার নাম?'

'কার্ল গেট।'

'হ্যাঁ, তাই। কার্ল গেট-এর কাছে।'

এতদিনে ওরা জেনে ফেলেছে পরস্পরের জীবনযাত্রার ধরন। স্কুলের বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-পড়শী, শিক্ষক আর ফ্ল্যাটের নাম। কারণ, লিসার কাছে মা-র সঙ্গে যুক্ত সব কিছুই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর লোটি জানতে চায় বাবার সম্পর্কে বোন যা যা জানে, প্রতিটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত, সব কিছু। দিনের পর দিন ওরা শুধু এসবই বলাবলি করেছে। রাতে বিছানায় শুয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরা ফিসফিস করেছে। প্রত্যেকেই একেকটা নতুন ও অজানা জগৎ আবিষ্কার করেছে। ওরা দু'জনেই হঠাৎ উপলব্ধি করেছে যে শৈশবের আকাশ-তলে যে জগতে এতদিন ওরা বিচরণ করেছে সেটা অর্ধেক জগৎ মাত্র।

এই দুই অর্ধেককে জোড়া দিয়ে পুরো জগৎটি কেমন তা দেখার কাজে ব্যস্ত রয়েছে ওরা। বিরতির সময় আরেকটি বিষয় নিয়ে উত্তেজনা বোধ করেছে। আরেকটি রহস্য পীড়া দিয়েছে ওদেরকেঃ ওদের বাবা-মা একসঙ্গে থাকেন না কেন?

শত বারের মত লিসা বলল, 'প্রথমে অবশ্য, তাঁরা বিয়ে করেছিলেন। আমাদের দু'জনকে জন্ম দিলেন। আমার নাম রেখেছেন লিসা। মা-র নাম লিসালোট বলে তোমার নাম দেয়া হয় লোটি। সুন্দর, তাই না? ঐ সব দিনে তাঁরা নিশ্চয়ই একে অন্যকে খুব ভালবাসতেন, কি বল?'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে,' বলল লোটি। 'তারপরে নিশ্চয় ঝগড়া হয় তাঁদের মধ্যে। শেষে ছাড়াছাড়ি। আমাদের নাম রাখার জন্য মা-র নামকে তাঁরা যেভাবে দ্বিখণ্ড করেন ঠিক সেইভাবে আমাদেরকে দুই ভাগ করেন।'

'আমাদেরকে দুই টুকরো করার আগে তাঁদের উচিত ছিল আমাদের মতামত নেয়া,' বলল লিসা।

'কিন্তু আমরা তো তখন কথা বলতেও শিখিনি।'

অসহায়ভাবে হাসল দু'বোন। হাত ধরাধরি করে চলে গেল বাগানে।

ডাক এসেছে। সবখানে, ঘাসের ওপর, দেয়ালের ওপর, বাগানের বেঞ্চিতে বসে ছোট্ট মেয়েরা চিঠি পড়ছে।

লোটির হাতে বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের এক লোকের ফটো। মমতা ভরা চোখে সে দেখছে ওর বাবাকে। বাবা তাহলে এই রকম। আর, একজন প্রকৃত, জীবন্ত বাবা থাকলে হৃদয়ে এ রকম অনুভূতিই বুঝি জাগে!

লিসা পড়ে শোনাল বাবা কি লিখেছেন: 'আমার প্রিয়তম একমাত্র সন্তান!' 'কি মিথ্যুক' বলল সে। 'তিনি খুব ভাল করেই জানেন যে তাঁর আরেকটি মেয়ে আছে!' আবার পড়তে লাগল সে, 'আমার মনে হয় বুড়ো বাপের চেহারা তুমি নিশ্চয় ভুলে গেছ। নইলে ছুটি শেষ হবার আগ মুহূর্তে তাঁর ফটোর জন্য এতটা উতলা হয়ে উঠতে না। প্রথমে ভেবেছিলাম তোমাকে আমার বাচ্চা বয়সের একটা ছবি–যেটাতে দেখা যায় আমি ন্যাংটো অবস্থায় বসে আছি একটা মেরু-ভল্লুকের চামড়ার ওপর-পাঠিয়ে দেব। কিন্তু তুমি লিখেছ ছবিটা একদম নতুন হওয়া চাই। তাই বাড়তি সময় হাতে না থাকলেও ছুটে গেলাম ফটোগ্রাফারের দোকানে। বুঝিয়ে বললাম কেন তাড়াতাড়ি দরকার। ওকে বললাম যে সে যদি আমার ছবি না তুলে দেয় তাহলে আমি যখন স্টেশনে যাব লিসাকে আনতে তখন আমার লিসা চিনতে পারবে না আমাকে। ভাগ্য ভাল, লোকটা বুঝতে পারল কাজটা কত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে, ছবিটা তুমি যথাসময়ে পেলে। তোমাদের হলিডে-হোমের তরুণী সুপারভাইজার মহিলাদের জন্যে আমি দুঃখিত। বাপকে যেরকম নাচিয়ে ফেলতে সেরকম আশা করি তাঁদেরকে নাচাচ্ছ না। হাজার শুভেচ্ছা তোমার প্রতি। তোমার ফিরে আসার অপেক্ষা করছি।'

'চমৎকার এবং মজাদার,' বলল লোটি। 'যদিও ছবিতে তাঁকে বেশ গুরুগম্ভীর দেখায়।'

'বোধহয় ফটোগ্রাফারের সামনে লজ্জায় হাসতে পারেননি,' বলল লিসা। 'অন্য লোকের সামনে উনি সব সময় গুরুগম্ভীর। কিন্তু বাড়িতে বাইরের লোক না থাকলে খুব হাসিখুশি।'

ফটোটা শক্ত করে ধরে রেখে লোটি বলল,' আমি কি সত্যি এটা রাখতে পারি?'

'অবশ্যই,' বলল লিসা। 'এ জন্যেই ওটা আনিয়েছি।'

গোলগাল মুখো স্টেফি একটা চিঠি হাতে নিয়ে কাঁদছে বেঞ্চিতে বসে। কিন্তু শব্দ করছে না। চোখের পানি গড়িয়ে পড়ছে ওর গোল, অনড়, শিশুসুলভ গাল বেয়ে।

ট্রুডি হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়াল ওর সামনে। কৌতূহলের বশে ওর পাশে বসল। তাকাল ওর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

ক্রিস্টাইন এসে বসে পড়ল স্টেফির আরেক পাশে।

লিসা আর লোটি গিয়ে থামল। লিসা জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে? খারাপ কিছু?'

স্টেফি কেঁদে চলল নীরবে। হঠাৎ সে মাটিতে দৃষ্টি রেখে বলল, 'আমার মা-বাবা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন।'

'কি জঘন্য ব্যাপার!' চেঁচিয়ে বলল ট্রুডি। 'ওকে হলিডে-হোমে পাঠিয়ে তাঁরা এমন কাজটা করছেন!'

'বাবা মনে হয় আরেক মহিলাকে ভালবাসেন,' কাঁদতে কাঁদতে বলল স্টেফি।

লিসা আর লোটি চট করে সরে পড়ল ওখান থেকে। যা শুনল তা গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে ওদেরকে।

'আমাদের বাবা নতুন স্ত্রী জুটিয়েছেন নাকি?' জিজ্ঞেস করল লোটি।

'না,' জবাব দিল লিসা। 'জোটালে আমি জানতাম।'

'বিয়ে করেননি এমন কোন মহিলা বন্ধু?' বলল লোটি দ্বিধার সঙ্গে।

কোঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে লিসা জবাব দিল, 'অবশ্যই তাঁর বন্ধু আছে। মেয়ে বন্ধুও। কিন্তু ওদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি নেই। বলি, মা-র খবর কি? তাঁর কোন··· পুরুষ বন্ধু আছে কি?'

'না,' বলল লোটি জোর দিয়ে। 'মা-র আমি আছি, আর আছে তাঁর কাজ। তিনি বলেন, জীবনের কাছে এর বেশি চাহিদা তাঁর নেই।'

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে বোনের দিকে চেয়ে লিসা বলল, 'বুঝলাম, কিন্তু তাঁরা ডিভোর্স করলেন কেন?'

কিছুক্ষণ ভেবে লোটি বলল, 'তাঁরা কখনও কোর্টে গিয়েছেন কিনা কে জানে। মানে, স্টেফির বাবা-মার মত।'

'বাবা কেন ভিয়েনায়, মা মিউনিখে?' প্রশ্ন করল লিসা। 'কেন তাঁরা আমাদেরকে ভাগ করে ফেললেন আধাআধি?'

ভাবতে ভাবতে লোটি বলল, 'কেন তাঁরা আমাদেরকে কখনও বলেননি যে

আমরা যমজ বোন? কেন বাবা তোমাকে কখনও বলেনি যে মা এখনও বেঁচে আছেন?'

'মা-ও তোমাকে বলেননি যে বাবা এখনও বেঁচে আছেন,' বলল লিসা। 'চমৎকার মা-বাবা আমাদের, তাই না? সবুর কর। আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব একদিন। তখন হুঁশ হবে তাঁদের।'

'আমরা তা করতে পারি না,' বলল লোটি ভয়ে ভয়ে। 'আমরা তো বাচ্চা মানুষ।'

'বাচ্চা কিনা দেখা যাবে,' বলল লিসা মাথা ঝাঁকিয়ে।

## চার

ছুটির মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। মেয়েদের মনে একদিকে চলে যাওয়ার দুঃখ, অন্যদিকে বাড়ি ফেরার সম্ভাবনার আনন্দ।

মিসেস মুটেসিয়াস একটা গার্ডেন-পার্টির আয়োজন করছেন। একটি মেয়ের বাবা এক বড় দোকানের মালিক। তিনি গাঁইট-ভর্তি চীনা লণ্ঠন, রঙিন কাগজের মালা ইত্যাদি পাঠিয়েছেন। সহকারী মহিলা আর বাচ্চারা বারান্দা আর বাগান সাজাতে গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে। পুরস্কার দেয়া হবে পার্টি শেষে। প্রথম পুরস্কার হচ্ছে বল-বেয়ারিংঅলা রোলার স্কেট।

'কোঁকড়া চুল আর বিনুনি কোথায় গেল?' জিজ্ঞেস করলেন মিস উলরিকা। (লিসা আর লোটির নতুন নাম দিয়েছেন তিনি।)

'ওরা?' বলল মনিকা অবজ্ঞার সুরে। 'বসে আছে কোথাও ঘাসের ওপর হাতে হাত ধরে-যাতে বাতাসের ধাক্কায় বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়।'

যমজ দু'টি কোথাও ঘাসের ওপর বসে নেই। ওরা বসে আছে ফরেস্টারের কাফের বাগানে। হাতে হাত ধরেও নেই ওরা। ওসবের সময় ওদের কোথায়? ওদের সামনে রয়েছে একটা করে নোট বই আর পেন্সিল। এই মুহূর্তে লোটি বলে যাচ্ছে, লিসা লিখে নিচ্ছে: মা-র প্রিয় খাবার হচ্ছে নুডলস-এর সাথে বীফ-স্টু। বীফ পাওয়া যায় হুবার-এর দোকানে। সিনার মাংস ভাল দেখে আধা পাউণ্ড।

লিসা চোখ তুলে পড়ে শোনাল, 'হুবার। পরিবারের বাঁধা কসাই। ম্যাক্স এম্যানুয়েল স্ট্রীট এবং প্রিন্স ইউজিন স্ট্রীটের কোণে।'

অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল লোটি। 'রান্নার বই রয়েছে রান্নাঘরের কাবার্ডে, বাঁ-দিকের নিচের তাকে। ওটার মধ্যে আমার জানা সব রান্নার নিয়ম

লেখা আছে।'

লিসা লিখে নিল, 'রান্নার বই···কিচেন কাবার্ড··· বাঁ-দিকের নিচের তাক···' তারপর টেবিলে কনুই রেখে বলল, 'রান্না করার ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। তবে প্রথম ক'দিনে ভুল হয়ে গেলে বলতে পারব যে ছুটির সময় রান্না না করতে করতে সব ভুলে গেছি।'

মনে সন্দেহ নিয়ে মেনে নিল লোটি। বলল, 'কোন কিছু গোলমাল হয়ে গেলে আমাকে লিখে দিয়ো। আমি প্রতিদিন পোস্ট অফিসে গিয়ে তোমার চিঠির খোঁজ নেব।'

'আমিও নেব,' বলল লিসা। 'তুমি ঘন ঘন লিখবে। আমি ইমপেরিয়ালে ভাল ভাল জিনিস খাব। বেশি খেলে বাবা খুশি হন।'

'কি দুঃখের কথা—তোমার প্রিয় খাবার কিনা প্যানকেক। ওটার চাইতে আমার ভাল লাগে ভীল কাটলেট, কিংবা গুলাশ,' বলল লোটি।

'প্রথম দিন তিনটা, চারটা, কিংবা পাঁচটা প্যান কেক খেয়ে নিলে বলতে পারবে যে বাকি জীবন ওতেই চলে যাবে,' বলল লিসা।

'হ্যাঁ, তা করা যেতে পারে,' জবাব দিল লোটি। কিন্তু পাঁচ-পাঁচটা প্যানকেক খাওয়ার কথা ভাবতেই পেট গুলিয়ে উঠল ওর।

তারপর দু'বোন আবার ঝুঁকে পড়ল ওদের নোট বইয়ের ওপর। পরস্পরকে ওরা ওদের ক্লাসমেটদের নাম, ক্লাসে কার কি অবস্থান, শিক্ষকদের কার কি অভ্যাস, স্কুলে যাবার সহজ পথ, সব বলল।

'আমার চাইতে তোমার পক্ষে স্কুলে যাওয়া সহজ হবে। প্রথম দিন ট্রুডিকে বলবে তোমার সঙ্গে একত্রে যেতে। মাঝে মাঝে এসে সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যায়। তারপর কেবল ও যেদিকে যায় সেদিকে যাবে। রাস্তার মোড়গুলো ভালভাবে লক্ষ কোরো।'

লোটি মাথা নুইয়ে জানাল তাই করবে। হঠাৎ চমকে উঠে সে বলল, 'একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। শোয়ার আগে মা-কে গুড-নাইট বলে চুমু দিতে ভুলো না কিন্তু।'

'এটা লিখে নেয়ার দরকার নেই। এটা আমি ভুলব না।'

ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে বুঝতে পারছ? কি মতলব আঁটছে যমজ বোন দু'টি? ওরা ঠিক করেছে, মা-বাবাকে বলবে না যে সত্য ঘটনা ওরা জানে। তাঁদেরকে ওরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করতে চায় না। ওরা মনে করে যে সেই অধিকার ওদের নেই।

তাছাড়া, ওদের ভয় মা-বাবা হয়ত এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে বসবেন যার ফলে

ওদের সুখ-আনন্দ একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আবার অন্য পন্থাও নিতে পারে না ওরা। অন্য পন্থা মানে, যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে বাড়ি ফিরে যাওয়া। মা-বাবা যে অর্ধেক জগৎ ওদেরকে দিয়েছে না জিজ্ঞেস করে, তাতে বাস করতে থাকা। না! সংক্ষেপে বলতে গেলে, একটা চক্রান্ত হচ্ছে। অপূর্ণ কামনা আর অ্যাডভেঞ্চারের মনোভাব নিয়ে এক অদ্ভুত পরিকল্পনা তৈরি করেছে ওরা। পরিকল্পনাটি হচ্ছে এরকম: ওরা ওদের কাপড়-চোপড়, চুলের স্টাইল, ট্রাঙ্ক, বর্ষাতি, ব্যক্তিগত জীবন, সব বদলাবদলি করবে! লিসা 'বাড়ি যাবে' লোটি সেজে পরিপাটি বিনুনি নিয়ে (অন্যান্য ব্যাপারেও পরিপাটি থাকতে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ)। বাড়ি যাবে মা-র কাছে। যে মাকে সে জেনেছে শুধু একটা ছবি দেখে। লোটি যাবে ভিয়েনায় বাপের কাছে, লম্বা ঝাঁকড়া চুল নিয়ে। চেষ্টা করবে যতটা সম্ভব হাসিখুশি ও চটপটে থাকতে।

ভবিষ্যৎ অ্যাডভেঞ্চারের জন্য অতি সতর্কভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে ওরা। ওদের নোটবইগুলো লেখায় ভর্তি। সঙ্কট দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে একে অন্যকে চিঠি লিখবে বলে একমত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কিংবা অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটলেও তাই করবে ওরা।

তীক্ষ্ণ নজর রাখলে ওরা হয়ত শেষ পর্যন্ত বাবা-মায়ের আলাদা থাকার রহস্যটা ধরে ফেলতে পারবে। হয়ত এমন সুন্দর আশ্চর্য দিন আসবে যখন ওরা এক সাথে, মা-বাবা দু'জনের সাথে থাকবে। কিন্তু এখন সেই আশ্চর্য দিনের কথা ভাবতে বা বলতে ওদের সাহস হয় না।

ওরা ঠিক করল বিদায়ের আগের এই গার্ডেন-পার্টিটাকে শেষ মহড়ায় পরিণত করবে। লোটি হাজির হল কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুলো হাসিখুশি উদ্দাম লিসা সেজে। লিসা উপস্থিত হল বিনুনিঅলা লাজুক লোটি হয়ে। দু'জনেই নিজ নিজ ভূমিকায় অভিনয় করল নিখুঁতভাবে। কেউ ধরতে পারল না। লিসার ক্লাসমেট টুডিও না। লিসা লোটিকে ডাকল লিসা বলে, লোটি লিসাকে ডাকল লোটি বলে। লোটির মনে এত ফুর্তি জাগল যে সে ডিগবাজি খেতে লাগল। লিসা হয়ে উঠল ভদ্রতা আর বিনয়ের প্রতিমূর্তি। এত ভদ্র, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে পারে না।

চীনা লণ্ঠনগুলো জ্বলছে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে। মালাগুলো দুলছে সান্ধ্য হাওয়ায়। ছুটি শেষ হয়ে যাচ্ছে। লটারির পুরস্কার বিতরণ হচ্ছে। ছোট্ট স্টেফি পেয়েছে প্রথম পুরস্কার। বল-বেয়ারিংঅলা রোলার স্কেট।

অবশেষে নিজনিজ ভূমিকায় অভিনয় করতে করতেই যমজ বোন দু'টি ঘুমিয়ে পড়েছে একে অন্যের বিছানায়। অদ্ভুত, উত্তেজনাকর স্বপ্ন দেখছে। যেমন লোটি দেখছে বাবা এসেছেন ভিয়েনার স্টেশনে ওকে নিতে। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে

উঁচু সাদা টুপি পরা এক বাবুর্চি, ধূমায়িত প্যানকেক ভর্তি একটা ট্রলি নিয়ে! উহ্, কি মজা!

পরদিন ভোরে দু'দিক থেকে দু'টি ট্রেন এসে থামল বোরলেকেন-এর অদূরে ইগার্ন স্টেশনে। দলে দলে মেয়েরা কলকল করতে করতে উঠে পড়ল কামরাগুলোতে।

লোটি জানালা দিয়ে মাথা বের করল। অন্য ট্রেনের জানালা থেকে লিসা হাত নাড়ল ওকে দেখে। একে অন্যকে সাহস দেয়ার জন্য হাসল ওরা। ওদের বুক কাঁপছে দুরু দুরু, স্নায়ুগুলো হয়ে উঠেছে টানটান। সেই মুহূর্তে যদি হিস হিস করে ইঞ্জিন চালু না হত তাহলে কি ঘটত কে জানে। ছোট্ট মেয়ে দু'টি হয়ত শেষ মুহূর্তে...

কিন্তু না! টাইম টেবিল অনুযায়ী ট্রেন চলতে শুরু করেছে। গার্ডরা পতাকা দোলাচ্ছে। বাচ্চারা হাত নাড়ছে।

লোটি যাচ্ছে লিসা সেজে ভিয়েনায়।

লিসা যাচ্ছে লোটি সেজে মিউনিখে।

# পাঁচ

মিউনিখ স্টেশন। ১৬ নম্বর প্ল্যাটফরম। ইঞ্জিন থেমে গেল ধোঁয়া ছেড়ে। অনেক যাত্রী নেমেছে। ছোট্ট মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে মা-বাবার বুকে। কত খবরের আদান-প্রদান, কত উত্তেজনা। সবাই যেন ভুলে গেছে যে ওটা স্টেশন-বাড়ি নয়।

আস্তে আস্তে খালি হল প্ল্যাটফরম। শেষ পর্যন্ত রয়ে গেল একটি মাত্র মেয়ে—মাথায় রিবনে বাঁধা বিনুনি। গতকাল পর্যন্ত ওর নাম ছিল লিসা প্যালফি।

অবশেষে মেয়েটি বসে পড়ল ওর ট্রাঙ্কের ওপর। অজানা স্টেশনে বসে থাকা, ছবি ছাড়া যে মাকে দেখেনি কোনদিন তাঁর জন্য অপেক্ষা করা, খুব মজার ব্যাপার নয়!

মিসেস লিসালোট প্যালফি এখন লিসালোট হর্ন। সাড়ে আট বছর আগে ডিভোর্সের পর তিনি তাঁর কুমারী জীবনের পদবী আবার গ্রহণ করেছেন। দি মিউনিখ ইলাস্ট্রেটেড পত্রিকার তিনি চিত্র-সম্পাদক! অফিসে তাঁর দেরি হয়ে যায়। কয়েকটা নতুন ছবি এসে পড়েছিল খবরের পৃষ্ঠাগুলোর জন্যে।

অবশেষে কোনমতে তিনি একটা ট্যাক্সি পাকড়াও করলেন। ধস্তাধস্তি করে

প্ল্যাটফরম টিকেট কিনে ছুটতে ছুটতে পৌছলেন ১৬ নম্বর প্ল্যাটফরমে।

প্ল্যাটফরমটা খালি?

না! একেবারে শেষ মাথায় ট্রাঙ্কের ওপর বসে আছে একটি বাচ্চা মেয়ে। দমকলের ইঞ্জিনের মত দৌড় মারলেন তরুণী মা প্ল্যাটফরমের ওপর দিয়ে।

ট্রাঙ্কে বসা মেয়েটির দুই হাঁটু কাঁপছে। এক অজ্ঞাত অনুভূতি জেগে উঠেছে ওর হৃদয়ে। ঐ ছুটন্ত মহিলাটি ওর মা! আসল, তরতাজা, জীবন্ত মা!

'মা-মণি' বলে ছুটল লিসা তাঁর দিকে। দু'হাত মেলে আঁকড়ে ধরল মার গলা।

'আমার ছোট্ট সোনা!' ফিসফিস করে বললেন তরুণী মা। 'শেষ পর্যন্ত, শেষ পর্যন্ত ফিরে পেলাম তোমাকে!' বলতে বলতে তাঁর দু'চোখ ভরে গেল অশ্রুতে।

মেয়েটি আবেগভরে চুমু দিল মায়ের দু'গালে, শান্ত চোখ দু'টিতে, ঠোঁটে, চুলে, এমনকি ছোট্ট সুন্দর হ্যাটটিতে। হ্যাঁ, এমনকি হ্যাটেও!

হোটেল ইমপেরিয়ালের রেস্তোরাঁ থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত একটা সস্নেহ উত্তেজনা। একটা ছোট্ট মেয়ে। নিয়মিত খদ্দের থেকে আরম্ভ করে হোটেল কর্মচারী পর্যন্ত সবার আদরের পাত্রী। অপেরা হাউসের সঙ্গীত পরিচালক মি. প্যালফির মেয়ে। আবার সে বাড়ি এসেছে!

লোটি—মাফ কর—লিসা বসেছে ওর আগের জায়গায়। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দু'টো বড় গদিঅলা চেয়ারে। গপাগপ করে প্যানকেক খাচ্ছে—যেন ঐ খাওয়ার ওপর জীবন নির্ভর করছে ওর।

নিয়মিত খদ্দেররা একের পর এক ওর টেবিলে এলেন। কোঁকড়ানো চুলে মৃদু চাপড় দিলেন। কাঁধে হাত বুলালেন। জিজ্ঞেস করলেন ছুটি কেমন কাটল। মন্তব্য করলেন যে ভিয়েনায় বাবার কাছে থাকার যে আনন্দ তেমনটি আর কোথাও নেই। তাঁরা নানা ধরনের উপহার দিলেন ওকে। টফি, চকলেট, রঙিন পেন্সিল ইত্যাদি। একজন তো পকেট থেকে একটা পুরানো ধরনের সূচের ছোট্ট বাক্স বের করে ওকে দিলেন। একটুখানি আমতা আমতা করে বললেন যে জিনিসটা ছিল তাঁর মৃত দাদীর। তারপর মি. প্যালফির দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে তাঁরা চলে গেলেন নিজ নিজ টেবিলে। বেচারা নিঃসঙ্গ চাচারা! আজ তাঁরা সবাই সত্যিকার আনন্দের সাথে লাঞ্চ করবেন!

কিন্তু প্যালফির চাইতে বেশি খিদে আর কারও হয়নি। তিনি সব সময় জোর দিয়ে বলে এসেছেন যে সকল প্রকৃত শিল্পীরই একাকীত্ব বা নির্জনতা প্রয়োজন। সব সময় নিজের ভেঙে যাওয়া বিয়েটাকে তিনি ভুল, ঝামেলাপূর্ণ পদক্ষেপ ইত্যাদি ভেবে এসেছেন। কিন্তু আজ তাঁর একটি উষ্ণ পারিবারিক অনুভূতির অভিজ্ঞতা

হল। এটা অত্যন্ত 'অ- শিল্পীসুলভ'। লাজুক হাসি হেসে মেয়ে তাঁর হাত ধরল। যেন তিনি পালিয়ে যাবেন। এসময় তাঁর মনে হল তিনি যেন আইরিশ স্ট্যু খাচ্ছেন না, গোল গুলগুলা পিঠা গিলছেন।

এই তো ওয়েটার ফ্রাঞ্জ নিয়ে এল আরেকটা প্যানকেক।

লোটি চুল ঝাঁকিয়ে বলল, 'মি. ফ্রাঞ্জ! আমি বোধ হয় আর পারব না।'

'কি বলছ, লিসা! সবে তো মাত্র পাঁচটা হল,' বলল ওয়েটারটি অনুযোগের সুরে।

সামান্য আহত মনে পঞ্চম প্যানকেকটি নিয়ে ফ্রাঞ্জ ফিরে গেল রান্নাঘরে। লোটি সাহস সঞ্চয় করে বলল, 'বুঝলে, বাবা, এবার থেকে তুমি যা খাও আমি তাই খাব।'

'বল কী? আমি যখন শেঁকা হ্যাম খাব তখন কি করবে? ওটা তো তোমার পছন্দ হয় না, খারাপ লাগে।'

'তুমি শেঁকা হ্যাম খেলে,' বলল মেয়েটি অসহায়ভাবে। 'আমি আবার প্যানকেক খাব।' (নিজের বোন সাজা সহজ ব্যাপার নয়!) তারপর কি হল?

তারপরে ডাক্তার স্ট্রোবেল এলেন পেটার্কিনকে নিয়ে। পেটার্কিন হচ্ছে একটা কুকুর। 'দেখ, পেটার্কিন,' বললেন ডাক্তার হেসে। "কে এসেছে দেখ! যাও, লিসাকে হাউ-ডু-য়ু ডু" বলো।'

পুরানো বন্ধু লিসাকে হাউ-ডু-য়ু-ডু বলতে ছুটে এল পেটার্কিন লেজ নাড়তে নাড়তে।

চমৎকার হাউ-ডু-য়ু-ডু ই বটে! প্যালফিদের টেবিলে এসে ছোট্ট মেয়েটিকে শুঁকেই ঘুরে দাঁড়াল পেটার্কিন। দৌড়ে ফিরে গেল প্রভুর কাছে।

বিরক্ত হয়ে ডাক্তার স্ট্রোবেল বললেন, 'কি বুদ্ধু কুকুরটা। নিজের সেরা বন্ধুকেও চিনতে পারে না! সপ্তা দু'সপ্তা গ্রামে কাটিয়ে এল মেয়েটা- এতেই ভুলে গেল? অথচ লোকে কুকুরের বুদ্ধি সম্পর্কে কত বাজে কথাই না বলে!'

কিন্তু লোটি মনে মনে বলল, 'ভাগ্য ভাল যে কুকুররা ডাক্তারদের মত বুদ্ধিমান নয়।'

মি. প্যালফি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ট্রাঙ্ক, উপহারের জিনিস, একটা পুতুল, লোটির স্নানের পোশাকভর্তি একটা ব্যাগসহ তাঁর রোটেনটার্ন স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে পৌঁছলেন। মি. প্যালফির হাউস-কীপার রোসা মেয়েটিকে আবার দেখে আত্মহারা হয়ে গেলেন আনন্দে।

কিন্তু লিসার কাছে যা শুনেছে তাতে লোটি জানে যে রোসা হচ্ছে একটা দু'মুখো বেড়াল। বাবা অবশ্য এটা লক্ষ করেন না। পুরুষরা কখনও কিছুই লক্ষ করে না।

পকেট থেকে একটা টিকেট বের করে মেয়ের হাতে দিয়ে মি. প্যালফি বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় আমি হাম্পারডিঙ্ক-এর "হানসেল অ্যাণ্ড গ্রেটেল" পরিচালনা করব। রোসা তোমাকে অপেরা হাউসে নিয়ে যাবে, অনুষ্ঠানের পরে বাড়ি নিয়ে আসবে।'

একগাল হেসে লোটি বলল, 'উফ্! যেখানে বসব সেখান থেকে তোমাকে দেখতে পারব তো?'

'নিশ্চয়ই পারবে।'

'মাঝে মাঝে চাইবে তো আমার দিকে?'

'অবশ্যই।'

'তুমি আমার দিকে তাকালে আমি হাত দোলাতে পারব তো?'

'হ্যাঁ, আমিও তোমার দিকে হাত নাড়ব, লিসা।'

এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোন। এক মহিলা কথা বলছেন অন্য প্রান্ত থেকে। লোটির বাবা এক এক শব্দে জবাব দিচ্ছেন। কিন্তু রিসিভার রেখেই যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। ঘণ্টা কয়েক তাঁকে একা থাকতে হবে। কারণ তিনি শুধু 'কণ্ডাক্টরই' নন—সুরকারও বটে! তাকে সঙ্গীত এবং সুর-রচনা করতে হবে। আর বাড়িতে বসে তা করা মোটেই সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। না, তিনি সুর-রচনা করেন তাঁর রিং স্ট্রীটের স্টুডিওতে বসে। ঘরটা তিনি নিয়েছেন শুধু এই কারণে। কাজেই···

'আগামীকাল লাঞ্চে দেখা হবে তোমার সঙ্গে ইমপেরিয়ালে।'

'অপেরাতে তোমার দিকে হাত নাড়তে পারব তো, বাবা?'

'অবশ্যই, মা-মণি। কেন পারবে না?'

মেয়ের গম্ভীর মুখে চুমু দিয়ে হ্যাটটি মাথায় চাপালেন তিনি।

দড়াম করে বন্ধ হল দরজাটা।

মেয়েটি ধীরে হেঁটে গেল জানালায়। ভাবতে লাগল জীবনের কিছু অস্বস্তিকর ব্যাপার নিয়ে। ঐ ব্যাপারগুলোর জন্যে ওর মা, ওর বাবা ঘরে বসে কাজ করতে পারেন না। মা-বাবাগুলো কত ভাল!

কিন্তু লোটির মনে জোর আছে। সে কাজ করতে জানে। এসব সে পেয়েছে মায়ের শিক্ষার গুণে। কাজেই দুশ্চিন্তা সে ঝেড়ে ফেলল মন থেকে। নোটবই হাতে নিয়ে লিসার নির্দেশ মত সে ভিয়েনার চমৎকার পুরানো ফ্ল্যাটটির প্রতিটি কামরা আবিষ্কারে লেগে গেল।

দেখা শেষ করে অভ্যাসবশে বসে পড়ল সে। রান্নাঘরের টেবিলে পড়ে ছিল হাউস-কীপিং-এর খাতাটা। ওটা তুলে নিয়ে হিসেবগুলো পরীক্ষা করতে লাগল এক এক করে।

এটা করতে গিয়ে দু'টো জিনিস নজরে পড়ল ওর। প্রথমটা হল, হাউসকীপার রোসা প্রতিটি পৃষ্ঠায় হিসেবে ভুল করেছে। দ্বিতীয় হল, প্রতিটি ভুলের দরুন লাভ হয়েছে রোসার।

'কি হচ্ছে, এসবের মানে কি?' জিজ্ঞেস করল রোসা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে।

'তোমার খাতার হিসেবগুলো মিলিয়ে দেখছি,' বলল লোটি নিচু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে।

'বাজে ঝামেলা। অঙ্ক কষবে স্কুলে। ওটাই অঙ্কের জায়গা,' গলা চড়িয়ে বলল রোসা ক্রুদ্ধভাবে।

লোটি শান্তভাবে ঘোষণা করল, 'তোমার খাতার হিসেব আমি সব সময় মিলিয়ে দেখব,' বসে পড়ল সে রান্নাঘরের চেয়ারে। 'আমাদের শিক্ষক বলেন, স্কুলে আমরা শিখি, কিন্তু স্কুলের জন্যে নয়,' এরপর সে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল রান্নাঘর থেকে।

হতভম্ব রোসা তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

প্রিয় পাঠকরা, ছেলেবুড়ো নারী-পুরুষরা! আমি দুঃখের সাথে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে লিসা আর লোটির মা-বাবা সম্পর্কে আপনাদেরকে কিছু বলার সময় হয়ে গেছে। বিশেষ করে, ওরা কেমন করে বিচ্ছিন্ন হল সেই বিষয়ে।

এ সময় কোন বয়স্ক মানুষ যদি তোমাদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে বলে ওঠেন, 'আরে ঐ লোকটা! সে কেমন করে লিখবে অমন সব কথা শিশুদের নিয়ে! তাহলে বয়স্ক মানুষটাকে এ কথাগুলো পড়ে শুনিয়ে দিয়োঃ শার্লি টেম্পলের বয়স যখন সাত কি আট, তার আগেই সে হয়ে যায় চিত্রতারকা। ওর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দুনিয়াময়। ফিল্ম-কোম্পানিগুলোকে আয় করে দেয় কোটি কোটি ডলার। কিন্তু যখন সে চাইল মায়ের সঙ্গে একটা সিনেমা হলে গিয়ে শার্লি টেম্পলের ছবি দেখতে, ওকে ঢুকতে দেয়া হল না। কেন? না, ওর বয়স বড্ড কম। অত ছোট্ট কাউকে সিনেমা দেখতে দেয়া নিষিদ্ধ। সে ফিল্ম বানাতে পারে। সেটা নিষিদ্ধ নয়। ওটা করার জন্যে যথেষ্ট বয়স ওর হয়েছে।'

শার্লি টেম্পলের এই দৃষ্টান্ত আর লিসা-লোটির বাবা-মায়ের ও তাঁদের ডিভোর্সের মধ্যেকার সম্পর্কটা তোমাদের ঘাড়ের ওপর উঁকি মারা বয়স্ক মানুষটি না বুঝতে পারেন। না বুঝলে আমার হয়ে তাঁকে বলে দিয়ো যে দুনিয়াতে বিচ্ছিন্ন

মা-বাবার সংখ্যা অনেক। এবং তাঁদের বিয়ে ভেঙে যাবার ফলে কষ্টভোগ করছে অসংখ্য শিশু। আবার অনেক শিশু আছে যারা কষ্ট ভোগ করছে বাবা-মায়ের ডিভোর্স হচ্ছে না বলে। এসব ক্ষেত্রে শিশুরাই হয় দুঃখ কষ্টের শিকার। তাই শিশুদেরকে এগুলো সম্পর্কে বুঝিয়ে না বলা সুবুদ্ধির কাজ তো নয়ই, বরং অন্যায়।

এখন আগের কথায় ফিরে যাই। আর্নল্ড প্যালফি কেবল অর্কেস্ট্রার কনডাক্টরই নন—একজন শিল্পীও। আর সবাই জানে যে শিল্পীরা একটু অদ্ভুত ধরনের জীব। এটা সত্য যে তিনি চওড়া কিনারঅলা হ্যাট কিংবা চ্যাপ্টা টাই পরেন না। তাঁর পোশাক-আশাক চমৎকার, সুন্দর।

কিন্তু ভেতরের জীবন? ওটা জটিল। তাঁর ভেতরের জীবন—সে এক সম্পূর্ণ আলাদা কেচ্ছা! সুর-রচনার কোন চিন্তা মাথায় এলেই হল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলে যাবেন নির্জন জায়গায়, যাতে ওটা লিখে নিতে এবং ওটাকে বিকশিত করে তুলতে পারেন। ওরকম চিন্তা আসতে পারে যখন তিনি কোন বড় পার্টিতে গেছেন। পার্টি যিনি দিচ্ছেন তিনি প্রশ্ন করেন 'প্যালফির হল কি?' কেউ জবাব দেয়, 'ওর মাথায় হয়ত আইডিয়া এসেছে।' তিক্ত হাসি হাসেন পার্টিদাতা। মনে মনে ভাবেন, 'কেমন অভদ্র আচরণ! মাথায় আইডিয়া এলেই পালিয়ে যাওয়া যায় না!'

কিন্তু মি. প্যালফি পালাতে পারেন এবং পালিয়ে যান।

সদ্য বিবাহিত অবস্থায়ও নিজের ফ্ল্যাট থেকে তিনি পালিয়ে যেতেন। তিনি একই সাথে তরুণ প্রেমিক, উচ্চকাঙ্ক্ষী, সুখী এবং পাগলাটে।

তারপর এল সেই সময়টা, যখন ঘরে দুই যমজ সারাক্ষণ চেঁচাচ্ছে আর ভিয়েনা ফিলহারমোনিক অর্কেস্ট্রা তাঁর প্রথম পিয়ানো কনসার্টের অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছে। তিনি তাঁর গ্র্যাণ্ড পিয়ানো সরিয়ে নিলেন রিং স্ট্রীটের এক স্টুডিওতে। শিল্পের খাতিরে বাধ্য হয়েই স্টুডিওটা ভাড়া নিয়েছিলেন তিনি।

ঐ সময় তাঁর মাথায় অনেক অনেক সুর-চিন্তা বা আইডিয়া গিজগিজ করছিল। ফলে তরুণী বৌ আর কাঁদুনে যমজ দু'টির কাছে আসা প্রায় ছেড়েই দেন।

লিসালোট প্যালফির বয়স তখন মাত্র বিশ বছর। তাঁর কাছে ব্যাপারটা খুব সুখকর মনে হল না। তদুপরি, তাঁর মাত্র বিশ বছর বয়সী কানে এ খবর পৌঁছল যে স্বামী স্টুডিওতে বসে কেবল সঙ্গীতই রচনা করেন না। মি. প্যালফি গায়িকাদের গলা, স্বরযন্ত্র ইত্যাদি নিয়েও গবেষণা করছেন এবং ওরাও তাঁকে খুব মিষ্টি লোক ভাবছে। মরিয়া হয়ে মিসেস প্যালফি ডিভোর্সের আবেদন করলেন।

কনডাক্টর প্যালফি চেয়েছিলেন সৃষ্টিশীল শান্তি। এখন তিনি সেটা হারালেন। ডিভোর্সের পরে যমজ দু'মেয়ের একটি তাঁর ভাগে পড়ল। ওটির দেখাশোনার জন্য রোটেনটার্ন স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে তিনি একজন যোগ্য নার্স রেখে দিলেন। এরপর তিনি যা চেয়েছিলেন তাই হল। কেউ আর রইল না তাঁকে বিরক্ত করার।

হঠাৎ এটাও তাঁর ভাল লাগল না। আহা, এই শিল্পীগুলোকে নিয়ে বড় মুশকিল! ওরা জানে না আসলে কি চায়। যাই হোক, মি. প্যালফি সঙ্গীত-রচনা আর অর্কেস্ট্রা পরিচালনা চালিয়ে গেলেন। কঠোর পরিশ্রমের ফলে বছরে বছরে খ্যাতি তাঁর বেড়ে চলল। তাছাড়া, খেয়াল চাপলে একেক সময় তিনি চলে যান তাঁর রোটেনটার্ন স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে। খেলা করেন বাচ্চা মেয়ে লিসার সঙ্গে।

মিউনিখে আর্নল্ড প্যালফির কোন কনসার্টের অনুষ্ঠান হলেই লিসালোট হর্ন টিকেট কেনেন। পেছনের একটা সস্তা সিটে বসে মাথা নিচু করে শোনেন। এভাবে প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গীত শুনে জানতে পারেন যে ভদ্রলোক মোটেও সুখী হননি। সাফল্য লাভ সত্ত্বেও। এবং একা হয়েও।

## ছয়

মেয়েকে তাঁর ম্যাক্স ইম্যানুয়েল স্ট্রীটের ছোট্ট ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়েই মিসেস লিসালোট হর্ন তড়িঘড়ি করে এবং নিতান্ত অনিচ্ছায় ফিরে গেলেন অফিসে। সেখানে কাজ অপেক্ষা করছে তাঁর জন্যে। কাজ কারও জন্যে অপেক্ষা করা পছন্দ করে না।

লিসা, মাফ করো, লোটি সতর্কভাবে তাকিয়ে দেখল ফ্ল্যাটটা। চাবি তুলে নিল। মায়ের পার্স আর একটা ব্যাগ নিয়ে বেরুল বাজার করতে।

প্রিন্স ইউজিন স্ট্রীটের কোনায় কসাই হুবারের দোকানে গিয়ে কিনে নিল আধ পাউণ্ড গরুর মাংস, সিনার মাংস, কিছু কিডনি আর কয়েকটি হাড়। এখন সে হন্যে হয়ে খুঁজছে মিসেস ওয়াগেন্টাল-এর সব্জির দোকান। ওখানে সে কিনবে কিছু সব্জি, নুডলস্ আর লবণ।

লোটি হর্ন রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে নোটবই খুলে পড়তে লাগল। এটা দেখে ওর স্কুলের সাথী অ্যানি হ্যাবারসেটজার বিস্মিত হল।

'লোটি, তুমি কি রাস্তায় হোমওয়ার্ক কর নাকি?' প্রশ্ন করল অ্যানি। 'ছুটি যে এখনও শেষ হয়নি তা জান না?'

হতভম্ব হয়ে লিসা তাকাল ওর দিকে। আচ্ছা ধরো, তুমি একজনকে চেন

বলে ধরে নেয়া হচ্ছে। অথচ তাকে তুমি জীবনে কখনও দেখনি। এখন সে যদি রাস্তায় তোমার সঙ্গে কথা জুড়ে দেয় তাহলে কি মাথা ঠিক থাকবে? লিসারও সেই অবস্থা হল। তবে সামলে উঠল লিসা। হাসিমুখে বলল, 'হ্যাল্লো! এস না আমার সঙ্গে। আমি কিছু সব্জি কেনার জন্যে মিসেস ওয়াগেন্টালের দোকানে যাচ্ছি।' অপরিচিত মেয়েটির বাহুতে বাহু জড়াল সে। মেয়েটি কিছুই টের পেল না। লিসাকে সে নিয়ে গেল সব্জির দোকানে।

লোটি হর্ন ছুটি কাটিয়ে ফিরেছে দেখে স্বভাবতই খুশি হলেন মিসেস ওয়াগেন্টাল। লিসার কেনাকাটা শেষ হল। মিসেস ওয়াগেন্টাল মেয়ে দু'টিকে টফি দিলেন। বললেন, মিসেস হর্ন আর মিসেস হ্যাবার সেটজার-এর কাছে যেন তাঁর শুভেচ্ছা পৌঁছে দেয় ওরা।

একটা বোঝা নেমে গেল লিসার মনের ওপর থেকে। অবশেষে সে জানতে পেরেছে যে সঙ্গের মেয়েটি অ্যানি হ্যাবারসেটজার। (এর সম্পর্কে নোট বইতে লেখা আছেঃ অ্যানি হ্যাবারসেটজার—ওর সাথে আমার তিনবার ঝগড়া হয়েছে। ছোট মেয়েদের ওপর জুলুমবাজি করে, বিশেষ করে ক্লাসের সবচেয়ে ছোট মেয়ে এল্‌সা মের্ক-এর ওপর)।

বাড়ির সামনে এসে বিদায় নেয়ার সময় লিসা মেয়েটিকে বলল, 'আমার যতদূর মনে পড়ছে, অ্যানি, এল্‌সা মের্ক ইত্যাদির ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমার ইতিমধ্যেই তিনবার ঝগড়া হয়ে গেছে। কি বলছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। এর পরে আমি কেবল মুখই চালাব না, আরও কিছু...' বাকিটা না বলে হাতের ভঙ্গি করে দৌড় মারল সে ফ্ল্যাটের দিকে।

'সেটা দেখা যাবে,' রেগেমেগে অ্যানি বলল মনে মনে। 'কাল সকালেই দেখা যাবে। ছুটির মধ্যে ওর মাথাটা নিশ্চয়ই বিগড়ে গেছে।'

লিসা রাঁধছে। মায়ের অ্যাপ্রন পরে লাটিমের মত ঘুরছে গ্যাস-কুকার আর গ্যাস-জেট-এর মাঝখানে। গ্যাস-জেটের ওপর সসপ্যানগুলোতে পানি গরম হচ্ছে। রান্নার বইটা পড়ে আছে টেবিলের ওপর। কয়েক মিনিট পর পর সসপ্যানের ঢাকনা খুলে দেখছে সে। হিসহিস শব্দে ফুটন্ত পানি উপচে পড়তেই লাফিয়ে সরে গেল সে। নুডলস্-এ কতখানি লবণ দেবে? বইয়ে লেখা আছে, 'আধা টেবিল-চামচ'। কতটুকুন টেস্টিং সল্ট? 'এক চিমটে!' কিন্তু এক চিমটে কতখানি সে জানবে কেমন করে? এরপর বইয়ে লেখা রয়েছে, 'একটা জায়ফল গুঁড়ো কর।' কিন্তু হামানদিস্তা কই?

সে ড্রয়ারগুলো হাতড়াল, লাফ দিয়ে চেয়ারগুলোতে উঠল, সবগুলো টিন কৌটা খুলে দেখল, দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাল। চেয়ার থেকে নামল। খপ্ করে তুলে নিল একটা ফর্ক। ওটা দিয়ে ওল্টাল একটা ঢাকনা। ভুস করে বেরুল

আগুনের মত গরম বাষ্প। আঙুল পুড়ে গেল। 'উফ' করে চেঁচিয়ে উঠল সে। ফর্ক দিয়ে গরুর মাংস গাঁথার চেষ্টা করল। নাহ, এখনও নরম হয়নি।

ফর্কটা মুঠিতে ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। কি খুঁজছে? ও হ্যাঁ, জায়ফল আর হামানদিস্তা। আরে কি কাণ্ড! ওটা কি পড়ে আছে নিরীহভাবে রান্নার বইয়ের পাশে? সব্জি। ওগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে ছেড়ে দিতে হবে ঝোলের মধ্যে। ফেলে দিল ফর্ক, তুলে নিল ছুরি। মাংসটা কি সেদ্ধ হল? তাছাড়া, জায়ফল আর হামানদিস্তাই বা কোথায়? হায় ঈশ্বর, কোথায় ওগুলো? সব্জিগুলোকে প্রথমে ধুতে হবে। গাজরগুলোকে ছুরি দিয়ে চাঁছতে হবে। 'উহ্…!' হাঁ, খেয়াল রাখতে হয় হাতটা যাতে না কাটা যায়। আর মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে সসপ্যান থেকে তুলে নিয়ে হাড় ফেলে দিতে হয়। এ কাজের জন্য দরকার ছাঁকনির। এদিকে আধ-ঘণ্টার মধ্যে মা এসে পড়বেন। তাঁর পৌঁছার বিশ মিনিট আগে নুডলস ছাড়তে হবে ফুটন্ত পানিতে। কিন্তু জায়ফল কই? কোথায় গেল ছাঁকনি? হামানদিস্তাই বা কোথায়?

লিসা ধপাস করে বসে পড়ল রান্নাঘরের চেয়ারে। ওরে লোটি! নিজের বোন সাজা সোজা ব্যাপার নয়! আহ্, হোটেল ইমপেরিয়াল…ডক্টর স্ট্রোবেল… পেটার্কিন…ফ্রাঞ্জ…আর বাবা…বাবা…বাবা…

ঘড়ি চলছে টিক টিক শব্দে।

দুই হাত মুঠো করে মন শক্ত করে আবার শুরু করার জন্য উঠে দাঁড়াল লিসা। আপন মনে গোঁ গোঁ করে বলল, 'আমি যদি একাজটাই করতে না পারি…'

কিন্তু রান্নার ব্যাপারে গোলমালটা ওখানেই। উঁচু স্তম্ভ থেকে লাফিয়ে পড়তে চাইলে মন শক্ত থাকা চাই। কিন্তু গরুর মাংস আর নুডলস রাঁধতে গেলে ইচ্ছা শক্তিই যথেষ্ট নয়।

দিনের কাজের শেষে শ্রান্ত দেহে বাড়ি ফিরে এলেন মিসেস হর্ন। দেখলেন, তাঁর খুদে হাউস-কীপার হাসিমুখে বসে নেই তাঁর অপেক্ষায়। তিনি দেখলেন সম্পূর্ণ ক্লান্ত, সামান্য আহত, বিভ্রান্ত, বিধ্বস্ত একটি দুর্দশার প্রতিমূর্তি। যার কান্নার আবেগে কুঞ্চিত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল কয়েকটি শব্দ, 'মা, রাগ কোরো না! মনে হয় রান্না আমি ভুলে গেছি!'

আশ্চর্য হয়ে মা বললেন, 'কিন্তু লোটি, রান্না তুমি ভুলতে পার না। তবে আশ্চর্য হবার সময় নেই। তাঁকে মেয়ের অশ্রু মোছাতে হল। ঝোলে লবণ দিতে হল। অতি-সেদ্ধ মাংসে ঝোল মেশাতে হল। ড্রেসার থেকে প্লেট, ছুরি, ফর্ক আনতে হল। আরও অনেক কিছুই করতে হল।

খাওয়া শেষে শোবার ঘরে টেবিল ল্যাম্পের নিচে বসল মা-মেয়ে। নুডলস খেতে খেতে প্রবোধ দেয়ার ভঙ্গিতে মিসেস হর্ন বললেন, 'সব কিছু সত্ত্বেও স্বাদ-টা

মন্দ হয়নি, তাই না?'

একটুখানি হাসির রেখা ফুটে উঠল মেয়ের মুখে। 'সত্যি স্বাদ লাগছে, মা?'

ওকে আশ্বস্ত করার জন্য হাসলেন মা। বললেন, 'লাগছে।'

এতক্ষণে নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল লিসার। হঠাৎ মনে হল আজকের মত স্বাদের খাবার জীবনে সে আর খায়নি। হোটেল ইপরেরিয়ালের বিখ্যাত প্যানকেকও এত স্বাদের নয়।

'দুয়েকদিন আমি নিজেই রান্না করব,' বললেন ওর মা। 'আমি কি কি করি তুমি দেখ। তারপরে ছুটির আগে যেমন রাঁধতে তেমনি রান্না করতে পারবে।'

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে লিসা বলল, 'হয়ত আরও ভাল রাঁধব।'

নুডলস শেষ করে সবকিছু ধোয়ামোছা করল দু'জনে। লিসা মাকে বলল হলিডে-হোমে কি মজাই না ওরা করেছে (কিন্তু যমজ বোনটির ব্যাপারে একটি কথাও বলল না।)

এদিকে লোটি, লিসার সবচেয়ে সুন্দর ফ্রকটি পরে ভিয়েনা অপেরা হাউসে বসে আছে। ড্রেস-সার্কেলের বক্সে সামনের দিকে ঝুঁকে। জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে আছে অর্কেস্ট্রার দিকে। সেখানে মি. প্যালফি হ্যানসেল অ্যাণ্ড গ্রেটেল কণ্ডাক্ট করছেন।

সান্ধ্য পোশাকে কি সুন্দর লাগছে বাবাকে। বাজিয়েরা কেমন ভালভাবেই না মেনে চলছে তাঁকে, যদিও তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বেশ বুড়ো ভদ্রলোকও আছেন। তিনি যখন প্রভুর মত, হুমকি দেয়ার ভঙ্গিতে হাতের ছড়ি ঘোরালেন, অমনি তারা বাজাল বজ্রের আওয়াজে। তিনি আস্তে করে ছড়ি ঘোরালেন, তারা বাজাল সন্ধ্যার বাতাসের মত মৃদু মৃদু শব্দে। কি ভয়ই না করে লোকগুলো বাব্বাকে! অথচ মিনিট কয়েক আগে বক্সের দিকে চেয়ে হাত নাড়ার সময় তাঁকে কেমন আমুদে মনে হচ্ছিল।

বক্সের দরজা খুলে গেল।

একজন সৌখিন তরুণী মহিলা এসে বসে পড়লেন সামনের সারিতে। লোটি ফিরে তাকাতেই তিনি হাসলেন।

লজ্জা পেয়ে লোটি মুখ ফিরিয়ে দেখতে লাগল ওর বাবার অর্কেস্ট্রা পরিচালনা।

তরুণী মহিলাটি একজোড়া অপেরা-গ্লাস ও এক বাক্স চকলেট বের করলেন। তারপর বের করলেন একটা প্রোগ্রাম, পাউডারের কৌটা। এইভাবে একটার পর একটা জিনিস বের করতে করতে তিনি বক্সের সামনের দিকটা দোকানের মত বানিয়ে ফেললেন।

প্রস্তাবনা শেষ হতেই শ্রোতারা উচ্চকণ্ঠে হর্ষধ্বনি করল। কনডাক্টার প্যালফি বারে বারে মাথা নোয়ালেন। তারপর তিনি আবার ছড়ি তুলে তাকালেন বক্সের দিকে।

লোটি লাজুক ভঙ্গিতে হাত নাড়ল। এবার তিনি আরও মিষ্টি করে হাসলেন।

এই সময় সে লক্ষ করল, আরও একজন হাত নাড়ছে।

উনি কি বাবার উদ্দেশ্যেই হাত নাড়ছেন? এটা কি সম্ভব যে বাবা অমন মিষ্টি করে হাসলেন এই তরুণী মহিলাটিকেই লক্ষ করে? তাঁর ছোট্ট মেয়েটিকে লক্ষ করে নয়? এই অজানা মহিলাটির কথা লিসা কখনও বলেনি কেন? এঁর সাথে অল্প কদিন আগেই বাবার পরিচয় হয়েছে? তাই যদি হয় তাহলে অমন ঘনিষ্ঠ জনের মত উনি হাত নাড়ছেন কেমন করে? লোটি লিখে নিল মনে মনে: 'আজ রাতেই লিখবে লিসাকে। জিজ্ঞেস করতে হবে সে কিছু জানে কিনা। কাল স্কুলে যাবার পথে ডাকে দেবে।

আবার পর্দা উঠল। হ্যানসেল অ্যাণ্ড গ্রেটেল-এর প্রতি সমবেদনায় উদ্বেল হল ওর মন। দম বন্ধ হয়ে এল লোটির। মঞ্চে দেখা যাচ্ছে বাবা-মা তাঁদের বাচ্চাদেরকে বনবাসে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। ওদেরকে ত্যাগ করছেন। তবু ওরা বাবা-মাকে ভালবাসে। এত খারাপ কি করে হতে পারলেন বাবা-মা? কিংবা আসলেই কি তাঁরা খারাপ? নাকি তাঁদের কাজটাই শুধু খারাপ? বাচ্চাদের বনবাসে পাঠাতে দুঃখ পাচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু তাহলে পাঠাচ্ছেনই বা কেন?

দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে লোটির উত্তেজনা বাড়তে লাগল। সে পুরাপুরি জানে না, ওর মনে যে ঝড় বইছে সেটা মঞ্চের ঐ বাচ্চা দু'টি ও তাদের মা-বাবার কারণে নয়। এর কারণ ও নিজে, ওর যমজ বোন এবং নিজের মা-বাবা। তাঁরা যা করেছেন সেটা করার অধিকার কি তাঁদের ছিল? মা মোটেই দুষ্ট প্রকৃতির নন। বাবাও নন। তবুও তাঁরা যা করেছেন সেই কাজটি খারাপ। মঞ্চের কাঠুরিয়া আর ওর বৌটি গরীব। এত গরীব যে বাচ্চাদের জন্য খাবার কিনতে পারে না। কিন্তু ওর বাবা? তিনিও কি গরীব ছিলেন?

পরের দৃশ্যে দেখা গেল হ্যানসেল পৌঁছে গেছে জিঞ্জার-ব্রেড বাড়ির সামনে। দেয়াল খুঁটে তুলে নিয়েছে কয়েক টুকরা আদার গন্ধঅলা পিঠা। অমনি চমকে উঠল ওরা ডাইনীর গলার আওয়াজ শুনে। এ সময় মিস আইরিন গেরল্যাখ—ঐ সৌখিন তরুণী মহিলাটি—লোটির দিকে ঝুঁকে চকলেটের বাক্সটি ঠেলে দিলেন ওর দিকে। ফিসফিস করে বললেন, 'তোমারও কি কিছু খেতে ইচ্ছা করছে?'

চমকে উঠে ওপর দিকে তাকিয়ে সে দেখল, মহিলাটির মুখ ওর মুখের কাছে। আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে ফেলল সে। কিন্তু ওর হাত লাগল চকলেটের বাক্সে। বাক্সটি ছিটকে পড়ে গেল নিচে। ওটা থেকে ঝুরঝুর করে

চকলেট ঝরে পড়ল স্টলগুলোর ওপর! স্টলের লোকেরা চোখ তুলে তাকাল ওপরের দিকে। চাপা হাসি মিশে গেল বাজনার শব্দের সাথে। আধা-বিব্রত আধা-বিরক্ত হয়ে হাসলেন মিস গেরল্যাখ।

লোটির দেহ শক্ত হয়ে গেল ভয়ে। শিল্পের বিপজ্জনক জাদু থেকে হঠাৎ টান মেরে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে ওকে। বাস্তবতার বিপজ্জনক জগতে এসে পড়েছে সে।

'মাফ করবেন,' বলল সে বিড়বিড় করে।

ক্ষমার হাসি হেসে মহিলাটি বললেন, 'ওতে কিছু যায় আসে না, লিসা।'

মহিলাটি বোধ হয় ডাইনীই হবে। মঞ্চেরটির চাইতে আরও সুন্দর ডাইনী।

মিউনিখে লিসার প্রথম রাত। সে শুয়ে আছে বিছানায়। ওর মা বসে আছেন বিছানার ধারে। 'এখন ঘুমাও, লোটি। গভীর ঘুমে সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখ,' বললেন তিনি।

বিপরীত দেয়ালের সাথে লাগানো আরেকটি বড় বিছানা। ওটার ওপর মা-র নাইট-গাউনটা পড়ে আছে।

'আমি আসছি, তুমি ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে,' বললেন তিনি।

মা-র গলা জড়িয়ে ধরে চুমু দিল লিসা। তারপর আরেকটা, আরেকটা। 'গুড-নাইট, মা!'

তরুণী মা-টি মেয়েকে বুকে চেপে ধরে বললেন, 'তুমি ফিরে আসায় কি যে খুশি লাগছে। তুমিই তো আমার সব!'

ঘুমে ঢলে পড়ল লিসার মাথা। লিসালোট হর্ন বিছানার চাদরগুলো গুঁজে দিলেন। কান পেতে শুনলেন মেয়ের নিঃশ্বাসের শব্দ। তারপর চুপচাপ উঠে নীরবে চলে গেলেন শোবার ঘরের বাইরে। তাঁর এখনও অনেক কাজ বাকি।

লোটিকে প্রথম বারের মত শোয়াল অসন্তুষ্ট রোসা। একটু পরেই চুপি চুপি উঠে পড়ল সে। কাল ভোরে যে চিঠিটা ডাকে দেবে ওটা লিখে ফেলল। তারপর চট্ করে আবার ফিরে গেল লিসার বিছানায়। বাতি নিবানোর আগে কামরাটা আবার দেখে নিল ভাল করে।

ঘরটা প্রশস্ত। আকর্ষণীয়। কার্নিশের নিচে চার দেয়ালে রূপকথার নানা মূর্তি, খেলনাভর্তি একটা কাবার্ড, বইয়ের তাক, হোম-ওয়ার্কের ডেস্ক, একটা বড় খেলনা-দোকান, একটা সুন্দর পুরানো ফ্যাশনের ড্রেসিংটেবিল, পুতুলের প্যারামবুলেটর, পুতুলের বিছানা। কিছুরই অভাব নেই। সবই আছে। নেই শুধু একটি জিনিস যা থাকা দরকার।

সে কি একেক সময়—খুব গোপনে, যাতে মা সন্দেহ না করেন—ঠিক এরকম একটা ঘর মনে মনে চায়নি? এখন সেটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ ব্যথা, ঈর্ষা ও আকাঙ্ক্ষার ছুরি শেলের মত বিঁধল ওর হৃদয়ে। সে চায় বোনের মত এরকম এক ছোট্ট সাধারণ শোবার ঘর পেতে। তার আকাঙ্ক্ষা জাগল মায়ের গুড-নাইট চুমু নিয়ে ঘুমাতে। পাশের ঘরের দরজার নিচ দিয়ে আলোর রেখা দেখতে। মা যখন নিঃশব্দে ঐ ঘরের দরজাটা খুলে আঙুলের ওপর ভর দিয়ে এসে নাইট-গাউন পরে শুয়ে পড়েন তা দেখতে।

ওদের বিছানার কাছে, কিংবা অন্তত পাশের ঘরে বাবার বিছানাটা যদি থাকত! হয়ত তিনি নাক ডাকাতেন। সেটা কি ভালই না হত! সে জানত যে বাবা কাছেই আছেন। কিন্তু তিনি কাছে নেই। ঘুমাচ্ছেন অন্য এক ফ্ল্যাটে। রিং স্ট্রীটে। হয়ত ঘুমাচ্ছেন না। হয়ত ঐ ফ্যাশন-দুরস্ত চকলেট-মহিলাকে নিয়ে বসে আছেন কোন ঝকমকে কামরায়। মদ খাচ্ছেন, হাসছেন, নাচছেন ঐ মহিলাকে নিয়ে। নিজের ছোট্ট মেয়ের দিকে 'নড্' না করে ঐ মহিলার দিকে করছেন। অপেরা হাউসে যেমন করেছেন। অথচ তাঁর মেয়েটি কত খুশি হয়ে এবং ভয়ে ভয়ে বক্স থেকে হাত নেড়েছিল তাঁর দিকে।

ঘুমিয়ে পড়ল লোটি। স্বপ্ন দেখল একটা। দেখল, ঐ একই বিছানায় বসে সে চেয়ে আছে একটা দরজার দিকে আতঙ্ক-ভরা দৃষ্টিতে। সেই দরজা দিয়ে অনেক অনেক রুটিঅলা ঢুকছে। মাথায় ওদের সাদা টুপি, হাতে পাউরুটি। রুটির পর রুটি রাখছে ওরা দেয়ালের সঙ্গে খাড়া করে। আরও আরও রুটিঅলা আসছে—যাচ্ছে। রুটির পাহাড় গড়ে উঠছে ঘরের মধ্যে। কামরাটা ছোট হয়ে আসছে—ছোট হয়ে আসছে।

তারপর দেখল, ওর বাবা সান্ধ্য পোশাকে এসে দাঁড়িয়েছেন ওখানে। বেশ ফুর্তির সঙ্গে ছড়ি ঘুরিয়ে রুটিঅলাদের প্যারেড পরিচালনা করছেন। এসময় মা ছুটে এসে উদ্বেগের সাথে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু আর্নল্ড, এখন কি হবে?'

'বাচ্চাদেরকে দূর করতে হবে!' বললেন তিনি ক্রুদ্ধভাবে। 'কামরায় জায়গা নেই ওদের জন্য। বাড়িতে অনেক রুটি এসে গেছে।'

মা হাত কচলাতে লাগলেন। ওরা দুই বাচ্চা কাঁদতে লাগল হাপুস নয়নে।

'বেরিয়ে যা!' বলে চেঁচিয়ে হাতের ছড়ি উঁচু করলেন তিনি মারবার ভঙ্গিতে। তারপর বিছানাটি গড়িয়ে চলে গেল জানালার কাছে। গরাদহীন জানালা খুলে গেল। বিছানাসুদ্ধ খাট-টা উড়ে চলে গেল বাইরে।

ওটা উড়ে চলল বড় শহর, নদী, পাহাড় ডিঙিয়ে। মাঠ-প্রান্তর, পর্বতমালা, আর বন-জঙ্গলের ওপর দিয়ে। তারপর ওটা নামল মাটিতে। ঘন গাছপালায় ভরা এক বিশাল অরণ্যে। বনটা আদিম, জনশূন্য। চারদিকে অদ্ভুত পাখিদের ডাক,

হিংস্র পশুদের গর্জন। ভয়ে অবশ অচল হয়ে মেয়ে দু'টি বসে রইল বিছানার ওপর।

ঝোপের মধ্যে একটা মচ্‌মচ্‌ মড়মড় শব্দ উঠল।

দু'বোন চট্‌ করে বিছানার চাদরে মাথা ঢেকে শুয়ে পড়ল।

ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ডাইনী। কিন্তু এটা অপেরা হাউসের মঞ্চে দেখা সেই ডাইনীটা নয়। একে দেখাচ্ছে অনেকটা বক্সের চকলেট-মহিলাটির মত। ডাইনীটা তার অপেরা-গ্লাস দিয়ে জরিপ করল বিছানাটা। মাথা নাড়ল। হাসল উদ্ধতভাবে। হাত-তালি দিল তিনবার।

হাততালির সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্ধকার গভীর বনটা হয়ে গেল ঘাসে ছাওয়া রোদ-ঝলমল এক মাঠ। মাঠের মাঝখানে চকলেটের বাক্স দিয়ে তৈরি একটি বাড়ি। বাড়িটা চকলেট-বার দিয়ে তৈরি বেড়ায় ঘেরা। পাখিরা কিচির-মিচির করছে আনন্দে। খরগোশরা লাফাচ্ছে ঘাসে ঘাসে। পাখিদের বাসায় বাসায় সোনালি ডিম। একটি ছোট্ট পাখি উড়ে এসে বসল বিছানায়। এমন মিষ্টি সুরে গান ধরল যে লোটি আর লিসা থাকতে পারল না বিছানার চাদরের নিচে। প্রথমে ওরা নাকের আগাটুকু বের করল। তারপর দেখল সেই সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠ, সুন্দর সুন্দর খরগোশ, চকলেট-বাড়ি, চকলেট-বারের বেড়া। লাফ দিয়ে উঠে ছুটল বেড়ার দিকে।

লিসা বেড়া থেকে একটা বড় টুকরা ভেঙে নিয়ে লোভীর মত মুখে দিতে গেল।

অমনি বাড়ির ভেতর থেকে শোনা গেল ডাইনীর খলখল হাসি। ওরা চমকে উঠল। লিসা ফেলে দিল চকলেটের টুকরোটা।

আর তখনি মাঠের ওপর দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলেন মা, মস্ত ঝুড়ি ভর্তি পাউরুটি নিয়ে।

'থাম, বাচ্চারা!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি আতঙ্কে। 'ওগুলো বিষ-মাখানো!'

'আমাদের খুব খিদে পেয়েছে মা-মণি!'

'রুটি এনেছি তোমাদের জন্য। এগুলো খাও। অফিস থেকে ছাড়া পাইনি। তাই আরও আগে আসতে পারিনি,' বলে তিনি জড়িয়ে ধরলেন ওদেরকে। টেনে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন ওখান থেকে। হঠাৎ চকলেট-বাড়ির দরজা গেল খুলে। বাবা বেরিয়ে এলেন প্রকাণ্ড এক করাত নিয়ে। চিৎকার করে বললেন, 'বাচ্চাদের ছেড়ে দিন, মিসেস হর্ন!'

'ওরা আমার সন্তান, মি. প্যালফি!'

'আমারও,' জবাব দিলেন বাবা! ওদের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে তিনি বললেন, 'আমি বাচ্চাদেরকে কেটে সমান দু'খণ্ড করব। এই করাত দিয়ে। আমি

লোটির অর্ধেক, লিসার অর্ধেক পাব। আপনিও তাই পাবেন, মিসেস হর্ন!'

কাঁপতে কাঁপতে মেয়ে দু'টি আবার শুয়ে পড়ল বিছানায়।

মা দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে বিছানার সামনে দাঁড়ালেন বাধা দেয়ার ভঙ্গিতে। 'কাটতে দেব না, মি. প্যালফি!' বললেন তিনি।

মাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বাবা করাত চালাতে লাগলেন খাটের মাথার দিক থেকে। করাতের ঘষ ঘষ শব্দে বাচ্চাদের রক্ত হিম হয়ে গেল। কাটতে কাটতে এগিয়ে চলল করাত।

'হাত ধরাধরি করে আছ কেন? হাত ছেড়ে দাও,' হুকুম দিলেন বাবা।

করাত এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছে দু'বোনের পরস্পর জড়ানো হাতের কাছে। আরও, আরও কাছে। মাংস কেটে যাবার উপক্রম হল।

মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন ভগ্ন-হৃদয়ে।

বাচ্চাদের কানে এল ডাইনীর খিলখিল হাসির আওয়াজ।

তখন বাচ্চারা ছেড়ে দিল পরস্পরের হাত।

করাত কাটতে কাটতে চলে গেল পায়ের দিকে। খাটটা মাঝখান দিয়ে পুরাপুরি দু'ভাগ হয়ে দু'টো খাট হয়ে গেল। দু'খাটেরই চারটি করে পায়া।

'দুই যমজের কোনটিকে চান, মিসেস হর্ন?'

'দু'টোকেই! দু'টোকেই!'

'দুঃখিত,' বললেন বাবা। 'ন্যায্য ভাগ হবে। আপনি মন স্থির করতে না পারলে আমি করব। আমি এটাকে নেব। এটা কোন্‌টা তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এমনিতেই আলাদা করে ওদেরকে চিনতে পারি না।'

তিনি একটা খাট ধরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোন্‌টি?'

'লিসা!' বলল একজন চেঁচিয়ে। 'কিন্তু এ-কাজ তুমি করতে পার না!'

'না!' চিৎকার করে বলল লোটি। 'তুমি দু'ভাগ করতে পার না আমাদেরকে!'

'চুপ কর!' বললেন বাবা কঠোর স্বরে। 'বাপ-মা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।'

এরপর লিসার খাটটাকে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে তিনি চললেন চকলেট হাউসের দিকে। চকলেটের বেড়া আপনা-আপনি ফাঁক হয়ে গেল।

লিসা আর লোটি হতাশভাবে হাত নাড়ল একে অন্যের দিকে।

লোটি চিৎকার করে বলল, 'ফরগেট-মি-নট, মিউনিখ ১৮!'

বাবা আর লিসা অদৃশ্য হল চকলেট-বাড়ির ভেতরে। তারপর বাড়িটিও অদৃশ্য হয়ে গেল।

মা জড়িয়ে ধরলেন লোটিকে। তারপর হঠাৎ সন্দিগ্ধভাবে লোটির দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার দু'মেয়ের কোন্‌টি তুমি? তোমাকে লোটি বলেই মনে

হচ্ছে।'

'আমি লোটি!'

'না, লিসার মত লাগছে তোমাকে।'

'আমি লিসা!'

মা ভীত-চকিত দৃষ্টিতে তাকান মেয়ের চোখের দিকে। প্রায় বাবার স্বরে বলেন, 'একবার ঝাঁকড়া চুল, একবার বিনুনি! একই রকম মাথা—একই রকম নাক!'

এখন লোটির মাথার এক পাশে বিনুনি, অন্যপাশে ঝাঁকড়া চুল। গাল বেয়ে নামছে চোখের পানি। অসহায়ভাবে সে বলল, 'এখন আমি জানি না আমি কে!'

# সাত

অপরিচিত জগতে অচেনা মানুষদের মধ্যে দুই যমজ বোনের প্রথম দিন ও প্রথম রাতের পর কয়েক সপ্তা কেটে গেছে। এ সময়টায় প্রতিটি মিনিটে, প্রতিটি সাধারণ তুচ্ছ ঘটনায়, প্রতিটি সাক্ষাতে ওদের ধরা পড়ে যাবার ভয় ছিল। এ সপ্তাগুলো ওরা কাটিয়েছে দুরুদুরু বুকে, জরুরী ও অতিরিক্ত খবর চেয়ে একে অন্যকে অনেক চিঠি লিখে।

কিন্তু সব কিছু ভালভাবেই চলল। কিছুটা অবশ্য ভাগ্যের জোরে। লিসা 'আবার' ভাল রাঁধুনি হয়ে গেছে। মিউনিখের শিক্ষকরা মোটামুটি এ সত্যটা মেনে নিয়েছেন যে হর্ন মেয়েটা ছুটি থেকে ফিরে আলসে হয়ে পড়েছে। আগের মত গোছানো আর মনোযোগী নেই। তবে অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। পাল্টা জবাব দিতে দেরি করে না।

ভিয়েনার শিক্ষকরা অত্যন্ত খুশি হয়ে দেখছেন যে কনডাক্টর প্যালফির মেয়েটা ক্লাসে আগের চাইতে বেশি পরিশ্রমী হয়ে উঠেছে। অঙ্কে বেশ দক্ষতা দেখাচ্ছে। মাত্র গতকালই টিচারদের রুমে মিস গেস্টেট্নার জাঁক করে মন্তব্য করলেন, 'মিস ব্রাকবাউর, শিক্ষকতায় আগ্রহী যেকোন ব্যক্তির জন্য লিসা প্যালফির উন্নতিটা লক্ষ করা এক শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা। মেয়েটি ছিল অত্যন্ত চড়া মেজাজী। এখন হয়ে গেছে একেবারে শান্ত। ও এখন ধীর স্থির, হাসিখুশি এবং খাটিয়ে। জ্ঞানের তৃষ্ণা ওকে লেখাপড়ার প্রতি দারুণ মনোযোগী করে তুলেছে। ওর এই পরিবর্তন, মিস ব্রাকবাউর, একটি অসাধারণ ঘটনা। আর এই পরিবর্তন ঘটেছে বাইরের কোন চাপের ফলে নয়—ওর অন্তরের তাগিতে।'

মিসেস ব্রাকবাউর সায় দিয়ে বললেন, 'চরিত্রের এই বিকাশ, এই পরিবর্তন ধরা পড়ছে লিসার হাতের লেখাতেও। আমি সব সময় বলি যে হাতের লেখা আর চরিত্র…' কিন্তু খোদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস ব্রাকবাউর সব সময় কি বলেন তা শোনার প্রয়োজন আমাদের নেই।

আমাদের এখন ডাক্তার স্ট্রোবেলের কুকুর পেটার্কিনের দিকে অখণ্ড মনোযোগ দেয়া দরকার। প্যালফিদের টেবিলের কিশোরী মেয়েটিকে হাউ-ডু-য়্যু-ডু বলার পুরানো অভ্যাসটি সে আবার ফিরে পেয়েছে। লিসার গায়ে কেন লিসার গন্ধ নেই—কুকুর-বুদ্ধিতে এটা সে বুঝতে পারেনি। তবু বাস্তব সত্যটা সে মেনে নিয়েছে। মানুষরা কত কিছুই না করতে পারে। কাজেই গায়ের গন্ধ বদলাতে পারবে না কেন? ভেবেছে সে। তাছাড়া, মেয়েটা আর আগের মত অতগুলো প্যানকেক খায় না। মাংসখোর হয়ে উঠেছে। প্যানকেকে হাড় থাকে না, কিন্তু মাংসের চপে থাকবেই। এই থেকে সহজেই বোঝা যায় ডাক্তার স্ট্রোবেলের কুকুরটি কেমন করে এবং কেন তার প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে উঠেছে।

লিসার শিক্ষকরা ওর পরিবর্তনকে বিস্ময়কর ভাবলেন। কিন্তু হাউস-কীপার রোসার যে পরিবর্তন হয়েছে তা জানলে তাঁরা কি ভাবতেন? কারণ, রোসার যে পরিবর্তন হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হয়ে গেছে রোসা। হয়ত সে মূলত অসৎ, অলস ও অগোছালো নয়। হয়ত কেউ তার ওপর কড়া নজর রাখে না বলেই সে অমন হয়েছিল।

লোটি নম্র অথচ দৃঢ়ভাবে ঘর-সংসারের সব ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া শুরু করার পর থেকে রোসা আদর্শ হাউস-কীপার হয়ে উঠেছে।

সংসারের খরচপত্রের টাকা রোসার হাতে না দিয়ে ওর হাতে দেয়ার জন্য বাপকে রাজি করিয়েছে লোটি। রোসা এখন খরচের টাকার জন্য দশ বছরের লোটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। হোমওয়ার্ক ডেস্কে কাজ করতে করতে লোটি গম্ভীর মুখে তার হাতে টাকা তুলে দেয়। দৃশ্যটা বেশ হাস্যকরই বটে। রোসা বিশ্বস্ত ভাবে জানায় সে কি কিনতে চায়, সাপারে কি কি খাবার থাকবে এবং সংসারে অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়।

লোটি সঙ্গে সঙ্গে মোট কত টাকা লাগবে হিসেব করে ডেস্ক থেকে টাকা বের করে দেয়। এক্সারসাইজ খাতায় অঙ্কটা লিখে রাখে। সন্ধ্যায় রান্নাঘরের টেবিলে বসে কত খরচ হয়েছে, কি ফিরে আসছে সব হিসেব মিলিয়ে নেয়।

ওর বাবাও লক্ষ করলেন যে সংসার-খরচ কমে গেছে এবং খরচ কমলেও টেবিলে সব সময় তাজা ফুল থাকে। এমনকি তাঁর রিং স্ট্রীটের স্টুডিওতেও। তিনি আরও লক্ষ করলেন যে রোটেন্টার্ন স্ট্রীটের ফ্ল্যাটটা অনেক বেশি আরামদায়ক হয়ে উঠেছে। ('বাড়িতে একজন নারী থাকলে যেমন হয়'

ভাবলেন তিনি মনে মনে এবং ভেবে একটু চমকে উঠলেন।)

মি. প্যালফি যে তাঁর ফ্ল্যাটে বেশি বেশি সময় কাটাচ্ছেন তা চকলেট-মহিলা মিস আইরিন গেরল্যাখ-এর নজর এড়াল না। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে তিনি এ ব্যাপারে তাঁকে খোঁটাও দিলেন। অবশ্য, খুব নরমভাবে। কারণ, শিল্পীরা আবার রগচটা হয়।

মি. প্যালফি তাঁকে বললেন, 'জান, সেদিন ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি লিসা বসে আছে পিয়ানোর সামনে, মনের আনন্দে বাজিয়ে যাচ্ছে। একটা ছোট্ট গানও গাইছে সে। বেশ মিষ্টি! কিন্তু আগে কখনও ট্র্যাক্টর দিয়ে টেনেও তাকে পিয়ানোর কাছে নেয়া যেত না।'

'তারপর?' জিজ্ঞেস করলেন মিস গেরল্যাখ। তাঁর চোখের ভুরু দু'টি উঁচু হতে হতে চুল স্পর্শ করল।

'তারপর?' বিব্রত হাসি হেসে মি. প্যালফি বললেন, 'সেদিন থেকে আমি ওকে পিয়ানোর পাঠ দিচ্ছি। দারুণ মজা পাচ্ছে সে। আমিও পাচ্ছি।'

মিস গেরল্যাখ-এর চোখেমুখে অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠল। খোঁচা মেরে তিনি বললেন, 'তোমাকে একজন সুরকার-সঙ্গীতকার মনে করতাম। তুমি যে বাচ্চাদের পিয়ানো-শিক্ষক তা জানতাম না।'

আগের দিনে এমন কথা মি. প্যালফির মুখের ওপর বলার সাহস কারও হত না। অথচ এখন তিনি স্কুলের ছেলের মত হেসে বললেন, 'কিন্তু এখনকার মত এত বেশি আর এত ভাল সঙ্গীত আমি জীবনে কখনও রচনা করিনি!'

'কি বিষয়ের ওপর?' জিজ্ঞেস করলেন মহিলাটি।

'একটি শিশু অপেরা,' জবাব দিলেন তিনি।

শিক্ষকরা ভাবছেন লিসা বদলে গেছে। লোটি ভাবছে রোসা আর পেটার্কিন বদলে গেছে। আর, ওর বাবা ভাবছেন রোটেন্টার্ন স্ট্রীটের ফ্ল্যাটটি বদলে গেছে। পরিবর্তনের যেন হিড়িক পড়ে গেছে!

ওদিকে, মিউনিখেও নানা রকমের পরিবর্তন ঘটে গেছে। মা লক্ষ করলেন যে লোটি আর আগের মত ঘরমুখো নয়। স্কুলে তেমন খাটে না। সে হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত, চঞ্চল, চড়ামেজাজী ও হাসিখুশি। এসব লক্ষ করে তিনি নিজের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। নিজেকে নিজে বললেন, 'লিসালোট, তুমি একটি শান্ত নম্র বাচ্চা পেয়েছিলে। ওকে বাচ্চার মত থাকতে না দিয়ে তুমি বানিয়েছিলে হাউস-কীপার। তারপর সে এক পাহাড়ী লেকের ধারে সপ্তা কয়েক ছুটি কাটিয়ে এল ওর বয়সী মেয়েদের সাথে। সে হয়ে গেল একটি সুখী ছোট্ট মেয়ে। ওর বরাবরই এরকম থাকা উচিত ছিল। তোমার দুশ্চিন্তা ওকে মোটেই স্পর্শ করে না। তুমি

অতিরিক্ত দাম্ভিক। লজ্জা পাওয়া উচিত তোমার! লোটি যে হাসিখুশি এবং উদ্বেগমুক্ত এতে তোমার আনন্দ হওয়া উচিত। ধোয়ামোছার সময় ও একটা প্লেট ভেঙে ফেলল তো কি হল? স্কুল থেকে শিক্ষকরা যদি চিঠি লিখে জানান যে গত কয়েক সপ্তা সে লেখা-পড়ায় কম মনোযোগ দিয়েছে, বা খাটেনি, তাতে কি সর্বনাশ হয়ে গেছে? যদি মাত্র গতকালই এমন চিঠি এসে থাকে যে সে ওর ক্লাসমেট অ্যানি হ্যাবারসেট জারকে চার-চার বার কষে থাপ্পড় মেরেছে, তাতেই বা কি? যত সমস্যা-ঝামেলাই পোহাতে হোক মা'কে, মায়ের প্রথম কর্তব্য হল বাচ্চাকে আগলে রাখা। যাতে বাচ্চাটি অকালে ওর শৈশবের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত না হয়।'

এইভাবে নিজে নিজে অনেক কথাই বললেন মিসেস হর্ন। অবশেষে একদিন স্কুলে গেলেন। মেয়ের ক্লাস-টিচার মিস লিনেকোগালকে বললেন, 'আমি চাই আমার বাচ্চা বাচ্চাই থাকুক। একটি হত-বিহ্বল খুদে বুড়ি না হোক! যেকোন মূল্যে জোর করে ওকে আপনার সেরা ছাত্রী বানানোর চাইতে আমি বরং চাই যে সে একটি হাসিখুশি খাঁটি ছোট্ট মেয়ে থাকুক।'

কিছুটা বিরক্ত হয়ে মিস লিনেকোগাল বললেন, 'কিন্তু লোটির মধ্যে দু'রকমের গুণই ছিল। হাসিখুশি প্রাণবন্তও থাকতে পারত, আবার মন দিয়ে খেটে পড়াশোনাও করত।'

'জানি না, এখন কেন আগের মত পারে না। আমি একজন খেটে-খাওয়া নারী। আমার মেয়ের অনেক কিছুই জানি না। ওর পরিবর্তনের সাথে গ্রীষ্মের ছুটির কোন একটা সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে। তবে একটা কথা আমি জানি—যা ছিল, তা আর কখনও সে হতে পারবে না। ওটাই হচ্ছে আসল কথা।'

মিস লিনেকোগাল শক্ত করে নিজের চশমা ধরে বললেন, 'আপনার মেয়ের শিক্ষক হিসেবে আমার ভিন্নতর উদ্দেশ্য থাকা উচিত। ওর মানসিক স্থিরতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে আমাকে।'

'আপনি কি সত্যি ভাবেন যে অঙ্কের প্রতি একটু অমনোযোগ আর এক্সারসাইজ খাতায় একটু কাটাকুটি—'

'একটা ভাল উদাহরণ, মিসেস হর্ন! ওর এক্সার সাইজ বুক! লোটির হাতের লেখা দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যায়—কিভাবে বলব?—সে ওর মানসিক ভারসাম্য কতখানি হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু হাতের লেখার প্রশ্ন বাদ দেয়া যাক। লোটি অন্য মেয়েদেরকে পিটুনি দেবে—এটা কি ঠিক মনে করেন?'

'অন্য মেয়েদেরকে!' বহু বচনটার ওপর জোর দিলেন মিসেস হর্ন। 'আমি যতটা জানি, সে অ্যানি হ্যাবারসেটজার ছাড়া আর কাউকে থাপ্পড় মারেনি।'

'ওটাই কি যথেষ্ট নয়?'

'এই অ্যানি হ্যাবারসেটজারটা উচিত শিক্ষাই পেয়েছে। ওর এটা পাবার দরকার ছিল।'

'কি বলছেন, মিসেস হর্ন!'

'ও একটা ধুমসো লোভী মেয়ে। ক্লাসের সবচেয়ে ছোট্ট মেয়েটির ওপর জুলুম চালায়—ওর টিচার ওকে সমর্থন করবেন এটা আমি আশা করিনি।'

'কি বললেন? সত্যি মেয়েটা ওরকম করে নাকি? আমি জানতাম না।'

'তাহলে বেচারি এলসা মের্ককে জিজ্ঞেস করুন। সে হয়ত বলতে পারবে কিছু।'

'কিন্তু আমি যখন লোটিকে শাস্তি দিলাম, ও আমাকে বলল না কেন?'

বুক ফুলিয়ে জবাব দিলেন মিসেস হর্ন, 'হয়ত—আপনি যেমন বললেন—ওর যথেষ্ট মানসিক ভারসাম্য না থাকার ফলে।' একথা বলেই তিনি চললেন তাঁর অফিসে। সময় মত পৌঁছতে হলে ট্যাক্সি নিতে হবে। ওরে বাবা, ভাড়া আড়াই মার্ক! এত বেশি ভাড়া!

শনিবার দুপুরে মা-মণি হঠাৎ একটা 'রাকস্যাক' গুছিয়ে বললেন, 'মজবুত জুতো জোড়া পরে নাও। আমরা গারমিশে যাচ্ছি। ফিরব কাল রাতে।'

মেয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'মা, এত খরচ আমরা করতে পারব?'

মিসেস হর্ন যেন একটা ছুরির ঘা খেলেন। তারপর হেসে বললেন, 'আমাদের যা আছে সব খরচ করে ফেললে তোমাকে বেচে দিতে হবে।'

আনন্দে নাচতে নাচতে মেয়ে বলল, 'খুব ভাল কথা, বেচে দিয়ো। টাকাটা তুমি পাবার পরে আমি ক্রেতাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আসব। এভাবে তিন-চার বার বেচলে আমাদের হাতে অনেক টাকা জমে যাবে। তখন তোমার এক মাস কাজে না গেলেও চলবে।'

'তোমার দাম কি অত বেশি হবে?'

'তিন হাজার মার্ক! আমি আমার মাউথ-অর্গানটা নেব।'

কি মজাটাই না ওরা করল। গারমিশ থেকে হেঁটে বনের ভেতর দিয়ে ওরা পৌঁছল একটা লেকের তীরে। সেখান থেকে লেক এইব। সারাটা পথ ওরা গেল মাউথ-অর্গান বাজিয়ে, গান গেয়ে। তারপর গভীর বনের পথে আছাড় আর হোঁচট খেতে খেতে। ওরা দেখল বুনো স্ট্রবেরি, সুন্দর রহস্যময় ফুল, লিলি ফুল, আরও নানা রঙের ও আকারের বুনো ফুল, সূচালো টোপরঅলা শেওলা, মিষ্টি গন্ধঅলা পাহাড়ী ভায়োলেট, আরও কত কি! সন্ধ্যায় ওরা পৌঁছল এক গাঁয়ে। সেখানে এক বিছানাঅলা একটা রুম ভাড়া করল। গেস্টরুমে বসে রাকস্যাক থেকে প্রচুর খাবার বের করে পেট ভরে খেল দু'জনে। তারপর মা-মেয়ে শুয়ে পড়ল এক বিছানায়!

বাইরের মাঠে তখন চলছে ঝিঁঝি পোকাদের ঐকতান। রোববার সকালে ওরা আবার পথে নামল।

একটা বিশাল পর্বত দেখল ওরা। চূড়াটি তুষারে ঢাকা। জ্বলজ্বল করছে রূপোর মত। পুরুষ আর মেয়েরা বেরিয়ে আসছে গির্জা থেকে। গাঁয়ের রাস্তায় গরুগুলো দাঁড়িয়ে যেন গল্পগুজব করছে নিজেদের মধ্যে।

তারপর আবার হাঁটা। বেশ কঠিন কষ্টকর হাঁটা। বসে পড়ল ওরা। কাছেই চরে বেড়াচ্ছে কয়েকটি ঘোড়া। চারদিকে লক্ষ কোটি ফুল। সেদ্ধ ডিম, পনিরের স্যাণ্ডউইচ খেয়ে ওরা ঘুমিয়ে নিল একটুখানি ঘাষের বিছানায় শুয়ে। তারপর ফিরে চলল লেক এইব-এর দিকে। বুনো রাস্পবেরির ঝোপ এড়িয়ে, প্রজাপতির ঝাঁক ঠেলে। গরুর গলার ঘণ্টা বাজতে লাগল টুংটাং। বিকেল ঘনিয়ে এল। ওরা দেখল তুষার-ঢাকা পর্বত-শৃঙ্গের দিকে চলে গেছে কেবল-রেলপথ। উপত্যকার গভীরে লেকটাকে দেখাচ্ছে এক্কেবারে ছোট।

ওরা স্নান করল লেক-এ। হোটেলের বারান্দায় বসে কফি আর কেক খেল। তারপরে ফিরে চলল গারমিশে।

ট্রেনে ওদের বিপরীত দিকের আসনে বসে ছিলেন এক ভদ্রলোক। তিনি বিশ্বাসই করলেন না যে লিসার পাশে বসা মহিলাটি সত্যি ওর মা এবং চাকরি করে জীবিকা অর্জন করেন।

বাড়ি ফিরে ওরা ক্লান্তিতে শুয়ে পড়ল বিছানায় আলুর বস্তার মত। ঘুমিয়ে পড়ার আগে লিসা বলল, 'মা, আজকের দিনটা কী সুন্দর ছিল! দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে সুন্দর!'

মা জেগে ছিলেন আরও কিছুক্ষণ। আহা, অতীতে কত আনন্দ থেকেই না তিনি বঞ্চিত করেছেন তাঁর মেয়েটিকে! যাক, এখনও সময় আছে। এখনও তিনি পারেন সে ক্ষতি পুষিয়ে দিতে।

তারপর মিসেস হর্নও ঘুমিয়ে পড়লেন। লেক এইব-এর হাওয়ার মত এক টুকরো স্বপ্নিল হাসি খেলে গেল তাঁর মুখ আর গালের ওপর দিয়ে।

তাঁর মেয়ে বদলে গেছে। এখন তরুণী মা-টিও বদলাতে শুরু করেছেন।

## আট

পিয়ানোয় লোটির মেধা মাঠে মারা যাচ্ছে। ওর দোষে নয়। কিছুদিন ধরে বাবা ওকে শেখাবার মত যথেষ্ট সময় পাচ্ছেন না। বোধহয় শিশুদের অপেরা তৈরির

কাজে ব্যস্ততার কারণে? হতে পারে। কিংবা, তাই কি? কোন কিছু গড়বড় দেখা দিলে বাচ্চারা কেমন করে যেন বুঝে ফেলে। বাবারা যখন শিশু-অপেরার বিষয়ে অনেক কথাই বলেন, সৌখিন তরুণী মহিলাদের বিষয়ে কিচ্ছু বলেন না, তখন তাঁদের মেয়েরা বুঝে ফেলে বাতাস কোন্ দিকে বইছে।

লোটি বেরিয়ে এল রোটেন্টার্ন-স্ট্রীটের ফ্ল্যাট থেকে। পাশের ফ্ল্যাটের বেল বাজাল। গ্যাবেল নামের এক চিত্রশিল্পী থাকেন ঐ ফ্ল্যাটে। ভাল লোক। তিনি বলেছেন সময় পেলে লোটির একটা ছবি আঁকবেন। মি. গ্যাবেল দরজা খুলে দিলেন। 'ওহো, এ যে লিসা!'

'আমার আজ সময় আছে,' বলল লিসা।

'এক মিনিট,' বললেন তিনি। স্টুডিওতে ঢুকলেন তিনি। সোফার ওপর থেকে একটা বড় চাদর নিয়ে ঝুলিয়ে দিলেন ইজেলে টাঙানো একটা ছবির ওপর।

তারপর লোটিকে ডাকলেন ভেতরে। বসালেন একটা আর্ম-চেয়ারে। আঁকা শুরু করলেন। 'আজকাল তুমি আর পিয়ানো বাজাও না,' মন্তব্য করলেন তিনি।

'আমার বাজনায় কি আপনার খুব অসুবিধা হত?'

'মোটেই না। বরং বাজাচ্ছ না বলেই আমার খারাপ লাগছে।'

'বাবা এখন সময় পাচ্ছেন না,' বলল সে গম্ভীরভাবে। 'একটা অপেরা নিয়ে তিনি ব্যস্ত। একটা শিশুদের অপেরা।'

শুনে খুশি হলেন মি. গ্যাবেল। তারপর বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগলেন, 'এই জানালাগুলো, কিছুই দেখা যায় না। আলো আসে না। আমার একটা উপযুক্ত স্টুডিও দরকার।'

'তাহলে স্টুডিও একটা নিচ্ছেন না কেন, মি. গ্যাবেল?'

'পাওয়া যাচ্ছে না বলে। স্টুডিও খুঁজে পাওয়া মুশকিল।'

একটু থেমে মেয়েটি বলল, 'বাবার একটা স্টুডিও আছে। বড় বড় জানালা, টপ-লাইট, সবই আছে।'

'হুঁ,' বললেন মি. গ্যাবেল।

'রিং স্ট্রীটে,' যোগ করল লোটি। আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'সঙ্গীত রচনা করতে অত আলোর দরকার হয় না। যেমন আপনার হয় ছবি আঁকতে। তাই না?'

'হুঁ।'

লোটি আরেক পা এগোল। চিন্তিতভাবে বলল, 'বাবা আপনার সাথে ফ্ল্যাট বদল করতে পারেন। তাহলে আপনি ছবি আঁকার জন্য বড় বড় জানালা আর বেশি বেশি আলো পাবেন। আর, বাবা পাবেন আমাদের ফ্ল্যাটের লাগোয়া একটা

জায়গা সঙ্গীত-রচনার জন্য!' আইডিয়াটা উৎফুল্ল করে তুলল ওকে। 'খুব চমৎকার হবে না এটা?'

মি. গ্যাবেল নানা আপত্তি তুলতে পারতেন লোটির আইডিয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু তা করলেন না। হাসিমুখে বললেন, 'হ্যাঁ, খুবই চমৎকার। একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে, তোমার বাবাও তাই মনে করবেন কিনা।'

লোটি বলল, 'তা ঠিক। আমি জিজ্ঞেস করব তাঁকে।'

মি. প্যালফি বসে আছেন তাঁর স্টুডিওতে। একজন দেখা করতে এলেন তাঁর সাথে। একটি মহিলা। মিস আইরিন গেরল্যাখ। কিছু কেনাকাটা করতে এসেছিলেন ওদিকে। ভাবলেন, 'যাই না কেন, একটু দেখে যাই আর্নল্ডকে?'

কাজেই আর্নল্ড সঙ্গীত-রচনার কাগজপত্র সরিয়ে রেখে গল্প করছেন আইরিনের সঙ্গে। প্রথমে একটু রেগে গিয়েছিলেন। কারণ, আগে থেকে যোগাযোগ না করে এভাবে হুট করে এসে কাজে বিঘ্ন ঘটানো তিনি একদম পছন্দ করেন না। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে তিনি মেতে গেলেন এই সুন্দরী মহিলার পাশে বসে থাকার আনন্দে।

আইরিন গেরল্যাখ জানেন তিনি কি চান। তিনি চান মি. প্যালফিকে বিয়ে করতে। উনি একজন বিখ্যাত লোক। লোকটাকে পছন্দ করেন তিনি। মি. প্যালফিও পছন্দ করেন তাঁকে। কাজেই বিয়ের পথে কোন কঠিন বাধা নেই। অবশ্য মি. প্যালফি জানেন না যে ভবিষ্যতে কি সুখ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। মিস গেরল্যাখ কৌশলে তা জানিয়ে দেবেন যথাসময়ে। মি. প্যালফির মনে হবে যে বিয়ের চিন্তাটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই এসেছে তাঁর মাথায়।

কিন্তু একটি বাধা আছে—ঐ বোকা মেয়েটা! আর্নল্ডকে আইরিন একটা কি দু'টো বাচ্চা উপহার দেয়ার পরে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে আপনা থেকেই। ঐ লাজুক, গম্ভীর ছোট্ট মেয়েটাকে সামলানোর একটা উপায় আইরিন গেরল্যাখকে খুঁজে বের করতে হবে!'

বেল বাজল।

আর্নল্ড দরজা খুলে দিলেন।

দরজায় কে দাঁড়িয়ে আছে? তাঁর লাজুক গম্ভীর ছোট্ট মেয়েটি। হাতে এক গোছা ফুল। 'হ্যাল্লো বাবা, তোমার জন্যে কিছু তাজা ফুল এনেছি,' বলে স্টুডিয়োতে প্রবেশ করল সে। একটু নিচু হয়ে সম্মান জানাল মহিলাটিকে। একটা ফুলের ভাস তুলে নিয়ে চলে গেল রান্নাঘরে।

বিদ্বেষপূর্ণ হাসি হাসলেন আইরিন। বললেন, 'মেয়ের সঙ্গে তোমাকে দেখলে মনে হয় সে তোমাকে মুঠোর মধ্যে রেখেছে।'

বিব্রতভাবে হেসে সঙ্গীতকার বললেন, 'আজকাল ও খুব দৃঢ়তা দেখাচ্ছে এবং যা করছে সব পুরোপুরি ঠিক। কাজেই আমার কি করার আছে?'

মিস গেরল্যাখ তাঁর সুন্দর কাঁধ দু'টি নাচালেন। এ সময় লোটি আবার উদয় হল দৃশ্যপটে। তাজা ফুলগুলো রাখল টেবিলে। কাপ-পিরিচ বের করল। সেগুলো টেবিলে রাখতে রাখতে বাপকে বলল, 'একটুখানি কফি বানাব। তোমার অতিথিকে কিছু তো দেয়া চাই।'

বাবা আর মহিলাটি হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে রইলেন ওর দিকে। 'আর আমি কি না মেয়েটিকে ভেবেছিলাম লাজুক!' মনে মনে বললেন মিস গেরল্যাখ। 'কি বোকা আমি!'

কয়েক মিনিটের মধ্যে লোটি কফি, চিনি আর ক্রীম নিয়ে এল। পাকা গিন্নির মত মিস গেরল্যাখের কাপে কফি ঢেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল চিনি লাগবে কি না। ক্রীম দিল তাঁকে। বসে পড়ল বাপের পাশে। তারপর বন্ধুর মত হেসে বলল, 'আমি এক কাপ নেব আপনাদেরকে সঙ্গ দেবার জন্য।'

মি. প্যালফি ওর কাপে কফি ঢেলে দিয়ে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্রীম কতটা দেব, ম্যাডাম?'

খিলখিল করে হেসে উঠে লোটি বলল, 'অর্ধেক অর্ধেক, স্যার, প্লীজ।'

'এই নিন, ম্যাডাম।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, স্যার।'

কফিতে চুমুক দিচ্ছে ওরা নীরবে। কেউ কিছু বলছেন না। অবশেষে লোটি মুখ খুলল, 'মি. গ্যাবেলের সঙ্গে দেখা করে এলাম।'

'তোমার ছবি আঁকছিলেন?' জিজ্ঞেস করল ওর বাবা।

'একটুখানি এঁকেছেন,' বলল সে। আরেক চুমুক কফি খেল। তারপর নিরীহভাবে বলল, 'তাঁর ঘরে যথেষ্ট আলো নেই। সবচেয়ে বেশি তাঁর দরকার টপ-লাইট। তোমার যেমন এখানে আছে...'

'টপ-লাইটঅলা স্টুডিয়ো একটা ভাড়া নিলেই পারেন,' বললেন মি. প্যালফি। টের পেলেন না যে মেয়ে তাঁকে যেখানে নিয়ে যেতে চাচ্ছে ঠিক সেদিকেই তিনি যাচ্ছেন।

'আমি তাঁকে বলেছি সেকথা,' শান্তভাবে ব্যাখ্যা করল লোটি। 'কিন্তু সব স্টুডিয়ো ভাড়া হয়ে গেছে। খালি নেই একটাও।'

'খুদে জানোয়ার!' ভাবলেন মিস গেরল্যাখ। তিনি নিজেও তো বিবি হাওয়ার কন্যা। বুঝতে পারলেন লোটির মতলব। পরক্ষণেই প্রকাশ পেল মতলবটা।

'সঙ্গীত-রচনার জন্য তোমার তো টপ-লাইটের দরকার নেই। কি বল, বাবা? দরকার আছে?'

'না, দরকার ঠিক নেই।'

দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানল লোটি। নিজের পোশাকের সামনের দিকে তাকাল। তারপর, যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমনভাবে বলল, 'বাবা, মি. গ্যাবেলের সঙ্গে স্টুডিয়ো বদলাবদলি করলে কেমন হয়?'

বাপের দিকে তাকাল সে। চোখে অনুনয়ের দৃষ্টি।

কিছুটা বিরক্ত হয়ে, কিছু আমোদ পেয়ে মি. প্যালফি মেয়ের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে সৌখিন মহিলাটির দিকে তাকালেন। মহিলাটির মুখে ফুটে উঠল বিদ্রূপের হাসি।

'তাহলে মি. গ্যাবেল তাঁর মনের মত স্টুডিয়ো পাবেন। আলোর অভাব থাকবে না। আর তুমি কাজ করবে আমাদের ফ্ল্যাটের এক্কেবারে কাছে। রোসা আর আমার কাছাকাছি।'

লোটির দৃষ্টি নেমে গেল ওঁদের, ওর বাবার পায়ের দিকে। 'এখানে যতটা একা থাক ঠিক ততটাই একা থাকতে পারবে তুমি। যখন একা থাকতে ভাল লাগবে না, স্রেফ দরজাটা খুলে চলে আসবে আমাদের কাছে। হ্যাট মাথায় দেয়ারও দরকার হবে না। আমরা ঘরে একসাথে লাঞ্চ করতে পারব। লাঞ্চ তৈরি হলে তিনবার রিং দেব তোমার ঘরে। সব সময় তোমার প্রিয় খাবারগুলো তৈরি করব। আর তুমি যখন পিয়ানো বাজাবে আমরা তা শুনতে পাব···' ধীরে ধীরে অনিশ্চয়তার মধ্যে থেম গেল মেয়েটির গলা।

মিস গেরল্যাখ হঠাৎ করে উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে। তাঁকে বাড়ি ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি। সময় কিভাবে কেটে গেছে!

মি. প্যালফি এগিয়ে দিলেন তাঁকে। হাতে চুমু দিয়ে বললেন, 'রাতে আবার দেখা হবে।'

'কেমন করে? তোমার তো অন্য ব্যস্ততা থাকতে পারে?'

'কি বলতে চাচ্ছ, ডার্লিং?'

মহিলাটি হেসে বললেন, 'তুমি হয়ত বাড়ি বদলে ব্যস্ত থাকবে।'

মি. প্যালফি হেসে উঠলেন।

'হেস না অত তাড়াতাড়ি। তোমার মেয়ে সম্পর্কে যা জানি, ইতিমধ্যেই হয়ত সে জিনিসপত্র সরানোর জন্য লোক ঠিক করে রেখেছে,' বলেই মহিলা খটখট করে হিলের শব্দ তুলে নেমে গেলেন সিঁড়ি ভেঙে।

মি. প্যালফি ফিরে এলেন স্টুডিয়োতে। লোটি কাপগুলো ধুয়ে ফেলছে। তিনি কিছুক্ষণ পিয়ানো বাজালেন। পায়চারি করলেন। কাগজে কিছু লিখলেন।

লোটি সতর্ক রইল যাতে কাপ-পিরিচে টুংটাং শব্দও না হয়। ধুয়ে শুকনো

করে মুছে ওগুলোকে রেখে দিল কাবার্ডে। নিজের হ্যাটটি মাথায় চাপিয়ে নিঃশব্দে গিয়ে ঢুকল স্টুডিয়োতে।

'গুড-বাই, ড্যাডি···'

'গুড-বাই।'

'রাতে বাসায় খেতে আসবে?'

'না, আজ নয়।'

মাথা নোয়াল ছোট্ট মেয়েটি। হাতটা বাড়িয়ে দিল ভয়ে ভয়ে।

'শোন, লিসা, আমার ব্যাপারে কারও নাক গলানো, নিজের মেয়ে হলেও, আমার পছন্দ নয়। আমার জন্যে কোন্‌টা ভাল তা আমি নিজেই জানি।'

'তা-তো অবশ্যই, বাবা,' বলল সে শান্ত ও নম্রভাবে। ওর হাতটা তখনও বাড়ানো আছে। অবশেষে হাতটি তিনি নিলেন মুঠোর মধ্যে। লক্ষ করলেন অশ্রু টলমল করছে মেয়ের চোখে।

বাপকে জানতে হয় কখন শক্ত হওয়া দরকার। কাজেই তিনি ভান করলেন যে ওটা লক্ষ করেননি। বসে রইলেন পিয়ানোর সামনে।

লোটি নীরবে দরজার কাছে গেল। নিঃশব্দে দরজাটা খুলে চলে গেল।

মি. প্যালফি চুলে আঙুল বুলাতে লাগলেন। বাচ্চাদের চোখের পানি! এ আরেক ঝামেলা! অথচ তিনি ব্যস্ত আছেন শিশুদের অপেরা রচনায়! এসব ঘটলে মানুষ মদ খেতে বাধ্য হয়! এ রকম একটা ছোট মেয়ের চোখে অশ্রু সহ্য করতে পারেন না তিনি। ঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশির বিন্দুর মত অশ্রুবিন্দুগুলো টলমল করছিল ওর চোখের কোণে।

আবার তিনি বাজাতে লাগলেন। মেয়ের চোখের পানি দিয়ে কি হবে? শিল্পীর সাত খুন মাফ। একটা কাগজ নিয়ে আবার কয়েকটা নোট লিখে নিলেন। একটা চমৎকার সুর তৈরি করেছেন তিনি। খুশি হয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। (এমন দৈত্য কি কোথাও নেই যে এই লোকটাকে উপুড় করে পাছায় কষে দু'ঘা লাগাবে?)

আরও কয়েক সপ্তাহ কাটল। মিস আইরিন গেরল্যাখ স্টুডিয়োর ঐ ছোট্ট দৃশ্যটা ভোলেননি। মি. গ্যাবেলের সঙ্গে মি. প্যালফির স্টুডিয়ো বদলের প্রস্তাবটিকে তিনি বুঝে নিয়েছেন লড়াইয়ের আহ্বান! তিনি একজন পুরোপুরি নারী, যদিও লোটি তাঁকে সইতে পারে না। একজন পুরোপুরি নারী হিসেবে আহ্বানটা সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন তিনি। নিজের অস্ত্রগুলো তাঁর জানা। কিভাবে সেগুলো ব্যবহার করতে হয় তা-ও জানেন তিনি। জানেন সেগুলো কি রকম কার্যকরী। তূণের সব তীর তিনি নিক্ষেপ করেছেন টার্গেটের দিকে। সেই কম্পমান টার্গেটটি হচ্ছে

মি. প্যালফির শিল্পী-হৃদয়। প্রতিটি তীরই বিদ্ধ হয়েছে টার্গেটে। মি. প্যালফি এখন অসহায়।

'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই,' বললেন মি. প্যালফি।

মিস গেরল্যাখ হাত বুলালেন তাঁর চুলে এবং হাসলেন। একটু ব্যঙ্গের সুরে বললেন, 'আগামীকাল আমার সবচেয়ে ভাল পোশাকটা পরে যাব তোমার ফ্ল্যাটে। অনুমতি চাইব তোমার মেয়ের কাছে।'

আরেকটি তীর বিদ্ধ হল মি. প্যালফির হৃদয়ে। এই তীরটা বিষ-মাখা।

মি. গ্যাবেল ছবি আঁকছিলেন লোটির। হঠাৎ থেমে বললেন, 'তোমার কি হয়েছে, লিসা? এমন মন-মরা দেখাচ্ছে কেন?'

একটা দীর্ঘশ্বাস টানল মেয়েটি। যেন একটা ভারি পাথর চেপে আছে ওর বুকে। বলল, 'না, তেমন কিছু না।'

'স্কুলের ব্যাপারে কিছু?'

মাথা নেড়ে সে বলল, 'ওসব নিয়ে ভাবি না।'

মি. গ্যাবেল বললেন, 'আজ তোমার মন খারাপ। আজ আর আঁকব না। চল, একটু বেড়িয়ে আসি। ওতে মনটা তোমার হাল্কা হবে।'

'আমার একটু পিয়ানো বাজাতে ইচ্ছা করছে।'

'আরও ভাল। আমি এখানে বসে শুনব।'

হ্যাণ্ডশেক করে, নত হয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে চলে গেল মেয়েটি।

মি. গ্যাবেল চিন্তিতভাবে চেয়ে রইলেন। তিনি জানেন গভীর দুঃখ কিভাবে বোঝার মত চেপে বসে শিশু-কিশোরদের মনে। নিজেও একদিন শিশু ছিলেন তো, তাই ভুলতে পারেন না। অনেক ভাল মানুষই ভোলেন না।

মি. আর্নল্ড প্যালফি তাঁর রোটেন্টার্ন স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে এসেছেন। লিসা তাহলে পিয়ানো বাজাচ্ছে। কিন্তু ওকে থামতে হবে। তাঁর কিছু কথা শুনতে হবে। বসার ঘরের দরজা খুললেন তিনি।

ছোট্ট মেয়েটি চোখ তুলে তাকাল। হেসে বলল, 'বাবা? কি চমৎকার!' লাফিয়ে নামল সে পিয়ানোর আসন থেকে। 'তোমার জন্য কফি বানাব?' বলে সে ফিরল রান্নাঘরের দিকে।

তিনি ওর বাহু ধরে বললেন, 'না, ধন্যবাদ। আমি কথা বলতে চাই তোমার সঙ্গে। বস।'

একটা বড় আর্ম-চেয়ারে বসে পড়ল মেয়েটি। ওকে দেখাচ্ছে একটা পুতুলের মত। স্কার্টটাকে টেনেটুনে ঠিক করে সে চাইল তাঁর দিকে প্রত্যাশাভরা দৃষ্টি

মেলে।

গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন তিনি। পায়চারি করলেন এদিক-ওদিক। অবশেষে এসে থামলেন মেয়ের সামনে। শুরু করলেন, 'লিসা, আমি তোমার সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতে চাই। তোমার মা···' তোমার মা এখান থেকে চলে যাবার পর অনেক দিন ধরে আমি একা আছি। সাড়ে আট বছর। অবশ্য সম্পূর্ণ একা নয়। কারণ তুমি আছ। তুমি এখনও আছ আমার কাছে।'

মেয়েটি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে।

'কি বাজে বকছি আমি!' মনে মনে বললেন তিনি। বিরক্ত হলেন নিজের ওপর। 'কথাটা হচ্ছে,' বললেন তিনি। 'আমি আর একা থাকতে চাই না। একটা পরিবর্তন আসছে। আমার জীবনে এবং তোমার জীবনেও।'

নীরব হয়ে গেল ঘরটা।

একটা ভ্রমর গুঞ্জন তুলে বারে বারে চেষ্টা করছে জানালার কাচ ভেদ করে বাইরের খোলা হাওয়ায় চলে যেতে। (যে কেউ ওটাকে বলে দিতে পারে যে চেষ্টাটা বৃথা, সময়ের অপচয়। এ-চেষ্টায় শুধু তার মাথাটাই ভাঙবে। ভ্রমরগুলো একদম বোকা। কিন্তু মানুষ—মানুষ অনেক অনেক চালাক, তাই না?)

'আমি আবার বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'না!' স্পষ্টকণ্ঠে বলল মেয়েটি। ওর 'না'টা কান্নার মত শোনাল। তারপর সে আবার বলল নরম সুরে, 'না, বাবা, না। বিয়ে তুমি কোরো না, বাবা, কোরো না!'

'তুমি মিস গেরল্যাখকে চেন। তিনি তোমাকে খুব পছন্দ করেন। তোমার ভাল মা হবেন তিনি। মা নেই এমন অবস্থায় তোমার বড় হয়ে ওঠা ঠিক নয়। (খুব হৃদয় স্পর্শী, তাই না? আরেকটা কথা তিনি বলতে পারতেন—বলতে পারতেন যে ওকে একটা মা দেয়ার জন্যেই কেবল বিয়ে করছেন তিনি!)

লোটি মাথা নাড়তে লাগল। ঠোঁট দু'টো নড়ছে, কিন্তু কোন শব্দ বেরুচ্ছে না মুখ থেকে। একটা কলের পুতুলের মত কেবল মাথা নাড়ছে সে। দৃশ্যটা ভয়াবহ।

ওর বাবা চোখ ফিরিয়ে নিলেন। বললেন, 'নতুন অবস্থার সঙ্গে তুমি দ্রুত মানিয়ে নিতে পারবে। নিষ্ঠুর সৎ-মাদের কথা কেবল রূপকথাতেই পাওয়া যায়। আমি জানি তোমার ওপর নির্ভর করতে পারব, লিসা। তুমি খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে,' ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি। 'সময় হয়ে গেছে। আমাকে যেতে হবে। রিহার্সেল বাকি।'

তিনি বেরিয়ে গেলেন। স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল মেয়েটি।

মি. প্যালফি সিঁড়িতে পা দিয়েছেন, এমন সময় ঘর থেকে একটা চিৎকার শোনা গেল, 'বাবা!' চিৎকারটা মনে হল এমন একজনের—যে ডুবে যাচ্ছে

পানিতে।

'বসার ঘরে কেউ ডোবে না,' ভাবলেন মি. প্যালফি। চলে গেলেন তিনি। তাঁর খুব তাড়া। রিহার্সেল বাকি।

বিহ্বল অবস্থা কাটিয়ে উঠল লোকটি। চরম দুঃখের সময়ও সাধারণ বুদ্ধি সে হারায়নি। কি করবে সে? ওকে অবশ্যই কিছু একটা করতে হবে। বাবার আরেকটি মহিলাকে বিয়ে করা চলবে না। কখ্খনও না! তাঁর এক স্ত্রী আছে। যদিও তিনি এখানে তাঁর সঙ্গে থাকেন না। লোটি কোনদিনই নতুন মা গ্রহণ করে নেবে না। কখ্খনও না! ওর মা আছে। মাকে সে দুনিয়ার সবার চাইতে বেশি ভালবাসে!

মা বোধহয় সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু লোটি মাকে জানাতে পারে না। জানাতে পারে না ওদের দু'বোনের গোপন পরিকল্পনার কথা। বাপ যে মিস গেরল্যাখকে বিয়ে করতে চায় সেকথা তো বলাই যাবে না।

কাজেই উপায় আছে মাত্র একটা। লোটি সেই উপায়টা গ্রহণ করবে।

টেলিফোন ডাইরেক্টরি খুঁজে নিল সে। কাঁপা কাঁপা আঙুলে পাতা ওল্টাতে লাগল। 'গেরল্যাখ' নামটা পেয়ে গেল সে। 'গেরল্যাখ, স্টেফান, ম্যানেজিং—ডাইরেক্টর, ভিয়েনা হোটেল কোম্পানি, ৪৩, কোলম্যান অ্যাভেনিউ।'

বাবা কিছুদিন আগে বলেছিলেন যে মিস গেরল্যাখের বাবা হোটেল ইম্পিরিয়াল সহ অনেকগুলো হোটেল রেস্তোরাঁর মালিক।

কোলম্যান অ্যাভেনিউতে যাবার রাস্তা বুঝিয়ে দিল রোসা। লোটি মাথায় হ্যাট আর গায়ে কোট পরে বলল, 'আমি এখন বাইরে যাচ্ছি।'

'কোলম্যান অ্যাভেনিউতে যাচ্ছ কেন?' জানতে চাইল রোসা।

'একজনের সাথে আলাপ করতে।'

'বেশি দেরি কোরো না।'

করবে না বলে বেরিয়ে গেল লোটি।

আইরিন গেরল্যাখের সুসজ্জিত ঘরে এসে একজন পরিচারিকা হেসে বলল, 'ম্যাডাম, একটি ছোট্ট মেয়ে এসেছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

ম্যাডাম সবে আঙুলের নখে পালিশ লাগিয়ে বাতাসে হাত দোলাচ্ছেন শুকানোর জন্য। জিজ্ঞেস করলেন, 'ছোট্ট মেয়ে?'

'ওর নাম লিসা প্যালফি।'

'ও হো, নিয়ে এসো ওকে।'

পরিচারিকা বেরিয়ে গেল। ম্যাডাম উঠলেন। আয়নায় তাকালেন নিজের দিকে। চাপা হাসি হাসলেন।

লোটি কামরায় ঢুকতেই মিস গেরল্যাখ পরিচারিকাকে বললেন, 'একটু চকলেট তৈরি করে আন আমাদের জন্য,' তারপর লোটির দিকে ফিরে বললেন, 'আমাকে দেখতে আসায় খুবই খুশি হয়েছি। এতে আমারই ভুল ধরা পড়েছে। আমার উচিত ছিল তোমাকে আমন্ত্রণ করা। গায়ের কোটটা খুলবে না?'

'না, ধন্যবাদ। আমি বেশিক্ষণ থাকব না।'

'তাই? একটু বসার সময় তো তোমার হবে?' বললেন মিস গেরল্যাখ মুরুব্বিয়ানার সুরে। লোটি বসল চেয়ারের কিনারায় মহিলার দিকে চোখ রেখে।

মিস আইরিন গেরল্যাখের কাছে পরিস্থিতিটা অদ্ভুত ও হাস্যকর মনে হল। কিন্তু নিজেকে তিনি সামলে রাখলেন। মেজাজ দেখালে চলবে না। ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। 'আমার মনে হয় এদিক দিয়ে যেতে এখানে এসে পড়েছ, তাই না?'

'না। আমার কিছু বলার আছে আপনাকে।'

মিষ্টি করে হেসে আইরিন গেরল্যাখ বললেন, 'আমি শুনছি, বল, কি বলার আছে।'

চেয়ার ছেড়ে লোটি ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে বলল, 'বাবা বললেন আপনি তাঁকে বিয়ে করতে চান।'

মিষ্টি ঘণ্টাধ্বনির আওয়াজে খিলখিল করে হেসে মিস গেরল্যাখ বললেন, 'সত্যি বলেছেন? তিনি যে আমাকে বিয়ে করতে চান তা কি সত্যি বলেননি? যাকগে, ওতে কিছু যায় আসে না। কথাটা সত্য, লিসা। তোমার বাবা আর আমি বিয়ে করতে চাই। তুমি আর আমি বেশ মিলেমিশে থাকব। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তুমি নিশ্চিত নও? শোন, কিছুদিন একসঙ্গে থাকলে আমরা বেশ বন্ধু হয়ে যাব। কি বল?'

পিছিয়ে গিয়ে লোটি বলল, 'আপনি বাবাকে বিয়ে করবেন না।'

বড় বাড়াবাড়ি করছে মেয়েটা, ভাবলেন মিস গেরল্যাখ। প্রশ্ন করলেন, 'কেন করব না?'

'কারণ, করা উচিত হবে না আপনার।'

'এটা খুব ভাল কারণ হল না,' বললেন তরুণী মহিলাটি তীক্ষ্ণকণ্ঠে। দয়া দেখিয়ে লাভ হচ্ছে না। 'তোমার এখনি বাড়ি যাওয়া উচিত। বুঝতে পারছি না তোমার বাপকে তোমার এখানে আসার কথা বলব কি না। বলব না এজন্য যে আমাদের ভবিষ্যৎ বন্ধুত্বের পথে আমি কাঁটা দিতে চাই না। আমি এখনও বিশ্বাস করতে চাই যে আমরা বন্ধু হব।'

দরজার দিকে ফিরে লোটি বলল, 'আমাদেরকে যেমন ছিলাম, থাকতে দিন। প্লীজ, প্লীজ···' তারপর সে চলে গেল।

মিস গেরল্যাখ সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর একটি মাত্র করণীয় আছে। তাড়াতাড়ি

বিয়ের প্রস্তুতি নেয়া। বিয়েটা হয়ে গেলে তিনি মেয়েটাকে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেবেন। অপরিচিত লোকজনের কঠোর শাসনে সোজা হয়ে যাবে মেয়েটি।

'তুমি কি চাও?'

পরিচারিকাটি এসে দাঁড়িয়েছে ট্রে হাতে, চকলেট নিয়ে। 'বাচ্চাটা কোথায় গেল?' জিজ্ঞেস করল সে।

'বেরিয়ে যাও!'

মি. প্যালফি বাড়িতে আসেননি ডিনার খেতে। কারণ তিনি অপেরা হাউসে অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করছেন। রোসা সঙ্গ দিচ্ছে লোটিকে। মি. প্যালফি না থাকলে রোসা একসঙ্গেই খায়।

'তুমি কিছুই খাচ্ছ না,' বলল রোসা অনুযোগের ভঙ্গিতে। 'তোমাকে ভূতের মত দেখাচ্ছে। ভয় করছে আমার। কি হল?'

লোটি মাথা নাড়ল, কিছু বলল না। রোসা ওর হাত ধরে ছেড়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে। 'তোমার গায়ে তো জ্বর! ওঠ, ওঠ, তোমাকে বিছানায় শুইয়ে দিই,' বলে রোসা ওকে চেয়ার থেকে তুলে ওর ঘরে নিয়ে গেল। জামা-কাপড় খুলে শুইয়ে দিল বিছানায়।

'বাবাকে বোলো না,' বলল লোটি বিড়বিড় করে। জ্বরে হি হি করে কাঁপছে সে। রোসা কম্বল-বালিশ চাপাল ওর গায়ে। তারপর ছুটে গিয়ে টেলিফোন করল ডাক্তার স্ট্রোবেলকে।

বুড়ো ভদ্রলোক আসছেন বললেন। তিনিও উদ্বিগ্ন রোসার মত।

রোসা টেলিফোন করল অপেরা হাউসে। কে একজন বলল, 'ঠিক আছে, আমরা বিরতির সময় জানাব মি. প্যালফিকে।' রোসা ছুটে এল শোবার ঘরে। লোটি ছটফট করছে বিছানায়। জড়ানো স্বরে দুর্বোধ্য কি সব বলছে বিড়বিড় করে। বালিশ, কম্বল পড়ে গেছে ফ্লোরে।

ডাক্তার স্ট্রোবেল আসছেন না কেন? রোসা কি করবে? পট্টি লাগাবে কপালে? গরম, না ঠাণ্ডা? ভেজা, না শুকনো?

সাদা টাই আর টেইলকোট পরা মি. প্যালফি গায়িকাদের ড্রেসিংরুমে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন সামান্য মদ খেতে খেতে। দরজায় ধাক্কা পড়ল।

স্টেজ-ম্যানেজার এলেন। 'আপনার রোটেন্টার্ন স্ট্রীটের ফ্ল্যাট থেকে একটা ফোন কল পেয়েছি। আপনার মেয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ডাক্তার স্ট্রোবেলকে ডাকা হয়েছে। এতক্ষণে পৌঁছে গেছেন তিনি।'

অত্যন্ত বিবর্ণ হয়ে গেলেন মি. প্যালফি। 'ধন্যবাদ, হেরম্যান,' বললেন তিনি

নিচু স্বরে। স্টেজ-ম্যানেজার বেরিয়ে গেল।

একজন গায়িকা বললেন, 'আশা করি গুরুতর কিছু নয়। ওর কি হাম হয়েছিল?'

'না, মাফ করো মিট্‌জি!' বলে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ছুটে গেলেন টেলিফোনের কাছে।

'হ্যাল্লো, আইরিন!'

'বল, ডার্লিং? অনুষ্ঠান এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল? আমি তো বেরুনোর জন্যে তৈরিই হইনি।'

মি. প্যালফি গড়গড় করে খবরটা জানালেন। তারপর বললেন, 'আজ রাতে তোমাকে বাইরে নিয়ে যেতে পারব না মনে হচ্ছে।'

'অবশ্যই না। আশা করি গুরুতর কিছু নয়। হাম হয়েছে নাকি?'

'না,' বললেন তিনি অধৈর্যভাবে। 'কাল সকালে রিং করব তোমাকে,' রিসিভার রেখে দিলেন মি. প্যালফি।

ঘণ্টা বেজে উঠল। ইন্টারভ্যাল শেষ হয়েছে। জীবন আর অপেরা থেমে নেই।

অবশেষে শেষ হয়েছে অপেরা। মি. প্যালফি ছুটতে ছুটতে উঠছেন রোটেন্টার্ন স্ট্রীটের ফ্ল্যাটের সিঁড়ি বেয়ে। রোসা দরজা খুলে দিল।

ডাক্তার স্ট্রোবেল বসে আছেন বিছানার পাশে।

'কেমন আছে ও?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন বাবা।

'ভাল নয় মোটেই,' জবাব দিলেন ডাক্তার। 'কিন্তু আপনার ফিসফিস করার দরকার নেই। আমি ওকে একটা ইনজেকশন দিয়েছি।'

লোটি পড়ে আছে বিছানায়। মুখচোখ ফোলা। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

'হাম?'

'হামের চিহ্নও নেই। মনে হচ্ছে ওর স্নায়ুর ওপর খুব চাপ পড়েছে। একটা গুরুতর মানসিক সঙ্কটের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা,' বললেন বুড়ো ডাক্তার। 'কিসে এমন হল বলতে পারেন? পারেন না? কিছু আন্দাজ করতে পারেন না?'

রোসা বলল, 'আমি জানি না এটাই কারণ কিনা—তবে বিকেলে ও বাইরে গিয়েছিল। বলেছিল, কার সাথে নাকি কথা বলতে হবে। যাবার আগে কোলম্যান অ্যাভেনিউর রাস্তা জিজ্ঞেস করেছিল।'

'কোলম্যান অ্যাভেনিউ?' বলে ডাক্তার তাকালেন মি. প্যালফির দিকে।

মি. প্যালফি দ্রুত পায়ে পাশের ঘরে গিয়ে টেলিফোন করলেন, 'আজ বিকেলে লিসা গিয়েছিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন আইরিন। 'কিন্তু কথাটা সে তোমাকে বলল কেমন করে?'

জবাব না দিয়ে মি. প্যালফি আবার পশ্ন করলেন, 'কি জন্যে গিয়েছিল সে?'

সংক্ষিপ্ত হাসি হেসে মিস গেরল্যাখ বললেন, 'কথাটা তুমি বরং ওকেই জিজ্ঞেস কর।'

'জবাব দাও, প্লীজ!' ভাগ্য ভাল যে আইরিন ঐ সময় তাঁর মুখের চেহারাটা দেখেনি।

'জানতেই যখন চাও তখন বলি। ও এসেছিল আমাকে নিষেধ করতে। আমি যাতে তোমাকে বিয়ে না করি,' বললেন আইরিন ক্রুদ্ধভাবে।

বিড়বিড় করে কি একটা বলে রিসিভার রেখে দিলেন মি. প্যালফি। 'হয়েছে কি তোমার মেয়ের?' জিজ্ঞেস করলেন মিস গেরল্যাখ। তারপর বুঝলেন যে ওপাশে কেউ শুনছে না। 'খুদে জানোয়ার,' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'থামবে না কিছুতেই! বিছানায় শুয়ে অসুখের ভান করা পর্যন্ত!'

আরও কিছু নিদের্শ দিয়ে ডাক্তার যাবার জন্য তৈরি হলেন। দরজার কাছে তাঁকে থামিয়ে মি. প্যালফি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে বাচ্চাটার?'

'স্নায়ু-প্রদাহ। কাল ভোরেই আসব আমি। গুড-নাইট।'

বাবা গেলেন মেয়ের ঘরে। বসলেন বিছানার পাশে। রোসাকে বললেন, 'তোমাকে আর দরকার হবে না। গুড-নাইট।'

'কিন্তু আমি থাকলে…'

তিনি তাকালেন রোসার দিকে।

রোসা চলে গেল।

মি. প্যালফি মেয়ের ছোট্ট, তপ্ত মুখে হাত বুলতে লাগলেন। লোটি জ্বরের ঘোরে সরে গেল তাঁর কাছ থেকে।

তিনি তাকিয়ে দেখলেন কামরার চারদিকে। তাঁর লিসার স্কুলের ব্যাগটা পড়ে আছে টেবিলের পাশে চেয়ারের ওপর। কাবার্ডের ওপর ওর পুতুল ক্রিস্টেল। বহুদিন ধরে অনাদৃত।

নিঃশব্দে উঠে গিয়ে পুতুলটা তুলে নিলেন তিনি। বাতি নিবিয়ে আবার বসে পড়লেন বিছানার পাশে।

অন্ধকারে বসে তিনি পুতুলের গায়ে চাপড় দিতে লাগলেন আস্তে আস্তে। যেন ওটা একটি বাচ্চা। যেন তাঁর লিসা—যে সরে যায় না তাঁর হাতের স্পর্শ থেকে।

## নয়

মিউনিখ ইলাস্ট্রেটেড-এর সম্পাদক মি. বেরনৌ দুঃখ করে বললেন, 'সময়টা বিশ্রী যাচ্ছে। চুরি না করে প্রথম পাতায় ছাপার মত ছবি কোথায় পাব?'

মিসেস হর্ন দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর টেবিলের পাশে। বললেন, 'নিও-প্রেস মেয়েদের ব্রেস্ট-স্ট্রোক সাঁতারের নতুন চ্যাম্পিয়নের কয়েকটা ছবি পাঠিয়েছে।'

'সুন্দরী তো?'

মিসেস হর্ন হেসে বললেন, 'সাঁতারু হিসেবে চলতে পারে।'

বিষণ্নভাবে হাত নেড়ে আইডিয়াটা বাতিল করে দিলেন মি. বেরনৌ। হাতড়াতে লাগলেন ডেস্ক খুলে।

'গ্রাম থেকে সেদিন এক ফটোগ্রাফার কয়েকটা ছবি পাঠিয়েছে। যমজদের ছবি,' বললেন তিনি ফোল্ডার আর পুরানো পত্রিকার ভাঁজের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে। 'দুটি দারুণ সুন্দর ছোট্ট মেয়ের ছবি! দেখতে অবিকল এক রকম! কই গেলিরে দুষ্টু মেয়েরা! বেরিয়ে আয়! এ রকম জিনিস লোকে পছন্দ করে। দরকার শুধু একটা যুৎসই ক্যাপশন। সংবাদ-চিত্রের অভাবে এক জোড়া বাচ্চা মেয়ের ছবি ছাপলে দোষ কি? আহ্, এই যে ছবিগুলো! ' ছবির খামটি পেলেন তিনি। বের করে দেখে অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, 'আমরা এগুলো ব্যবহার করব, মিসেস হর্ন,' ফটোগুলো তিনি তুলে দিলেন মিসেস হর্নের হাতে।

মিসেস হর্ন চুপ করে চেয়ে রইলেন ফটোগুলোর দিকে। সম্পাদক জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাল্লো, কি হল? লুত (আঃ)-এর স্ত্রীর মত লবণের খাম্বা হয়ে গেলেন নাকি? জেগে উঠুন! নাকি অসুস্থ লাগছে, মিসেস হর্ন?'

'খুব ভাল লাগছে না, মি. বেরনৌ,' বললেন মিসেস হর্ন কাঁপা গলায়। 'তবে এখন সামলে উঠেছি,' ফটোগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। প্রেরকের নামটা পড়লেন—'জোসেফ অ্যাপেলডয়ের, ফটো-গ্রাফার, বোরলেকেন, লেক বোরলেকেন।'

মাথা ঘুরে উঠল মিসেস হর্নের।

'সবচেয়ে ভাল ছবিটা বেছে নিন। এমন একটা ক্যাপশন দেবেন যাতে আমাদের পাঠকদের মন আনন্দে নেচে ওঠে। ওটা আপনারই কাজ।'

'এগুলো ছাপানো আমাদের উচিত হবে কিনা তাই ভাবছি,' কোনোরকমে বলে ফেললেন মিসেস হর্ন।

'কেন ছাপব না?'

'আমার মনে হয় ওগুলো আসল নয়।'

'কারচুপি আছে, না?' হাসলেন মেরি বেরনৌ। 'অযথা ভালমানুষ মি. অ্যাপেলডয়েরকে আপনি বেশি চালাক ভাবছেন। তিনি মোটেও চালাক নন। যান, কাজে লেগে পড়ুন! ক্যাপশন লেখাটা কাল সকালের জন্য রেখে দিতে পারেন ইচ্ছা করলে। ছাপার আগে আমাকে দেখাবেন।'

মিসেস হর্ন ফিরে গেলেন তাঁর রুমে। বসে পড়লেন চেয়ারে। ছবিগুলো সামনে রেখে কপাল চেপে ধরলেন।

মাথায় চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। দুই যমজ! বোরলেকেন! ছুটি! হ্যাঁ, তাই তো! লোটি কেন তাঁকে কিছু বলেনি এ ব্যাপারে? সঙ্গে করে ছবি আনেনি কেন? দু'জনে ছবি তুলেছিল নিশ্চয় বাড়িতে আনার উদ্দেশ্যে! তবে? তবে নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছে যে ওরা যমজ বোন? এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কাউকে কিচ্ছু জানাবে না এ সম্পর্কে? এটা বোধগম্য। হ্যাঁ, সত্যি বোঝা যায়। আহা, কি মিল ওদের চেহারায়! মায়ের চোখেও ধরা পড়ল না! ওরে আমার প্রাণের ধন! আমার দুই সোনামণি!

ঐ মুহূর্তে মি. বেরনৌ দরজা পথে এদিকে তাকালে দেখতেন আনন্দ আর বেদনায় আচ্ছন্ন একটি মুখ। অঝোর ধারায় অশ্রু নামছে দু'গাল বেয়ে। যেন প্রাণটাই গলে বেরিয়ে আসছে অশ্রু হয়ে।

ভাগ্যক্রমে তিনি তাকাননি।

সামলে উঠতে চেষ্টা করলেন মিসেস হর্ন। মাথা ঠিক রাখতে হবে এসময়ে। কি হতে যাচ্ছে? কি ঘটুক চান তিনি? কথা বলতে হবে লোটির সঙ্গে।

একটা কথা ভেবে কেঁপে উঠলেন তিনি। লোটির সঙ্গে তো কথা বলবেন। কিন্তু ও কি লোটি?

মিসেস হর্ন চলে গেলেন মেয়ের টিচার মিস লিনেকোগেলের বাসায়।

'আপনার প্রশ্নটা বড় অদ্ভুত,' বললেন মিস লেনিকোগেল। 'আপনি প্রশ্ন করেছেন আপনার মেয়েকে আমি আপনার মেয়ে মনে না করে অন্য মেয়ে মনে করি কিনা। মাফ করবেন, কিন্তু···'

'না, আমি পাগল হইনি,' আশ্বস্ত করে বললেন মিসেস হর্ন। একটা ছবি রাখলেন টেবিলের ওপর।

মিস লিনেকোগেল একবার ছবির দিকে, একবার মিসেস হর্নের দিকে, আবার ছবির দিকে তাকাতে লাগলেন।

'আমার দু'টি মেয়ে,' বললেন মিসেস হর্ন চাপা গলায়। দ্বিতীয়টা আমার প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে ভিয়েনায় থাকে। এই ছবিটা ঘণ্টা কয়েক আগে এসেছে

আমার হাতে। জানতাম না যে ছুটিতে ওদের দেখা হয়েছে।'

মিস লিনেকোগেল মুখ খুললেন এবং বন্ধ করলেন বোয়াল মাছের মত। আবার খুললেন এবং আবার বন্ধ করলেন। মাথা ঝাঁকালেন। ফটোটাকে এমনভাবে কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন যেন ওটা কামড়ে দেবে তাঁকে। অবশেষে জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখা হবার আগে কি ওরা একে অন্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানত না?'

মাথা নেড়ে মিসেস হর্ন বললেন, 'না। পৃথক হবার সময় আমার স্বামী আর আমি একমত হয়েছিলাম যে ওদেরকে জানানো হবে না। ওটাই ঠিক হবে মনে করেছিলাম আমরা।'

'আপনি নিজে স্বামী বা অন্য মেয়েটির কাছ থেকে আর কখনও কোন খবর পাননি?'

'কখনও পাইনি।'

'তিনি কি আবার বিয়ে করেছেন?'

'জানি না। তবে আমার সন্দেহ, করেননি। তাঁর ধারণা, পারিবারিক জীবনের জন্য তিনি বেমানান।'

'অত্যন্ত আশ্চর্যজনক কাহিনি,' বললেন মিসেস লিনেকোগেল। বাচ্চাদের মাথায় জায়গা বদলাবদলির উদ্ভট খেয়াল চাপেনি তো? লোটির চরিত্রের পরিবর্তন, ওর লেখার পরিবর্তন···' মিসেস হর্ন, ওর লেখার···! বিশ্বাস করা যায় না এমন পরিবর্তন হওয়া সম্ভব।'

সায় দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রইলেন মিসেস হর্ন।

'খোলাখুলি বলছি, মাফ করবেন,' বলে গেলেন মিস লিনেকোগেল। 'আমি বিয়ে করিনি। আমার ছেলেপুলে নেই। আমি একজন শিক্ষিকা। তবে আমি সবসময়ে মনে করি যে মেয়েরা—মানে, বিবাহিতা মেয়েরা, স্বামীদেরকে বড় বেশি গুরুত্ব দেয়। আসলে কিন্তু শিশুদের সুখের চাইতে বড় কিছুই নেই।'

মিসেস হর্ন বিষণ্ন হাসি হেসে প্রশ্ন করলেন, 'আমার স্বামী আর আমি একত্রে অসুখী জীবন যাপন করলে বাচ্চারা সুখী হত মনে করেন?'

মিস লিনেকোগেল ভেবে বললেন, 'আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। আপনি এখনও তরুণী। বিয়ে করেছিলেন প্রায় বাচ্চা বয়সে। সারা জীবন আপনি বয়সে আমার চেয়ে ছোটই থেকে যাবেন। একজনের জন্য যেটা ভাল অন্যের জন্য সেটা খারাপ।'

মিসেস হর্ন উঠলেন।

'কি করবেন এখন?'

'কি করব জানলে হত!' বললেন মিসেস হর্ন।

মিউনিখ পোস্ট অফিসের একটা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে লিসা। কেরানি বলল, 'না, তোমার কোন চিঠি আসেনি।'

সন্দেহের দৃষ্টিতে লোকটার দিকে চেয়ে বিষণ্ন ভাবে লিসা বলল, 'এর মানে কি হতে পারে?'

ঠাট্টার সুরে কেরানিটি বলল, 'হয়ত ঠিকানা ভুলে গেছে।'

'সেই ভয় নেই, আমি আবার আসব আগামীকাল।'

মিসেস হর্ন বাড়ি ফিরেছেন। তাঁর মনে কৌতূহল আর ভয়ের লড়াই চলছে। হাঁপাচ্ছেন তিনি।

তাঁর মেয়ে রান্নাঘরে। সসপ্যানের ঢাকনির ঝনঝন আওয়াজ হচ্ছে। কি একটা সেদ্ধ হচ্ছে।

'গন্ধটা তো চমৎকার,' বললেন মিসেস হর্ন। 'কি হবে ডিনারে?'

'পর্ক চপ আর আলুর দম,' বলল তাঁর মেয়ে, গর্বিত ভাবে।

নিরীহ ভঙ্গিতে মিসেস হর্ন বললেন, 'কত তাড়াতাড়ি রান্না শিখে ফেলেছ তুমি!'

'হ্যাঁ, তাই না?' জবাব দিল মেয়ে উৎফুল্লভাবে। 'কখনও ভাবিনি যে আমি···' হঠাৎ থেমে গেল সে। আরে, কি বলছে সে। ধরা পড়ে যাবে যে!

দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন মিসেস হর্ন। মুখচোখ সাদা হয়ে গেছে তাঁর।

মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাবার্ডের খোলা দরজার সামনে। প্লেট বের করছে। ঠকাঠক আওয়াজ হচ্ছে প্লেটে প্লেটে।

মিসেস হর্ন অতি কষ্টে মুখ খুলে বললেন, 'লিসা!'

ঝনঝন শব্দ হল! প্লেটগুলো পড়ে গেল লিসার হাত থেকে! টুকরো টুকরো হয়ে গেল ফ্লোরের ওপর। ঘুরে দাঁড়াল লিসা। চোখ দুটো ওর ভয়ে বিস্ফারিত।

'লিসা!' বললেন আবার মিসেস হর্ন, খুব নরম সুরে। দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন মেয়ের দিকে।

'মা, মামণি!' বলে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়ে। ডুবন্ত মানুষের মত আঁকড়ে ধরল মাকে। কাঁদতে লাগল হু-হু করে।

হাঁটু গেড়ে বসে মা কাঁপা হাতে ওর পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন, 'আমার খুকি, আমার ছোট্টমণি!'

ভাঙা প্লেটের টুকরোর মধ্যেই জড়াজড়ি করে বসে পড়ল দু'জনে। পর্ক চপ পুড়তে লাগল উনুনের ওপর। পোড়া মাংসের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল রান্নাঘরে। সসপ্যান থেকে উপচে পড়তে লাগল ফুটন্ত পানি।

ওদের সেদিকে খেয়াল নেই। মা-মেয়ে তখন অন্য জগতে।

ঘণ্টা কয়েক পরের কথা। লিসা স্বীকার করেছে ওদের দু'বোনের ষড়যন্ত্রের কথা। মা মাফ করে দিয়েছেন। অনেকক্ষণ লেগেছে ওর সবকিছু খুলে বলতে। মা নীরবে শুনে ওকে চুমু দিয়েছেন। আর কিছু বলেননি।

এখন ওরা বসে আছে সোফায়। লিসা বসেছে মা-র গায়ে লেপ্টে, একেবারে কোল ঘেঁষে। আহা, সবকিছু বলে ফেলে কি শান্তি লাগছে! কি মুক্ত, বাতাসের মত হালকা লাগছে ওর মনটা! মাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে সে, যেন তিনি হাওয়ায় উড়ে যাবেন।

'কি ধুরন্ধর মেয়েরে বাবা, তোরা দু'জন!'

হি-হি করে হাসল লিসা গর্বিতভাবে। একটি গোপন কথা এখনও ভাঙেনি সে। ভিয়েনায় যে একজন মিস গেরল্যাখ উদয় হয়েছেন সে কথা বলেনি। লোটির চিঠিতে তাঁর কথা জেনেছে সে। লোটি উদ্বিগ্ন।

'ভাবছি, এর পরে কি হবে। আমরা কি কিছুই ঘটেনি এমন ভাব দেখাব?' বললেন ওর মা।

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে লিসা বলল, 'তোমার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে লোটি। এবং তুমিও ওর জন্য। তাই না, মা-মণি?'

মা স্বীকার করলেন।

'আমিও। লোটির জন্য এবং—'

'এবং তোমার বাপের জন্য?'

লিসা মাথা নোয়াল। ভয়ে ভয়ে বলল, 'লোটি চিঠি লিখছে না কেন বুঝতে পারছি না।'

'হ্যাঁ,' বললেন মা।

## দশ

লোটি পড়ে আছে বিছানায়। ঘুমাচ্ছে। ঘুমিয়েই আছে সারাক্ষণ। ডাক্তার স্ট্রোবেল সকালে এসে বললেন, 'দুর্বলতা,' মি. প্যালফি বসে আছেন বিছানার পাশে। চেয়ে আছেন মেয়ের শুকিয়ে যাওয়া মুখটার দিকে। গত কয়েক দিন তিনি মেয়ের পাশ থেকে নড়েননি বলা চলে।

সামনের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। রোসা পা টিপে টিপে এসে ফিসফিস করে বলল, 'মিউনিখ থেকে ট্রাংকল। আপনি ধরবেন?'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ইশারায় ওকে বললেন তাঁর ফিরে না আসা পর্যন্ত রুমে থাকতে। তারপর চলে গেলেন টেলিফোনের কাছে। মিউনিখের টেলিফোন? কে হতে পারে? হয়ত তাঁর কনসার্ট-এজেন্ট কেলার কোম্পানি। কিন্তু ওরা আর সময় পেল না টেলিফোন করার?

রিসিভার তুলে নিয়ে নিজের নাম বললেন তিনি। এক্সচেঞ্জ সংযোগ দিল।

'প্যালফি বলছি।'

'এদিক থেকে মিসেস হর্ন বলছি,' জবাব এল নারীকণ্ঠে।

'কি?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি আশ্চর্য হয়ে। 'কে? লিসালোট?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল সুদূরের কণ্ঠটি। 'টেলিফোন করলাম বলে মাফ চাচ্ছি। বাচ্চাটির ব্যাপারে উদ্বিগ্ন কিনা, তাই। আশা করি ওর অসুখ-বিসুখ করেনি।'

'ও অসুস্থ,' বললেন মি. প্যালফি নরম স্বরে।

'তাই নাকি!' আঁতকে উঠল দূরের কণ্ঠ।

বিভ্রান্ত হয়ে মি. প্যালফি বললেন, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি কেমন করে...'

'আমরা সন্দেহ করেছি। লিসা আর আমি।'

'লিসা?' বলে কি? লিসা তো এখানে, শুয়ে আছে অসুস্থ হয়ে। তারপর তিনি শুনতে লাগলেন হতভম্ব হয়ে। যত শুনছেন ততই আরও বেশি হতভম্ব হচ্ছেন। মাথা ঝাঁকাতে লাগলেন তিনি। উত্তেজনায় আঙুল বুলাতে লাগলেন চুলে।

দূরের কণ্ঠটি গড়গড় করে বলে গেল যা যা ঘটেছে সব কিছু।

'আপনারা কি এখনও কথা বলছেন?' জিজ্ঞেস করল এক্সচেঞ্জের মেয়েটি।

'দোহাই আপনার, কেটে দেবেন না! আমরা কথা বলছি,' চেঁচিয়ে বললেন মি. প্যালফি।

'বাচ্চাটার কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন তাঁর প্রাক্তন-স্ত্রী।

'স্নায়ু-জ্বর,' জবাব দিলেন তিনি। 'ডাক্তার বলছেন সংকট কাটিয়ে উঠেছে। কিন্তু একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছে, দৈহিক এবং মানসিক ভাবে।'

'ডাক্তার ভাল?'

'নিশ্চয়ই। ডা. স্ট্রোবেল। লিসাকে ছোটকাল থেকেই চেনেন। দুঃখিত! এটা তো লোটি। না, লোটিকে তো তিনি চিনতে পারেন না,' বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি।

মিসেস হর্নও মিউনিখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। দু'জন বয়স্ক মানুষ বুঝতে পারছেন না কি বলবেন। তাঁদের হৃদয় আর জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। তাঁদের মস্তিষ্কও।

ঠিক সেই সময় নীরবতা ভাঙল একটি কিশোর-কণ্ঠ। 'ড্যাডি! ড্যাডি! শুনছ?

লিসা বলছি! হ্যাল্লো, ড্যাডি! আমরা ভিয়েনায় আসব? এখনি আসব?'

বাঁচা গেল! বরফ গলে গেল, যেন বসন্তের হাওয়ায়। 'হ্যাল্লো, লিসা!' চিৎকার করে বললেন বাবা। 'হ্যাঁ, তোমার বুদ্ধিটা ভাল!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' খুশি ঝরে পড়ল লিসার কণ্ঠ থেকে।

'তোমরা কখন পৌঁছতে পারবে?'

এবার জবাব দিলেন লিসার মা। 'সকালের প্রথম ট্রেন কখন ছাড়বে জেনে নেব।'

'প্লেনে এস! তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে,' বললেন মি. প্যালফি চিৎকার করে। তারপর ভাবলেন, 'আরে করলাম কি! এরকম চেঁচালে তো বাচ্চাটার ঘুম ভেঙে যাবে!'

ফিরে গেলেন তিনি মেয়ের বিছানার পাশে। রোসা তাঁকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে পা টিপে চলল দরজার দিকে।

'রোসা,' বললেন মি. প্যালফি নিচু স্বরে। 'আমার স্ত্রী আসছেন আগামীকাল।'

'আপনার স্ত্রী?'

'স্‌স্‌স্‌! অত জোরে নয়! আমার প্রাক্তন স্ত্রী। লোটির মা।'

'লোটির?'

তিনি হাসলেন। হাত দোলালেন। রোসা জানবে কেমন করে? 'লিসাও আসছে!'

'লিসা? কি বলছেন এসব। লিসা তো ওখানে,' বলে বিছানা দেখিয়ে দিল রোসা।

মাথা নেড়ে মি. প্যালফি বললেন, 'না, এটা লিসার যমজ বোন।'

'যমজ!' বেচারি রোসা। হতবুদ্ধি হয়ে গেল সে। মাথায় কিছুই ঢুকছে না ওর।

'খাবারে যেন টান না পড়ে। ঘুমানোর ব্যবস্থা সম্পর্কে পরে কথা বলা যাবে।'

রোসা কি বলল শুনতে পেলেন না মি. প্যালফি। বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে গেল সে।

মি. প্যালফি তাকালেন মেয়ের দিকে। শ্রান্ত অবসন্ন দেহে পড়ে আছে মেয়েটা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। একটা তোয়ালে নিয়ে কপাল আর মুখ মুছে দিলেন তিনি।

তাহলে এটাই হচ্ছে লোটি! তাঁর অন্য মেয়েটি! জ্বর হবার এবং হতাশার চাপে ভেঙে পড়ার আগ পর্যন্ত কি সাহস আর শক্তির পরিচয় দিয়েছে সে! ঐ সাহস নিশ্চয়ই সে বাপের কাছ থেকে পায়নি। তাহলে, কার কাছ থেকে পেয়েছে? ওর মায়ের কাছ থেকে?

আবার বেজে উঠল টেলিফোন। রোসা দরজার ফাঁকে মাথা গলিয়ে বলল, 'মিস গেরল্যাখ।'

মি. প্যালফি ওর দিকে না চেয়ে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলেন তিনি উঠবেন না।

মি. বেরনৌ 'জরুরী পারিবারিক কাজে'র জন্য ছুটি দিলেন মিসেস হর্নকে।

মিসেস হর্ন এয়ারপোর্টে টেলিফোন করে পরদিন সকালের প্লেনে দুটো সিট জোগাড় করলেন। অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন সুটকেস-এ।

পরদিন সকালে পেটার্কিনকে নিয়ে ডাক্তার স্ট্রোবেল পৌঁছলেন রোটেন্টার্ন স্ট্রীটের ফ্ল্যাটের সামনে। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি এসে থামল। ট্যাক্সি থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল একটি কিশোর মেয়ে। পেটার্কিন যেন খেপে গেল হঠাৎ। ঝাঁপিয়ে পড়ল সে মেয়েটির ওপর। গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ করে ঘুরতে লাগল লাটিমের মত। কুঁই কুঁই শব্দ করল আনন্দে। আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটির গায়ে।

'হ্যাল্লো, পেটার্কিন! হ্যাল্লো, ডাক্তার!' বলল মেয়েটি।

বিস্ময়ে ডাক্তারের দু'চোখ ছানাবড়া। জবাব এল না তার মুখে। হঠাৎ তিনিও ছুটে গেলেন মেয়েটির দিকে। তবে তাঁর দৌড়টা পেটার্কিনের মত সুন্দর হল না। 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এখনি ফিরে যাও বিছানায়!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিলেন তিনি।

লিসা আর পেটার্কিন ছুটে চলে গেল ফ্ল্যাটে। একজন তরুণী মহিলা নামলেন ট্যাক্সি থেকে।

'ঐ মেয়েটা নির্ঘাত মরবে!' বললেন ডাক্তার আতঙ্কিত ভাবে।

'আপনি যার কথা ভাবছেন এ মেয়েটি সে নয়। এটা হচ্ছে ওর বোন,' বললেন তরুণী মহিলাটি।

রোসা ফ্ল্যাটের দুয়ার খুলেই দেখল সামনে ঘেউ ঘেউ রত একটি কুকুর আর একটি ছোট মেয়ে।

'হ্যাল্লো, রোসা!' বলল মেয়েটি। পেটার্কিন ছুটে গিয়ে ঢুকল লিসার শোবার ঘরে।

রোসা তাকিয়ে রইল বিহ্বল দৃষ্টিতে। ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল বুকে।

এর পরে হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলেন ডাক্তার স্ট্রোবেল। তাঁর সঙ্গে সুটকেস হাতে একজন অত্যন্ত সুন্দরী মহিলা।

'লোটি কেমন আছে?' দ্রুত জিজ্ঞেস করলেন মহিলাটি।

'মনে হয়, একটু ভাল,' বলল রোসা। 'চলুন, আপনাকে ভেতরে নিয়ে যাই।'

'ধন্যবাদ, আমাকে নিয়ে যেতে হবে না,' বলে অচেনা মহিলাটিও অদৃশ্য হয়ে গেলেন রোগীর ঘরে।

'মাথার চক্করটা একটু কমলে এদিকে এস। কোটটা খুলতে সাহায্য কর আমাকে। তাড়াহুড়োর দরকার নেই,' বললেন ডাক্তার।

চমকে উঠল রোসা। 'কিক্···কি বললেন, স্যার?'

'আজ আমার বেশি তাড়াহুড়ো করার দরকার হবে না,' রোসাকে বুঝিয়ে বললেন ডাক্তার।

'মা-মণি!' বলল লোটি। ওর বড় বড় চকচকে চোখ দু'টি স্থির হয়ে রইল মায়ের মুখের ওপর। ওর মনে হল যেন স্বপ্ন বা ম্যাজিক দেখছে। তরুণী মহিলাটি নীরবে মেয়ের ছোট ছোট তপ্ত হাতে চাপড় দিতে লাগলেন। বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিলেন মেয়ের কম্পিত দেহটা।

লিসা চকিতে তাকাল জানালার কাছে দাঁড়ানো বাবার দিকে। তারপর চট করে লোটির বালিশগুলো তুলে নিল। ওগুলোকে চাপড়ে উল্টে ঠিকঠাক করে দিল। বিছানার চাদরগুলো তুলে ঝেড়েঝুড়ে সমান করে বিছিয়ে দিল। পাকা গিন্নীর মত কাজ করল সে। মায়ের কাছে শিখে এসেছে কিনা!

মি. প্যালফি চোরাচোখে তাকালেন ওদের দিকে, মা আর মেয়ে দু'টির দিকে। ওরা তাঁরও সন্তান বটে। আর তরুণী মা-টি বছর কয়েক আগেও ছিলেন তাঁর স্ত্রী। হারানো দিন···বিস্মৃত স্মৃতি···ভেসে উঠল তাঁর চোখে···

পেটার্কিন বসে আছে বিছানার খুঁটির কাছে বজ্রাহতের মত। একবার মেয়ে দু'টির একটাকে দেখছে, একবার অন্যটাকে। তার নাকের কালো আগাটা পর্যন্ত কাঁপছে সন্দেহে। সে বুঝতে পারছে না এর পরে কি করবে। একটি স্নেহপরায়ণ কুকুরকে এরকম কঠিন সমস্যায় ফেলাটা কি লজ্জার বিষয় নয়?

ধাক্কা পড়ল দরজায়।

এক অদ্ভুত জেগে ঘুমানোর মত অবস্থা থেকে চমকে জেগে উঠে চারজনই তাকাল সেদিকে।

একগাল হাসি নিয়ে ঘরে এলেন বুড়ো ডাক্তার স্ট্রোবেল। জিজ্ঞেস করলেন, 'রোগী কেমন আছে?'

'চ-ম-ৎ-কার!' বলল লোটি মলিন হাসি হেসে।

'খিদে-টিদে পাচ্ছে আজ?'

'মা-মণি যদি রাঁধে, খাব,' বলল লোটি ফিসফিস করে। মা-মণি রাজি হয়ে জানালার কাছে গিয়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আগে কথা বলিনি। এজন্য কিছু মনে কোরো না।'

মি. প্যালফি হ্যাণ্ডশেক করলেন তাঁর সঙ্গে। বললেন, 'তুমি আসায় আমি কৃতজ্ঞ।'

'মোটেই না। না এসে আর কি করার ছিল আমার। বাচ্চাটা···'

'অবশ্যই, বাচ্চাটা,' বললেন মি. প্যালফি। 'তবু বলছি, আমি কৃতজ্ঞ।'

'দেখে মনে হচ্ছে তুমি ঘুমাওনি কয়েকদিন,' বললেন মহিলা অনিশ্চিতভাবে।

'ওটা আমি পুষিয়ে নেব। আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম বাচ্চাটির ব্যাপারে।'

'আবার ঠিক হয়ে যাবে,' বললেন তরুণী মহিলাটি। 'আমার মন বলছে।'

এ সময় বিছানায় ফিসফিস আলাপ শুরু হয়ে গেছে। লিসা লোটির কানে কানে বলছে, 'মা মিস গেরল্যাখের ব্যাপারটা জানেন না। আমাদেরও উচিত হবে না তাঁকে বলা।'

লোটি উদ্বেগের সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দিল।

বুড়ো ডাক্তার থার্মোমিটারে জ্বর দেখছেন। তাই ওদের কথা তিনি কেমন করে শুনবেন? কিন্তু থার্মোমিটার দেখছেন তিনি চোখ দিয়ে, কান দিয়ে তো নয়। আর শুনেও যদি থাকেন তিনি, তাতেই বা কি? যা শুনেছেন তা কিভাবে গোপন রাখতে হয় সেটা তাঁর চাইতে ভাল আর কেউ জানে না।

'তাপমাত্রা প্রায় স্বাভাবিক,' বললেন তিনি। 'তুমি সেরে উঠেছ। অভিনন্দন, লিসা।'

হি-হি করে হেসে উঠে আসল লিসা বলল, 'ধন্যবাদ।'

'না কি, কথাগুলো আমাকে বলেছেন?' জিজ্ঞেস করল লোটি দুর্বল স্বরে।

'তোমরা দু'জন হচ্ছ ষড়যন্ত্রকারী দুষ্টু মহিলা। আমার পেটার্কিনকে পর্যন্ত বোকা বানিয়ে দিয়েছ তোমরা,' বললেন ডাক্তার।

দু'জনের মাথায় তিনি হাত বুলিয়ে দিলেন। জোরে কেশে গলা সাফ করে উঠে দাঁড়ালেন। 'আর পেটার্কিন! এ দুই ঠগের কাছ থেকে ছুটতে পারলে চল আমার সঙ্গে।'

লেজ নেড়ে বিদায় নিল পেটার্কিন। ডাক্তারের পা ঘেঁষে দাঁড়াল। ডাক্তার মি. প্যালফিকে বললেন, 'মা হলেন এমন এক অষুধ যা দোকানে কেনা যায় না!' মিসেস হর্নকে বললেন, ' লিসা—আরে থুক্কু—লোটি পুরোপুরি সেরে ওঠা পর্যন্ত থাকতে পারবেন তো?'

'মনে হয় পারব।'

'তাহলে এটাই কথা রইল। আপনি থাকবেন। আপনার প্রাক্তন স্বামীকে মেনে নিতে হবে ব্যাপারটা।'

মি. প্যালফি মুখ খুললেন কিছু বলার জন্য।

হাসতে হাসতে ডাক্তার বললেন, 'মুখটা আর নাই-বা খুললেন। আমি জানি এতগুলো লোক ঘরে থাকলে আপনার শৈল্পিক-মেজাজের ওপর কি রকম চাপ পড়বে। ধৈর্য ধরুন! ক'দিন পরেই আপনি আবার একা হতে পারবেন।'

বুড়ো বেশ খোশ-মেজাজে আছেন আজ! এমন জোরে দরজায় ঠেলা দিলেন যে আঘাত লেগে রোসার কপাল ফুলে উঠল আলুর মত। বেচারি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরের কথা শুনছিল বাইরে থেকে। দুই হাতে কপাল চেপে ধরল সে।

রাত তার বিশাল পাখা বিস্তার করেছে পৃথিবীর ওপর। লিসা ঘুমিয়ে পড়েছে। লোটিও ঘুমে অচেতন।

মিনিট কয়েক আগ পর্যন্ত মিসেস হর্ন আর মি. প্যালফি বসে ছিলেন পাশের ঘরে। অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা। অনেক কিছুর আলোচনা এড়িয়ে গেছেন। শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালেন মি. প্যালফি। বললেন, 'আমাকে যেতে হচ্ছে,' একথা বলতে গিয়ে নিজেকে তাঁর বোকা মনে হল। হবেই তো। তাঁর দুই কচি মেয়ে ঘুমাচ্ছে পাশের ঘরে। তাঁর মুখোমুখি দাঁড়ানো সুন্দরী তরুণীটি ওদের মা। তবু তাঁকে নিজের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে চোরের মত! আগের দিনে ভূতরা নাকি অদৃশ্যভাবে থাকত মানুষের আশপাশে। এখন থাকলে তাঁর অবস্থা দেখে সশব্দে না হেসে ওরা পারত না!

মিসেস হর্ন দরজা পর্যন্ত গেলেন মি. প্যালফির সঙ্গে।

একটু দ্বিধা করে মি. প্যালফি বললেন, 'ওর অবস্থার অবনতি দেখলে আমাকে পাবে স্টুডিয়োতে।'

'তোমাকে চিন্তা করতে হবে না,' বললেন মিসেস প্যালফি আস্থার সঙ্গে। 'আর ভুলে যেয়ো না যে তোমাকে অনেক ঘুমাতে হবে।'

'গুড-নাইট।'

'গুড-নাইট।'

মি. প্যালফি সিঁড়ির কয়েক ধাপ নামার পর মিসেস হর্ন কোমল স্বরে ডাকলেন, 'আর্নল্ড!' উৎসুক দৃষ্টিতে ফিরে তাকালেন মি. প্যালফি।

'সকালে নাস্তা খেতে আসবে তো?'

'আসব।'

দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন মিসেস হর্ন। বয়স হয়েছে লোকটার। সন্দেহ নেই এতে। তাঁর প্রাক্তন স্বামীকে একজন সত্যিকারের বয়স্ক লোকের মতই দেখায়।

ঘণ্টাখানেক পরে রিং স্ট্রীটের স্টুডিয়োর সামনে গাড়ি থামিয়ে নামলেন এক

ফ্যাশন-দুরস্ত তরুণী মহিলা।

বাড়ির দারোয়ান বলল, 'কনডাক্টর প্যালফিকে চান? তিনি বোধহয় নেই।'

'ঐ যে আলো দেখা যাচ্ছে তাঁর স্টুডিয়োতে?' বললেন মহিলাটি। 'কাজেই তিনি আছেন। এই নাও,' বলে একটা নোট গুঁজে দিলেন তিনি লোকটার হাতে। দ্রুত পায়ে উঠে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে।

দরজা খুলেই মহিলাটিকে দেখে মি. প্যালফি বললেন, 'তুমি?'

'আমি,' বলে স্টুডিয়োতে ঢুকে বসলেন আইরিন গেরল্যাখ। সিগারেট ধরিয়ে উৎসুকভাবে তাকালেন মি. প্যালফির দিকে।

প্যালফি কিছুই বললেন না।

'টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করলে কেন? ওটা কি খুব ভদ্র ব্যবহার হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন মিস গেরল্যাখ।

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করিনি।'

'করনি?'

'কথা বলার ক্ষমতা আমার ছিল না। ইচ্ছা হচ্ছিল না কথা বলার। মেয়েটা খুবই অসুস্থ ছিল।'

'এখন তো ওর অবস্থা ভাল। নইলে এখনও তুমি রোটেন্টার্ন স্ট্রীটে থাকতে।'

মি. প্যালফি বললেন, 'হ্যাঁ, এখন সে অনেক ভাল। আর, আমার স্ত্রী আছে ওখানে।'

'কে?'

'আমার স্ত্রী, মানে, প্রাক্তন স্ত্রী। সে আজ এসে পৌঁচেছে আমার অন্য মেয়েটিকে নিয়ে।'

'তোমার অন্য মেয়ে!'

'হ্যাঁ, ওরা যমজ। প্রথমে লিসা ছিল আমার সঙ্গে। ওদের বার্ষিক ছুটির পর থেকে অন্যটি থাকে। এই ব্যাপারটা আমিও টের পাইনি। টের পেলাম মাত্র গতকাল।'

'তোমার প্রাক্তন স্ত্রীর চতুর পরিকল্পনা!' বললেন মিস গেরল্যাখ ক্রুদ্ধ হাসি হেসে।

'সে নিজেও জানত না গতকাল পর্যন্ত,' প্রতিবাদ করে বললেন মি. প্যালফি।

রঙ-করা ঠোঁট দুটো বিদ্রূপের সাথে বাঁকিয়ে আইরিন গেরল্যাখ বললেন, 'পরিস্থিতিটা একটু রঙ্গময় হয়ে উঠেছে, তাই না? এক ফ্ল্যাটে রয়েছেন সেই মহিলাটি, যাঁর সাথে তুমি বিবাহিত ছিলে। অন্য ফ্ল্যাটে আরেকজন, যার সাথে তোমার বিয়ে এখনও হয়নি।'

মেজাজ গরম হয়ে গেল মি. প্যালফির। 'ফ্ল্যাট আরও অনেক আছে এবং

মহিলাও অনেক আছে যাদের সাথে এখনও আমার বিয়ে হয়নি।'

'ওহো! তুমি দেখছি রসিকতাও করতে জান!'

'দুঃখিত, আইরিন। মেজাজ আমার ভাল নেই।'

'আমিও দুঃখিত, আর্নল্ড। মেজাজ আমারও ভালো নেই।'

দড়াম! বন্ধ হয়ে গেল দরজা। মিস গেরল্যাখ চলে গেছেন। মি. প্যালফি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বন্ধ দরজাটার দিকে।

# এগারো

প্রবাদে বলে, সময় সকল ক্ষত সারিয়ে দেয়। অবশ্য, সময় রোগব্যাধিও সারিয়ে দেয়। লোটি ভাল হয়ে গেছে। আবার বিনুনি ফিতে বেঁধে ছুটাছুটি করছে। লিসার চুল এখন খোলা। মনের সুখে ঝাঁকড়া চুল দোলাচ্ছে।

বাজার করা ও ঘরকন্নার কাজে ওরা সাহায্য করছে মা আর রোসাকে। খেলছে নিজেদের ঘরে বসে। কোন কোন সময় গান করছে এক সাথে। লোটি, কিংবা বাবাও পিয়ানো বাজাচ্ছেন গানের সঙ্গে। ছুটে যাচ্ছে প্রতিবেশী মি. গ্যাবেলের ঘরে। ডাক্তার স্ট্রোবেল রোগী নিয়ে ব্যস্ত থাকলে পেটার্কিনকে নিয়ে রাস্তায় বেড়াতে যাচ্ছে। পেটার্কিন খাপ খাইয়ে নিয়েছে নিজেকে দুই-লিসার সঙ্গে। কিন্তু দুই বোন মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায়। তাকায় পরস্পরের চোখের দিকে। এখন কি ঘটবে?

১৪ অক্টোবর উভয়েরই জন্মদিবস। ওরা বসে আছে মা-বাবার সাথে। দুই সারি মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। প্রতি সারিতে এগারোটা করে। ওরা ঘরে তৈরি কেক আর গরম গরম চকলেট খেয়েছে। বাবা পিয়ানোতে একটা চমৎকার জন্মদিনের সুর বাজিয়ে ঘুরে বসে বললেন, 'এবার বল, তোমরা আমাদের কাছ থেকে উপহার নেবে না কেন?'

দীর্ঘনিশ্বাস টেনে লোটি জবাব দিল, 'কারণ, আমরা এমন জিনিস চাই যা তোমরা কিনতে পারবে না।'

'কি জিনিস চাও, সোনামণি?' জিজ্ঞেস করলেন মা।

এবার লিসার পালা দীর্ঘশ্বাস টানার। তারপর উত্তেজনায় অধীর হয়ে সে বলল, 'জন্মদিনের উপহার হিসাবে আমরা চাই সব সময় এক সাথে থাকতে।'

ওদের মা-বাবার মুখে রা নেই।

লোটি আবার বলল নরম সুরে, 'তাহলে আমাদেরকে জীবনে আর কোন উপহার দিতে হবে না! জন্মদিনেও না, ক্রিসমাসেও না। কখনও না!'

মা-বাবা কিছুই বললেন না।

'তোমরা চেষ্টা করে দেখ না। আমরা খুব ভাল হয়ে চলব। এখনকার চাইতেও ভাল হয়ে চলব। কোন গোলমাল করব না। কথা দিচ্ছি আমরা!' বলল লোটি দু'চোখে অশ্রু নিয়ে।

'কথা দিচ্ছি আমরা! এর একদম নড়চড় হবে না!' বলল লিসা।

মি. প্যালফি উঠে দাঁড়ালেন আসন ছেড়ে। 'লিসালোট, তোমার অমত না থাকলে পাশের ঘরে গিয়ে আমরা একটু কথা বলতে পারি।'

'চল, আর্নল্ড,' জবাব দিলেন তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী। তাঁরা চলে গেলেন পাশের ঘরে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

দরজায় কান পাতল দুই বোন। ওরা প্রার্থনা করতে লাগল মনে মনে।

মি. প্যালফি বললেন, 'আমাদের নিজ নিজ মতামত যা-ই হোক, এতে কোন সন্দেহ নেই যে ওরা একসাথে থাকলে অনেক ভাল হয়।'

'অবশ্যই,' জবাব দিলেন মিসেস হর্ন। 'ওদেরকে আলাদা করা উচিত হয়নি আমাদের।'

'সেই ভুল সংশোধনের জন্য অনেক কিছুই করতে হবে আমাদেরকে,' বললেন মি. প্যালফি ফ্লোরে দৃষ্টি রেখে। 'তুমি দুটোকেই মিউনিখে নিয়ে গেলে আমার আপত্তি নেই। বছরে চার সপ্তা এখানে এসে থাকলে তুমি আপত্তি করবে? তিন সপ্তাহ? আচ্ছা, অন্তত দু'সপ্তা? তোমার হয়ত বিশ্বাস হবে না, কিন্তু ওদের দু'জনই আমার খুব প্রিয়।'

'বিশ্বাস হবে না কেন?' বললেন তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী।

'ওদের প্রতি ভালবাসার প্রমাণ আমি দিতে পারিনি,' জবাব দিলেন মি. প্যালফি।

'দিয়েছ, লোটির অসুখের সময়। তুমি ওদেরকে সুখী করতে চাও। কিন্তু কেমন করে জানলে যে বাপকে ছেড়ে ওরা সুখী হবে?'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে না থাকলে মানুষ হবে না ওরা,' বললেন মি. প্যালফি।

'আর্নল্ড, ওরা যা চায় সাহস করে তা বলতে পারছে না। সেটা কি জিনিস তুমি বোঝ না?'

'অবশ্যই বুঝি। অবশ্যই জানি ওরা কি চায়। ওরা চায় তুমি আমি একসাথে থাকি।'

মিসেস হর্ন বললেন, 'ওরা চায় একজন বাবা একজন মা! এটা কি ওদের স্বার্থপরতা?' প্রশ্ন করলেন তরুণী মা।

'না। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা স্বার্থপর না হলেই যে পূরণ হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই,' বললেন মি. প্যালফি।

'কেন পূরণ হবে না?'

ঘুরে দাঁড়ালেন মি. প্যালফি। 'তুমি জিজ্ঞেস করছ এ কথা? এত কিছুর পরেও?'

'হ্যাঁ। এত কিছুর পরেও,' বললেন মিসেস হর্ন।

চাবির ছিদ্রে চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল লিসা। ফিসফিস করে বলল, সে, 'আরে! আরে! আরে! বাবা মা-মণিকে চুমু দিচ্ছেন!'

লোটি ধাক্কা মেরে লিসাকে সরিয়ে নিজে চোখ লাগাল ছিদ্রপথে। বলল, 'না, এখন মা-মণি বাবাকে চুমু দিচ্ছেন।'

# বারো

ভিয়েনার অভিজ্ঞ রেজিস্ট্রার মি. বেনো প্রিন্স-এর কেমন কেমন যেন লাগছে। একটি বিয়ে রেজেস্ট্রি করছেন তিনি। কনে হচ্ছে বরের তালাক-দেয়া বৌ। ওদের দু'টি মেয়ে আছে এগার বছর বয়েসী। দেখতে হুবহু এক রকম। একজন সাক্ষী হচ্ছে শিল্পী। নাম অ্যান্টন গ্যাবেল। গলায় টাইটাও বাঁধেনি। অন্য সাক্ষী জনৈক ডাক্তার স্ট্রোবেল। তিনি এসেছেন একটা কুকুর নিয়ে। কুকুরটিকে বাইরের ঘরে রেখে আসা উচিত ছিল। কিন্তু ওটা এমন গোলমাল বাধিয়ে দেয় যে শেষে ওটাকে ভেতরে আনতে হয়েছে এবং অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে দিতে হয়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠানে কুকুর সাক্ষী! সত্যি, কী যে হচ্ছে আজকাল!

লোটি আর লিসা শ্রদ্ধাভরে বসে আছে চেয়ারে। ওরা রাজকন্যার মত সুখী। কেবল সুখী নয়, গর্বিতও। এই সুখ, এই অবিশ্বাস্য আনন্দ ওরাই এনেছে!

অনুষ্ঠানের শেষে মি. গ্যাবেল মি. প্যালফির কানে কানে কি বললেন। রহস্যময়ভাবে হাসলেন দু'জনে। কেন তাঁরা ফিসফিস করলেন, কেন হাসলেন কেউ জানল না তারা ছাড়া।

মি. প্যালফি এবার মিসেস হর্ন-মানে, মিসেস প্যালফির দিকে ফিরে বললেন, 'চল, এক কাজ করি। স্কুলে গিয়ে লোটির নাম লেখাই।'

'লোটি! লোটি তো স্কুলে গিয়েছে—ও, হ্যাঁ, অবশ্যই। তোমার কথাই ঠিক।'

মি. প্যালফি ও তাঁর স্ত্রী দ্বিতীয় মেয়েকে ভর্তি করালেন। হতভম্ব হয়ে গেলেন

হেডমাস্টার মি. কিলিয়ান। কারণ, দ্বিতীয় মেয়েটি অবিকল প্রথমটির মত। তবে একটু পরেই সামলে উঠলেন অভিজ্ঞ মানুষটি। চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'আমি যখন একজন তরুণ সহকারী শিক্ষক, তখনকার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। একবার এক নতুন ছেলে এল স্কুলে। লেখাপড়ায় দারুণ ভাল। অঙ্কে ক্লাসের সেরা। কিন্তু সব সময় নয়। একেক সময় খুব খারাপ। সংশয় জাগল আমার মনে। ভাবলাম, এটা তো বড় অদ্ভুত ব্যাপার! একদিন সে ক্যালকুলেটর মেশিনের মত অঙ্ক করে। একটা ভুলও থাকে না। আরেকদিন হিমশিম খায়, ভুল করে! তারপর আমি লিখে রাখতে লাগলাম কোন্ কোন্ দিন সে অঙ্ক ভাল করে, আর কোন্ কোন্ দিন খারাপ করে। দেখলাম ভাল করে সোমবার, বুধবার, শুক্রবার এবং খারাপ করে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার।'

'মজার কাণ্ড তো!' বললেন মি. প্যালফি।

হেডমাস্টার বললেন, 'একদিন সকালে আমি গেলাম ছেলেটির বাবা-মার কাছে। বললাম ঘটনাটা। 'আপনার কথা ঠিক, স্যার,' বলে ছেলেটির বাপ ডাক দিল দু'টি নাম ধরে। দু'টি ছেলে দৌড়ে এল। একই সমান। একই চেহারা। 'ওরা যমজ। সেপ্ অঙ্কে ভাল। টনি খারাপ,' বলল ওদের মা। বিস্ময়ে ধাক্কা সামলে জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনদিন একজনকে, তিনদিন আরেকজনকে না পাঠিয়ে দুটোকেই স্কুলে পাঠাও না কেন?' বাপটি বলল, 'আমরা গরীব, স্যার! দু'জনের একটি মাত্র ভাল সুট আছে।'

মি. প্যালফি হাসলেন। মি. কিলিয়ানও হাসলেন। লিসা বলে উঠল, 'বুদ্ধিটা চমৎকার! আমরাও করব ওরকম!'

'করেই দেখ!' বললেন মি. কিলিয়ান কৃত্রিম ধমকের সুরে।

হেড মাস্টারের ঘর থেকে মি. ও মিসেস প্যালফি বেরুলেন যমজ মেয়ে দু'টিকে নিয়ে। ঠিক তখনি ছুটির ঘণ্টা বাজল। শত শত মেয়ে বেরিয়ে এল হুড়মুড় করে। হঠাৎ ওরা স্থির হয়ে গেল লিসা আর লোটিকে দেখে।

শেষ পর্যন্ত কনুইয়ের গুঁতো মেরে মেরে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল ট্রুডি। হাঁপাতে হাঁপাতে একবার একজনের দিকে, আবার অন্যজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই ব্যাপার!' তারপর লিসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই প্রথমে আমার কাছ থেকে কথা আদায় করলি স্কুলে কিছু না বলার জন্য। শেষে দু'জনেই চলে এলি বুক ফুলিয়ে!'

'কথা আদায় করেছিলাম আমি,' বলল লোটি।

'যা, এখন বলে দে সবাইকে,' বলল লিসা উদারভাবে। 'কাল সকালে আমরা দুজনেই আসছি।'

মি. প্যালফি তাঁর পরিবারকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন স্কুলের গেট দিয়ে।

মিস আইরিন গেরল্যাখ সেজেগুজে দাঁড়িয়েছিলেন অপেরা হাউসের বাইরে। বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখছিলেন মিউনিখ ইলাস্ট্রেটেড-এর প্রথম পাতাটা। বিনুনি পরা দু'টি বাচ্চা মেয়ের ছবি ছাপা হয়েছে ঐ পাতায়। পত্রিকা থেকে চোখ তুলতেই আরও বিস্মিত হলেন তিনি। কারণ সেই মুহূর্তে রাস্তার মোড়ে একটা ট্যাক্সি এসে থেমেছে। ট্যাক্সিতে রয়েছে ঐ দু'টি মেয়ে। আর আছে একজন লোক—যাকে তিনি এক সময় খুব ভাল করে জানতেন। লোকটির পাশে বসে আছেন একজন মহিলা—যাঁকে জানার কোন ইচ্ছাই তাঁর ছিল না।

বোনকে ঠেলা মেরে লোটি বলল, 'ঐ দেখ!'

'অ্যাঁ? কি দেখব?'

ফিসফিস করে লোটি বলল, 'মিস গেরল্যাখ!'

'কোথায়?'

'ডান দিকে,' দেখিয়ে দিল লোটি। লিসা দেখতে লাগল। ওর ইচ্ছা হল জিহ্বা বের করে ভেংচি দিতে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি দেখছ তোমরা ওদিকে?'

অ্যাই সেরেছে! মা বোধহয় দেখে ফেলেছেন মিস গেরল্যাখকে! ভড়কে গেল ওরা। কিন্তু না, দেখেননি। একটি মোটা মহিলা এসে তাঁকে দৃষ্টির আড়াল করেছে।

রোটেন্টর্ন স্ট্রীটের বাড়িতে পৌছল ওরা। সিঁড়ি বেয়ে উঠল ওপরে।

দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে রোসা। ওর সেরা পোশাকটি পরে, হাসিমুখে। এক গোছা ফুল তুলে দিল সে মিসেস প্যালফির হাতে।

'ধন্যবাদ, রোসা। তুমি যে থাকছ আমাদের সঙ্গে এতে আমি খুশি হয়েছি।'

রোসা বলল, 'আমার ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মিস লোটির টানে যেতে পারলাম না।'

'আমরা বাকি তিনজন বুঝি একেবারেই ফ্যালনা?' বললেন মি. প্যালফি হাসিমুখে।

'ওকে আর খোঁচা দিতে হবে না। চল, ভেতরে যাই,' বললেন মিসেস প্যালফি।

'এক সেকেণ্ড, আমি একটু পাশের ফ্ল্যাটে যাচ্ছি,' একগাল হেসে বললেন মি. প্যালফি।

একথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। ব্যাপার কি? বিয়ে করে এসে ঘরে না

ঢুকে তিনি কি রিং স্ট্রীটের স্টুডিয়োতে চলে যাচ্ছেন? কিন্তু রোসা স্তব্ধ হয়নি মোটেও! সে হাসছে মিটিমিটি।

মি. প্যালফি সোজা গিয়ে চাবি বের করে শান্তভাবে মি. গ্যাবেলের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ফেললেন!

লোটি ছুটে গিয়ে দেখল দরজায় একটা ছোট্ট নতুন নামের ফলক 'প্যালফি।'

'ও, ড্যাডি!' বলে জড়িয়ে ধরল সে মি. প্যালফিকে।

এবার ছুটে গেল লিসা। নাম-ফলকটা দেখেই বোনের হাত ধরে জুড়ে দিল নাচ।

'যথেষ্ট হয়েছে। এখন রান্নাঘরে গিয়ে রোসাকে সাহায্য কর। আমি তোমাদের মাকে স্টুডিয়োটা দেখাই। আধ-ঘণ্টা পরে লাঞ্চে বসব। খাবার তৈরি হলে বেল দিয়ো,' বললেন মি. প্যালফি।

লিসা নিচু হয়ে বাপকে সেলাম জানিয়ে কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে বলল, 'মি. প্যালফি, আশা করি আমরা সৎ প্রতিবেশী হব।'

***

একটি রেমাশ নিবেদন

বাংলাপিডিএফ

বইঘর

বইলাভার্স

কাজিরহাট

Scan & Edit

Md. Shahidul Kaysar Limon

মোঃ শহীদুল কায়সার লিমন

https://www.facebook.com/limon1999

## অনুবাদ

### তিনটি বই একত্রে

### আ সায়েন্টিস্ট কিডন্যাপড

### জুল ভার্ন/শামসুদ্দীন নওয়াব

ফরাসি বিজ্ঞানী টমাস রস ভয়ঙ্কর এক মারণাস্ত্র আবিস্কার করার পর উদ্ভট পাগলামি শুরু করলেন। নিরীহ ভালমানুষ সেজে মঞ্চে প্রবেশ করলেন সম্ভ্রান্ত কাউন্ট লা কোঁৎ দার্তিগাস, কিন্তু টমাস রসের শুভানুধ্যায়ী এঞ্জিনিয়ার সিমোন আরৎ-এর জানা ছিল না কাউন্টের পেটে এত বিদ্যা! দ্বীপের ভেতর গভীর এক গহ্বরে বন্দী হলেন টমাস রস, তাঁর আবিস্কৃত ফুলওয়েটর এখন প্রলয় ডেকে আনবে। সিমোন আরৎ কি জলদস্যুদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে পারবেন?

### বনের গল্প

### জিম করবেট/অনীশ দাস অপু

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিকারী জিম করবেট, তাঁর জীবনের প্রায় সম্পূর্ণ সময়টা কাটিয়ে দিয়েছেন ভারতের নৈনিতালে। প্রকৃতি এবং প্রাণিজগৎকে তাঁর মত করে বোধকরি আর দেখেননি আর কেউ। জঙ্গলের অসংখ্য রোমাঞ্চকর ঘটনার সাক্ষী তিনি, কখনও কখনও নায়কও। এ বইতে সে সব ঘটনার কথাই বর্ণনা করা হয়েছে।

### লোটি ও লিসা

### এরিখ কেস্টনার/ এ.টি.এম. শামসুদ্দীন

এরিখ কেস্টনারের জন্ম ড্রেসডেন-এ ১৮৯৯ সালে। স্কুল থেকে সরাসরি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিতে চলে গিয়েছিলেন তিনি। কপর্দকহীন বেকার অবস্থায় বার্লিনে চলে এলেন কেস্টনার লেখক হিসেবে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে। এক বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হলো তাঁর প্রথম বই। এরপর একে একে আসতে লাগল আরও বই- 'এমিল অ্যান্ড দ্য ডিটেকটিভস', 'এমিল অ্যান্ড দ্য থ্রি টুইনস', 'লোটি অ্যান্ড লিসা' ইত্যাদি। প্রকাশিত হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই 'এমিল অ্যান্ড দ্য ডিটেকটিভস' বইটি চলচ্চিত্রায়িত এবং অন্তত ২৫ টি ভাষায় অনূদিত হয়।

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

---

**সেবা প্রকাশনী**

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সেবা প্রকাশনী শো- রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রজাপতি প্রকাশন শো- রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০